**খুদ্দকপাঠ ও খুদ্দকপাঠ অর্থকথা**

[একটি আধুনিক ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ]

ভাষান্তর: করুণাবংশ ভিক্ষু

প্রকাশকাল

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৫৬৬ বুদ্ধবর্ষ

# ১. ত্রিশরণ

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বার আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বার আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।

ত্রিশরণ সমাপ্ত।

# ২. দশটি শিক্ষাপদ

০১. আমি প্রাণিহত্যা হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০২. আমি অদত্তগ্রহণ হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৩. আমি অব্রহ্মচর্য হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৪. আমি মিথ্যাবাক্য হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৫. আমি সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৬. আমি বিকালে ভোজন হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৭. আমি নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দর্শন হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৮. আমি মালা পরা, (রূপচর্চার জন্য) সুগন্ধি ও প্রসাধনী গায়ে মাখা ও সাজগোজ করা থেকে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

০৯. আমি উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১০. আমি সোনা-রুপো গ্রহণ হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দশটি শিক্ষাপদ সমাপ্ত।

# ৩. দেহের বত্রিশটি অংশ

এই দেহে আছে:

“চুল, লোম, নখ, দাঁত, চামড়া;

মাংস, পেশিতন্তু, হাড়, হাড়ের মজ্জা, কিডনি;

হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ঝিল্লি, প্লীহা, ফুসফুস;

অন্ত্র, অন্ত্ররজ্জু, পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য, মল, মগজ;

পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, ঘাম, মেদ;

অশ্রু, চর্বি, থুতু, শিকনি, গ্রন্থিতেল, মূত্র।”

দেহের বত্রিশটি অংশ সমাপ্ত।

# ৪. কুমার-প্রশ্ন

০১. “এক মানে কী?” “সকল সত্ত্বই আহারের ওপর নির্ভরশীল।”

০২. “দুই মানে কী?” “মন (*নামং*) ও পদার্থ (*রূপং*)।”

০৩. “তিন মানে কী?” “তিন প্রকার অনুভূতি।”

০৪. “চার মানে কী?” “চার আর্যসত্য।”

০৫. ‍“পাঁচ মানে কী?” “পাঁচটি আঁকড়ে ধরার পুঞ্জ।”

০৬. “ছয় মানে কী?” “ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তন।”

০৭. “সাত মানে কী?” “সাতটি বোধির অঙ্গ (*বোজ্ঝঙ্গা*)।”

০৮. “আট মানে কী?” “আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।”

০৯. “নয় মানে কী?” “নয়টি সত্ত্বাবাস।”

১০. “দশ মানে কী?” “দশ অঙ্গ সমন্বিত ব্যক্তিকে ‘অর্হৎ’ বলা হয়।”

কুমার-প্রশ্ন সমাপ্ত।

# ৫. মঙ্গল সূত্র

০১. আমি এরূপ শুনেছি। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে। তখন উজ্জ্বল দেহধারী জনৈক দেবতা রাতের শেষদিকে পুরো জেতবনকে আলোকিত করে ভগবান যেখানে আছেন সেখানে উপস্থিত হলো। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়াল। একপাশে দাঁড়িয়ে সেই দেবতা ভগবানকে গাথাযোগে বলল:

০২. “সকলের স্বস্তি কামনা করে বহু দেবতা

ও মানুষ মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন;

(দয়া করে এখন আপনি)

উত্তম মঙ্গল সম্পর্কে বলুন।”

০৩. “মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা,

পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা,

এবং পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৪. “ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করা,

পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা,

এবং নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৫. “শাস্ত্রজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা,

বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া,

এবং সুভাষিত কথা বলা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

০৬. “মাতাপিতার সেবাযত্ন করা,

স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করা,

এবং নির্দোষ পেশা অবলম্বন করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৭. “দান দেওয়া, ধর্মচর্চা করা,

জ্ঞাতিদের সাহায্য করা,

এবং নির্দোষ কর্ম সম্পাদন করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৮. “পাপকাজে আনন্দ না পাওয়া,

পাপকাজ হতে বিরত থাকা,

মদ্যপান হতে সংযত থাকা,

এবং কুশলধর্মে অপ্রমত্ত থাকা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

০৯. “গৌরব প্রদর্শন করা, ভদ্র ব্যবহার করা,

সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞ হওয়া,

এবং যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১০. “সহিষ্ণু হওয়া, সুবাধ্য হওয়া,

শ্রমণদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা,

এবং যথাসময়ে ধর্মালোচনা করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১১. “তপস্যা করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা,

আর্যসত্য দর্শন করা এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করা,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১২. “যাঁর চিত্ত অষ্ট লোকধর্মে বিচলিত হয় না,

যাঁর চিত্ত শোকহীন, বিরজ ও ভয়হীন,

এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।”

১৩. (এতক্ষণ ধরে যে-সকল মঙ্গলের কথা বলা হলো)

“এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ সম্পাদন করে

(মারের দ্বারা) সর্বত্র অপরাজেয় হয়ে,

সর্বত্রই (তারা) স্বস্তি (সুখ) লাভ করে থাকে।

এগুলোই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম মঙ্গল।”

মঙ্গল সূত্র সমাপ্ত।

# ৬. রত্ন সূত্র

০১. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

সকল সত্ত্বগণ আনন্দিত হও,

আমার দেশনা মন দিয়ে শোনো।

০২. অতএব, হে অমনুষ্যগণ, সবাই শোনো,

মানুষদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হও।

তারা তোমাদের উদ্দেশ্যে রাত-দিন পূজা দেয়,

তাই অপ্রমত্ত হয়ে তাদের রক্ষা করো।

০৩. ইহলোকে কিংবা পরলোকে যা কিছু বিত্ত আছে,

অথবা স্বর্গে যা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে;

সেগুলোর কোনোটিই তথাগতের সমান নয়।

এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৪. ক্ষয়, বিরাগ, অমৃত ও উৎকৃষ্ট—

যা সমাহিত শাক্যমুনি অধিগত করেছেন,

সেই ধর্মের সমতুল্য কিছুই নেই।

এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যেই শুচির কথা প্রকাশ করেছেন,

যাকে আনন্তরিক সমাধি বলা হয়;

সেই সমাধির সমতুল্য কিছুই নেই।

এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৬. যে আটজন ব্যক্তি সৎপুরুষের দ্বারা প্রশংসিত,

তাঁরা জোড়া হিসেবে চার জোড়া;

তাঁরা দক্ষিণাযোগ্য, সুগতের শিষ্য,

এঁদের দান দিলে মহাফল লাভ হয়।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৭. যাঁরা সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত মানসিক দৃঢ়তা সহকারে,

যাঁরা গৌতম বুদ্ধের শাসনে নিষ্ক্রমণকারী,

তাঁরা যা প্রাপ্তব্য তা লাভ করেছেন, অমৃতে ডুব দিয়ে,

বিনামূল্যে লাভ করে, শান্তি উপভোগ করছেন।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৮. মাটিতে পোঁতা শক্ত খুঁটি যেমন

চতুর্দিকের বাতাসে কম্পিত হয় না,

ঠিক তদ্রূপ তাঁকেই আমি ‘সৎপুরুষ’ বলি,

যিনি আর্যসত্যকে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

০৯. যাঁরা গম্ভীর প্রাজ্ঞ কর্তৃক সুদেশিত

আর্যসত্যকে প্রতিভাত করেন,

তাঁরা যদি খানিকটা প্রমত্তও হয়ে থাকেন,

তবুও অষ্টমবার জন্মগ্রহণ করেন না।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১০. সেই দর্শনসম্পদের সঙ্গে তাঁর

তিনটি বিষয় পরিত্যক্ত হয়।

আত্মদৃষ্টি, সন্দেহ, শীল ও ব্রতের মিথ্যাদৃষ্টি,

অথবা যা কিছু আছে।

১১. তিনি চার অপায় হতে মুক্ত হন,

ছয়টি গুরুতর পাপকাজ সম্পাদন করা

তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১২. তিনি যদি সামান্যতম পাপকর্মও করেন,

তিনি যদি কায়িক পাপকর্ম করেন,

বাচনিক কিংবা মানসিক পাপকর্মও করেন,

তিনি তা গোপন রাখতে পারেন না।

কারণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে

পাপ গোপন করা অসম্ভব বলা হয়েছে।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৩. গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে যেমন

বনের বৃক্ষরাজির ডালপালায় ফুল ফোটে,

সত্ত্বগণের পরম হিতের জন্য ভগবান

তাদৃশ শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন।

এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৪. শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক,

শ্রেষ্ঠ আহরণকারী, অনুত্তর (ভগবান)

শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন।

এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৫. যাঁদের পুরোনো কর্ম ক্ষীণ হয়েছে,

নতুন কর্ম উৎপন্ন হওয়ার কারণ নেই,

যাঁদের পুনর্জন্মের প্রতি আসক্তি নেই,

সেই ধীর ব্যক্তিগণ ক্ষীণবীজ ও আকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে

এই প্রদীপের মতো নির্বাপিত হন।

এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।

এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।

১৬. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

(আমরা সকলে মিলে)

দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত

তথাগত বুদ্ধকে আমরা নমস্কার করি।

এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।

১৭. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

(আমরা সকলে মিলে)

দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত

তথাগত ধর্মকে আমরা নমস্কার করি।

এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।

১৮. এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে,

যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী;

(আমরা সকলে মিলে)

দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত

তথাগত সংঘকে আমরা নমস্কার করি।

এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।

রত্ন সূত্র সমাপ্ত।

# ৭. তিরোকুট্ট সূত্র

০১. প্রেতগণ প্রাচীরের ওপাশে, সন্ধিস্থলে ও মোড়ে

দাঁড়িয়ে আছে, এবং নিজ ঘরে এসে

দরজার খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে।

০২. প্রচুর অন্ন-পানীয় এবং খাদ্য-ভোজ্য

প্রস্তুত করা হলেও সত্ত্বগণের কৃতকর্মের কারণে

কেউই তাদের স্মরণ করে না।

০৩. যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা যথাসময়ে

শুচি, উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত পানীয়-ভোজন

জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে এভাবে:

“এটি জ্ঞাতিদের হোক! জ্ঞাতিরা সুখী হোক!”

০৪. সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ সেখানে সমবেত হয়ে

প্রচুর অন্ন-পানীয়কে শ্রদ্ধাভরে অনুমোদন করে।

০৫. যাদের অনুগ্রহে পুণ্যফল লাভ করেছি

আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ দীর্ঘজীবী হোক।

এতে করে আমাদেরও পূজা করা হলো,

এবং দাতারাও নিষ্ফল হয় না।

০৬. সেখানে কৃষিকাজ নেই, গোপালন নেই,

সে-রকম কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই,

টাকাপয়সার বিনিময়ে বেচাকেনাও নেই,

এখান থেকে যা দেওয়া হয় তা দিয়েই

মৃত প্রেতরা সেখানে জীবনধারণ করে।

০৭. বৃষ্টির জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে

নিচু জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়,

ঠিক তদ্রূপ এখান থেকে প্রদত্ত দানই

প্রেতদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

০৮. নদীর জলধারা যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে,

ঠিক তদ্রূপ এখান থেকে প্রদত্ত দানই

প্রেতদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

০৯. সে আমায় কত কিছু দিয়েছিল,

সে আমার জন্য কত কিছু করেছিল,

সে আমার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সঙ্গী ছিল,

এভাবে তার পূর্বকৃত কাজের কথা

স্মরণ করেই প্রেতদের দান দেওয়া উচিত।

১০. কান্না, শোক এবং যা বাড়তি বিলাপ—

সেগুলো প্রেতদের কোনো কাজে লাগে না।

এভাবেই জ্ঞাতিগণ সেখানে বেঁচে থাকে।

১১. এই যে দান দেওয়া হয়েছে তা সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত,

এটি তাদের দীর্ঘকাল হিতসুখের জন্য

তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।

১২. এতে সেই জ্ঞাতিধর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো,

প্রেতদের মহৎ পূজা করা হলো,

ভিক্ষুদের বল বাড়িয়ে দেওয়া হলো,

তোমাদের দ্বারাও বিপুল পুণ্য করা হলো।

তিরোকুট্ট সূত্র সমাপ্ত।

# ৮. নিধিকণ্ড সূত্র

০১. গভীরে, জলের তলদেশে পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে,

কল্যাণকর কৃত্য দেখা দিলে আমার কাজে লাগবে ভেবে।

০২. রাজার উৎপাতে, চোরের উৎপীড়নে অথবা ঋণমুক্তিতে,

দুর্ভিক্ষে অথবা বিপদে-আপদে (আমার কাজে লাগবে)।

এসব উদ্দেশ্যেই পুরুষ জগতে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে।

০৩. গভীরে, জলের তলদেশে ঠিকমতো গচ্ছিত রাখলেও

সেগুলোর সবই সব সময় তার কাজে আসে না।

০৪. কারণ সম্পত্তি স্থানচ্যুত হতে পারে,

অথবা চিহ্নিত স্থানটি ভুলে যেতে পারে,

অথবা নাগগণ সরিয়ে নিতে পারে,

অথবা যক্ষরাও হরণ করতে পারে।

০৫. অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরাও

অজ্ঞাতে তুলে নিতে পারে,

আর যখন পুণ্যক্ষয় হয়

তখন তো সবই বিনষ্ট হয়ে যায়।

০৬. দানের দ্বারা, শীলের দ্বারা, সংযমের দ্বারা ও দমনের দ্বারা

যেই স্ত্রী বা পুরুষের সম্পত্তি সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়।

০৭. চৈত্যে বা সংঘে, ব্যক্তির মাঝে বা অতিথিদের মাঝে,

মাতা ও পিতার মাঝে, কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মাঝে।

০৮. এই সম্পত্তি সুগচ্ছিত, অজেয় ও অনুগামী।

সব ছেড়ে গমনীয়গুলোর মধ্যে এটি নিয়েই গমন করে।

০৯. এই সম্পত্তি অন্য সবকিছু হতে অসাধারণ,

এবং চোরেরা হরণ করতে পারে না।

ধীর ব্যক্তি পুণ্য করেন, যা অনুগামী সম্পত্তি।

১০. এই সম্পত্তি দেবমনুষ্যদের সকল মনস্কাম পূরণ করে দেয়,

তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১১. সুন্দর ত্বক, সুন্দর কণ্ঠস্বর, সুন্দর দৈহিক গঠন,

সুরূপতা, আধিপত্য ও পরিবার, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১২. প্রাদেশিক রাজত্ব, প্রভুত্ব, প্রিয় চক্রবর্তীসুখ ও দেবরাজত্ব,

এমনকি দিব্য সত্ত্বদের, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৩. মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোকে যা আনন্দ এবং

যা নির্বাণসম্পত্তি, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৪. যে মিত্রসম্পদকে ভিত্তি করে

সঠিকভাবে আত্মনিয়োগ করে,

তার বিদ্যাবিমুক্তিতে দক্ষতা—

সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৫. প্রতিসম্ভিদা, বিমোক্ষ এবং যা শ্রাবকপারমী,

পচ্চেকবোধি ও বুদ্ধভূমি, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

১৬. এই পুণ্যসম্পত্তি এমনই মহাকল্যাণপ্রদ।

তাই ধীর ও পণ্ডিতরা পুণ্য করাকে প্রশংসা করেন।

নিধিকণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

# ৯. মৈত্রী সূত্র

০১. “করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি

শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করে

সক্ষম, সোজা, সরল, সুবাধ্য,

মৃদুস্বভাব ও নিরহংকারী হন।”

০২. “তিনি সন্তুষ্ট, সুখে ভরণপোষণযোগ্য,

অল্পকৃত্য, লঘু জীবন-যাপনকারী, শান্ত-ইন্দ্রিয়,

বিচক্ষণ, অপ্রগল্ভ ও গৃহকুলে অনাসক্ত হন।”

০৩. “তিনি এমন কোনো ক্ষুদ্র অসদাচরণ করেন না,

যাতে অন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দা করতে পারেন।

সকল সত্ত্ব সুখী ও উপদ্রবহীন হোক!

সকল সত্ত্ব সুখীচিত্তের অধিকারী হোক!”

০৪. “অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে

যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে,

এবং যে-সকল লম্বা, বড়ো, মাঝারি, খাটো,

ক্ষুদ্র, মোটাসোটা প্রাণী ও জীবগণ আছে।”

০৫. “দৃষ্ট-অদৃষ্ট, যারা দূরে কিংবা কাছে বাস করে,

যারা জন্ম নিয়েছে কিংবা জন্মান্বেষী;

সকল সত্ত্বগণই সুখীচিত্তের অধিকারী হোক।”

০৬. “তারা একে অপরকে বঞ্চনা না করুক,

কোথাও কাউকে অবজ্ঞা না করুক।

তারা হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে

পরস্পরের দুঃখ কামনা না করুক।”

০৭. “মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে

প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করে,

তেমনি তিনিও সকল সত্ত্বগণের প্রতি

অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন।”

০৮. “তিনি ওপরে, নিচে ও মধ্যবর্তী দিকে,

সমস্ত জগতের প্রতি শত্রুহীন ও প্রতিপক্ষহীন,

অবাধ ও অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন।”

০৯. “দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া—

প্রতিটি ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তন্দ্রাভাব তাকে পেয়ে বসে,

ততক্ষণ তিনি এই মৈত্রীস্মৃতি অধিষ্ঠান করেন।

এখানে একেই ‘ব্রহ্মবিহার’ বলা হয়।

১০. “তিনি মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করে,

শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন;

কাম্য বিষয়ে লোভকে দমন করে,

পুনরায় গর্ভাশয়ে জন্মাতে আসেন না।”

মৈত্রী সূত্র সমাপ্ত।

খুদ্দকপাঠ সমাপ্ত।

খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত

**খুদ্দকপাঠ অর্থকথা**

বইয়ের এই পৃষ্ঠাটি ইচ্ছাকৃতভাবে খালি রাখা হয়েছে।

# গ্রন্থারম্ভ কথা

**আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি।**

**আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি।**

**আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।**

এই শরণ গ্রহণের বিবৃতি হচ্ছে ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে আদি বা প্রথম।

এখন এর অর্থ *পরমার্থজ্যোতিকা* নামক খুদ্দক অর্থকথায় বিবৃত করার জন্য, বিভক্ত করার জন্য, সহজবোধ্য করার জন্য এটি বলা হয়েছে:

আমি বন্দনার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে

উত্তম ত্রিরত্নকে বন্দনা নিবেদন করে,

ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর অর্থবর্ণনা করব।

এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলো অত্যন্ত গম্ভীর,

তাই আমার ন্যায় শাসন সম্পর্কে

অবোধ ব্যক্তির পক্ষে এর বর্ণনা

তুলে ধরা কিঞ্চিৎ অতি দুষ্করও বটে।

আমাদের পূর্বাচার্যদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আজও অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলমান,

যেহেতু নয় অঙ্গযুক্ত শাস্তাশাসন

এখনো সেভাবেই স্থিত আছে।

তাই তো আমি এই অর্থবর্ণনা

তুলে ধরার ইচ্ছা পোষণ করছি।

বুদ্ধের উপদেশের ওপর নির্ভর করে

গড়ে ওঠা প্রাচীন স্থবিরদের বিশ্লেষণ।

আমি সদ্ধর্মকে অত্যন্ত সম্মান জানিয়েই

এই অর্থবর্ণনা তুলে ধরছি, আত্মপ্রশংসা

কিংবা অন্যদের নিন্দা করবার জন্য নয়।

আপনারা তা একাগ্রমনে শ্রবণ করুন।

# ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা

এখানে “**আমি ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর অর্থবর্ণনা করব**” বলায় আমি প্রথমে ক্ষুদ্র বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে, পরে সেগুলোর অর্থবর্ণনা করব। ক্ষুদ্র বিষয়গুলো হচ্ছে খুদ্দকনিকায়ের একটি অংশ, খুদ্দকনিকায় হচ্ছে পাঁচটি নিকায়ের একটি অংশ। পাঁচটি নিকায় হচ্ছে—

দীর্ঘ, মধ্যম, সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক।

এই পাঁচটি নিকায় ধর্ম ও অর্থগতভাবে গভীর।

এখানে ব্রহ্মজাল সূত্র ইত্যাদি চৌত্রিশটি সূত্র মিলে **দীর্ঘনিকায়**। মূলপর্যায় সূত্র ইত্যাদি একশো বায়ান্নটি সূত্র মিলে **মধ্যমনিকায়**। প্লাবন অতিক্রম সূত্র ইত্যাদি সাত হাজার সাতশো বাষট্টিটি সূত্র মিলে **সংযুক্তনিকায়**। চিত্তকে অধিকার করা সূত্র ইত্যাদি নয় হাজার পাঁচশো সাতান্নটি সূত্র মিলে **অঙ্গুত্তরনিকায়**। খুদ্দকপাঠ, ধর্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সূত্রনিপাত, বিমানকাহিনি, প্রেতকাহিনি, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নির্দেশ (মহানির্দেশ ও চূলনির্দেশ), প্রতিসম্ভিদা (প্রতিসম্ভিদামার্গ), অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক, বিনয় ও অভিধর্মপিটক, অথবা চারটি নিকায় বাদে বাকি সমগ্র বুদ্ধবচনই হচ্ছে **খুদ্দকনিকায়**।

কিন্তু কেন এগুলোকে খুদ্দকনিকায় বলা হয়? বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মস্কন্ধের সমষ্টি ও নিবাস হওয়ার কারণে। সমষ্টি ও নিবাসকেই “নিকায়” বলা হয়। “হে ভিক্ষুগণ, আমি চিত্তের মতো অন্য একটি নিকায়কেও (অর্থাৎ নিবাসকেও) দেখছি না, যেমন, হে ভিক্ষুগণ, এই ইতর প্রাণীগুলো। (সং.নি.৩.১০০) কীটপতঙ্গের নিকায়, স্বেদজ প্রাণীদের নিকায়” এভাবে ইত্যাদি শব্দগুলো এখানে প্রজাতি ও জগতের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এটি হচ্ছে খুদ্দকনিকায়ের একটি অংশ। সূত্রপিটকভুক্ত এই উদ্দিষ্ট বিষয়গুলো বিবৃত, বিভাজিত ও সহজবোধ্য করার পক্ষে অর্থগতভাবে ক্ষুদ্র, সেই ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে শরণ, শিক্ষাপদ, দেহের বত্রিশটি অংশ, কুমার-প্রশ্ন, মঙ্গল সূত্র, রত্ন সূত্র, তিরোকুট্ট সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র ও মৈত্রী সূত্রের ভিত্তিতে নয় প্রকারে বিভক্ত “খুদ্দকপাঠ” বইটি হচ্ছে আদি বা প্রথম, তাও আবার আচার্য-পরম্পরা মৌখিক আবৃত্তির মধ্য দিয়ে চলে আসার ভিত্তিতে, ভগবান কর্তৃক বলার ভিত্তিতে নয়। ভগবান কর্তৃক বলার ভিত্তিতে—

“গৃহনির্মাতাকে খুঁজতে খুঁজতে তাকে না পেয়ে

আমি অনেক জন্মপরিভ্রমণ করেছি,

বারবার জন্মগ্রহণ করা দুঃখ।”

“হে গৃহনির্মাতা, এবার তোমার দেখা আমি পেয়েছি,

পুনরায় তুমি আর গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না।

তোমার কড়িকাঠ সব ভেঙে গেছে, গৃহচূড়া বিধ্বস্ত,

আমার বিধ্বংসগত চিত্ত তৃষ্ণাক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।”

(ধ.প.১৫৩-১৫৪)

এই গাথা দুটি সমগ্র বুদ্ধবচনের মধ্যে প্রথম। তাও আবার মনে মনে বলার ভিত্তিতে, মুখে উচ্চারণ করে বলার ভিত্তিতে নয়। কিন্তু মুখে উচ্চারণ করে বলার ভিত্তিতে—

“যখন সত্যিই ধর্মগুলো উৎপন্ন হয়

একজন উদ্যমী ও ধ্যানরত ব্রাহ্মণের।

এরপর সকল সন্দেহই দূর হয়ে যায়,

কারণ তিনি হেতুযুক্ত ধর্মকে জেনেছেন।” (উদা.১; মহাৰ.১)

এই গাথাটিই প্রথম। তাই নয়টি বিষয় সমন্বিত এই “খুদ্দকপাঠ” বইটি হচ্ছে এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মধ্যে আদি বা প্রথম, এখন আমি একদম শুরু থেকেই এর অর্থবর্ণনা আরম্ভ করব।

# গোড়াতেই খোলাসা করা

তন্মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে: “**আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি, আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।**” এর অর্থবর্ণনায় সংক্ষিপ্ত বিবরণী (*মাতিকা*) হচ্ছে এই:

“কার দ্বারা, কোথায়, কখন, কেন ত্রিশরণ ভাষিত হয়েছে;

কেন এটি এখানে একদম শুরুতেই বলা হয়েছে,

আর কেনই-বা বাকিগুলো শুরুতেই বলা হলো না।”

“এভাবে এখানে বিষয়টি গোড়াতেই খোলাসা করার পর,

বুদ্ধের শরণ গ্রহণ ও গ্রহণকারীকে ব্যাখ্যা করা হবে।”

“পার্থক্য, সুফল ও গ্রহণীয় ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করা হবে।

এভাবে ধর্মের শরণ ইত্যাদি অন্য দুটির ব্যাখ্যাও জানা যাবে।”

“ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, কারণও নির্দেশ করা হবে,

উপমাযোগে এই ত্রিশরণের কথাও প্রকাশ করা হবে।”

এখানে প্রথম গাথায় এই ত্রিশরণ কার দ্বারা ভাষিত হয়েছে, কোথায় ভাষিত হয়েছে, কখন ভাষিত হয়েছে, কেন ভাষিত হয়েছে, বাকিগুলো শুরুতে না বলে তথাগত কর্তৃক কেন এখানে একদম শুরুতেই এটি বলা হয়েছে, এই পাঁচটি প্রশ্ন।

সেগুলোর উত্তর হচ্ছে এই: **কার দ্বারা ভাষিত হয়েছে?** ভগবানের দ্বারা ভাষিত হয়েছে, কোনো শিষ্যের দ্বারা নয়, কোনো ঋষির দ্বারা নয়, কোনো দেবতার দ্বারা নয়। **কোথায়?** বারাণসীতে ঋষিপতন মৃগদায়ে। **কখন?** বন্ধুরাসহ আয়ুষ্মান যশ অর্হত্ত্ব লাভ করলে মোট একষট্টি জন অর্হৎ বহুজনের হিতের জন্য জগতে ধর্মদেশনা করার সময়। **কেন?** প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদানের জন্য। যেমন বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, এভাবেই প্রব্রজ্যা প্রদান করা উচিত, উপসম্পদা প্রদান করা উচিত। প্রথমে চুল-দাড়ি কামিয়ে দিয়ে, কাষায় বস্ত্র পরিয়ে দিয়ে, উত্তরাসঙ্গটিকে একাংশ করিয়ে দিয়ে, ভিক্ষুদের পায়ে বন্দনা করিয়ে, উবু হয়ে বসিয়ে (অর্থাৎ দুই হাঁটু ভাঁজ করে গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসিয়ে), দুহাত জোড় করে ‘এভাবে বলো’ বলতে হবে—‘আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি, আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি।’” (মহাৰ.৩৪)

**কেন এটি এখানে একদম শুরুতেই বলা হয়েছে?** এই নয় অঙ্গযুক্ত শাস্তাশাসনকে তিনটি পিটকে সংগৃহীত করে, মৌখিক আবৃত্তির মাধ্যমে ধারণকারী পূর্বাচার্যদের দ্বারা যেহেতু এই উপায়ে দেবতা ও মানুষেরা উপাসক হিসেবে বা প্রব্রজিত হিসেবে শাসনে প্রবেশ করেন, তাই এটি শাসনে প্রবেশের উপায়ের অন্তর্গত হওয়ায় এখানে এই *খুদ্দকপাঠ*-এ একদম শুরুতেই বলা হয়েছে বলে জানতে হবে।

গোড়াতেই খোলাসা করা সম্পন্ন হয়েছে।

\* \* \*

# ১. ত্রিশরণ বর্ণনা

## বুদ্ধ শব্দের ব্যাখ্যা

এখন “**বুদ্ধের শরণ গ্রহণ ও গ্রহণকারীকে ব্যাখ্যা করা হবে**” বলে যা বলা হয়েছে, এখানে সববিষয়ে অপ্রতিহত-জ্ঞান, অনুত্তর বিমোক্ষ লাভের দ্বারা পরিবর্ধিত পুঞ্জপ্রবাহ অনুসারে সাধারণভাবে পরিচিত, অথবা সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানের কাছাকাছি কারণ সত্যোপলব্ধি অনুসারে সাধারণভাবে পরিচিত বিশেষ সত্ত্বই হচ্ছেন বুদ্ধ। যেমন বলা হয়েছে:

“বুদ্ধ বলতে যিনি সেই ভগবান, স্বয়ম্ভূ, আচার্যবিহীন, যিনি অশ্রুতপূর্ব বিষয়গুলোর মধ্যে নিজেই সত্যগুলোকে উপলব্ধি করেছেন, সেসব বিষয়ে সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং বলগুলোতে দক্ষতা অর্জন করেছেন।” (মহানি.১৯২; চূল়নি. পারাযনত্থুতিগাথানিদ্দেস ৯৭; পটি.ম.১.১৬১)

এই পর্যন্ত হচ্ছে **অর্থ অনুসারে** বুদ্ধ শব্দের ব্যাখ্যা।

**ব্যঞ্জনা অনুসারে** কিন্তু “বুঝেছেন বিধায় বুদ্ধ, বুঝিয়ে দেন বিধায় বুদ্ধ” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে বুঝতে হবে। তাই তো বলা হয়েছে:

“বুদ্ধ বলতে কোন অর্থে বুদ্ধ? সত্যগুলো বুঝেছেন বিধায় বুদ্ধ, সত্ত্বগণকে বুঝিয়ে দেন বিধায় বুদ্ধ, সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন বিধায় বুদ্ধ, সবকিছু দর্শন করেছেন বিধায় বুদ্ধ, অন্য কারো দ্বারা পরিচালনার অযোগ্য বিধায় বুদ্ধ, বিকশিত হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, ক্ষীণাসব হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, উপক্লেশমুক্ত হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, একান্ত বীতরাগ হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, একান্ত বীতদোষ হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, একান্ত বীতমোহ হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, একান্ত কলুষতামুক্ত হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ, একমাত্র মার্গ দিয়ে গমন করেছেন বিধায় বুদ্ধ, একজন অনুত্তর সম্যক সম্বোধি উপলব্ধিকারী অর্থে বুদ্ধ, অবুদ্ধি (অজ্ঞান) ধ্বংস হওয়ায় ও বুদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করায় বুদ্ধ। ‘বুদ্ধ’ এই নামটি কোনো মায়ের রেখে দেওয়া নাম নয়, পিতার রেখে দেওয়া নাম নয়, ভাইয়ের রেখে দেওয়া নাম নয়, বোনের রেখে দেওয়া নাম নয়, বন্ধুবান্ধবদের রেখে দেওয়া নাম নয়, রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের রেখে দেওয়া নাম নয়, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের রেখে দেওয়া নাম নয়, দেবতাদের রেখে দেওয়া নাম নয়, এই চূড়ান্ত বিমোক্ষ বুদ্ধ ভগবানগণ বোধিমূলে সর্বজ্ঞতা-জ্ঞানসহ লাভ করেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ নামে এই পরিচিতি।” (মহানি. ১৯২; চূল়নি. পারাযনত্থুতিগাথানিদ্দেস ৯৭; পটি.ম.১.১৬২)

এখানে যেমন জগতে অবগত হওয়া ব্যক্তিকে ‘জ্ঞাত’ বলা হয়, তেমনি সত্যগুলোকে বুঝেছেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়। যেমন পাতা শুষ্ককারী বাতাসকে ‘পাতাশোষা’ বলা হয়, তেমনি সত্ত্বগণকে বুঝিয়ে দেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়। **সর্বজ্ঞতা লাভ করেছেন বিধায় বুদ্ধ** মানে সব বিষয়কে বুঝতে সক্ষম এমন বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আছে বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়েছে। **সবকিছু দর্শন করেছেন বিধায় বুদ্ধ** মানে সব বিষয়কে উপলব্ধি করতে সক্ষম এমন বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আছে বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়েছে। **অন্য কারো দ্বারা পরিচালনার অযোগ্য বিধায় বুদ্ধ** মানে অন্য কাউকেই তাঁকে বোঝাতে হয় না, তিনি নিজেই বোঝেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়েছে। **বিকশিত হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ** মানে নানা গুণ বিকশিত হওয়ার ভিত্তিতে তিনি পদ্মের মতোই বিকশিত হন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়েছে। **ক্ষীণাসব হয়েছেন বিধায় বুদ্ধ** মানে এভাবে ইত্যাদির দ্বারা চিত্তকে সংকুচিত করে এমন বিষয়গুলো পরিত্যাগের ভিত্তিতে নিদ্রাভঙ্গের মাধ্যমে বিশেষভাবে জাগ্রত ব্যক্তির মতো সকল কলুষতারূপ নিদ্রাভঙ্গের মাধ্যমে বিশেষভাবে জাগ্রত হয়েছেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়েছে। **একমাত্র মার্গ দিয়ে গমন করেছেন বিধায় বুদ্ধ** মানে বুদ্ধির প্রয়োজনে যাওয়ার মতো পর্যায়ের ভিত্তিতে পথ দিয়ে গমন করলে যেমন লোকটি গমন করেছেন বলা হয়, তেমনি একমাত্র মার্গ বা পথ দিয়ে গমন করেছেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়, এটি নির্দেশ করতেই বলা হয়েছে। **একজন অনুত্তর সম্যক সম্বোধি উপলব্ধিকারী অর্থে বুদ্ধ** মানে অন্য কারো দ্বারা উপলব্ধি করেননি বিধায় বুদ্ধ, তা ছাড়া তিনি নিজেই অনুত্তর সম্যক সম্বোধি উপলব্ধি করেছেন বিধায় ‘বুদ্ধ’ বলা হয়েছে। **অবুদ্ধি (অজ্ঞান) ধ্বংস হওয়ায় ও বুদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করায় বুদ্ধ** মানে বুদ্ধি, বুদ্ধ, বোধ—এগুলো হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক শব্দ। এখানে যেমন নীল রং, লাল রং মেশানোর ভিত্তিতে “নীল কাপড়, লাল কাপড়” বলা হয়, তেমনি ‍বুদ্ধির রং মেশানোর ভিত্তিতে বুদ্ধ, এই বিষয়টি জানাতেই এই শব্দবন্ধটি বলা হয়েছে। এরপর **‘বুদ্ধ’ এই নামটি কোনো মায়ের রেখে দেওয়া নাম নয়** মানে এভাবে ইত্যাদি অর্থ অনুসারেই এই পরিচিতি, অর্থাৎ উপলব্ধি করেছেন অর্থে বলা হয়েছে, এইভাবে সকল পদগুলো ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ সাধন করতে সক্ষম বলে বুঝতে হবে।

এই পর্যন্ত হচ্ছে **ব্যঞ্জনা অনুসারে** বুদ্ধ শব্দের ব্যাখ্যা।

## শরণ গ্রহণ ও গ্রহণকারীর ব্যাখ্যা

এখন **শরণ গ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে** হত্যা করে অর্থে শরণ, যাঁরা শরণ গ্রহণ করেন তাঁরা সেই শরণ গ্রহণের দ্বারা ভয়, সন্ত্রাস, দুঃখ, দুর্গতি, কলুষতাকে হত্যা করেন, ধ্বংস করেন, অপসারণ করেন, নিরুদ্ধ করেন, এই হচ্ছে এর অর্থ। অথবা এটি প্রবর্তনের দ্বারা অহিতকে এবং নিবর্তনের দ্বারা সত্ত্বদের ভয়কে হত্যা করেন এই অর্থে বুদ্ধ, ভবকান্তার হতে উত্তরণ করে এবং আশ্বাস প্রদান করে এই অর্থে ধর্ম, যারা অল্পমাত্রও পুণ্যকর্ম করে তাদের বিপুল ফল লাভ করায় এই অর্থে সংঘ। তাই এমনই হচ্ছে সেই ত্রিরত্নের শরণ। সেই ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নতা ও গৌরবের দ্বারা কলুষতাকে নিহত ও বিধ্বংস করা, ত্রিরত্নের প্রতি একনিষ্ঠভাব উৎপন্ন করা, অথবা স্বতঃপ্রণোদিত চিত্তোৎপত্তিই হচ্ছে শরণ গ্রহণ। সেসবের অধিকারী ব্যক্তিই সেই শরণ গ্রহণ করেন, অর্থাৎ উক্ত প্রকার চিত্তোৎপত্তির দ্বারা “ইনিই আমার শরণ, ইনিই আমার সহায়” এভাবে এঁকে গ্রহণ করেন অর্থে। গ্রহণ করার সময় “ভন্তে, আমরা ভগবান ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, হে ভগবান, আপনি আমাদের উপাসক হিসেবে গ্রহণ করুন” তপস্সু ও ভল্লিক ইত্যাদি ব্যক্তিদের মতো গ্রহণের মাধ্যমে, অথবা “ভন্তে, আপনিই আমার শাস্তা, হে ভগবান, আমি আপনার শিষ্য” (সং.নি.২.১৫৪) মহাকাশ্যপ স্থবির ইত্যাদি ব্যক্তিদের মতো শিষ্যত্ব বরণের দ্বারা, অথবা “এভাবে বললে ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ আসন হতে উঠে উত্তরাসঙ্গটিকে একাংশ করে, যেখানে ভগবান আছেন সেদিকে দুহাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করে, তিনবার উচ্ছ্বাস-গাথাটি (*উদান*) বলে উঠল—‘সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার। সেই ভগবান... সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার’” (ম.নি.২.৩৮৮) ব্রহ্মায়ু ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যক্তিদের মতো তাঁর দিকে অবনত হওয়ার দ্বারা, অথবা কর্মস্থান তথা ধ্যানে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মতো আত্মনিবেদনের দ্বারা, অথবা আর্য ব্যক্তিদের মতো শরণ গ্রহণ ও কলুষতা সমুচ্ছেদের দ্বারা, অনেক প্রকার বিষয় ও কৃত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন।

এই পর্যন্ত হচ্ছে শরণ গ্রহণ ও গ্রহণকারীর ব্যাখ্যা।

## পার্থক্য ও সুফলের ব্যাখ্যা

এখন “**পার্থক্য, সুফল ও গ্রহণীয় ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করা হবে**” বলে কথিত পার্থক্য ইত্যাদির এই হচ্ছে ব্যাখ্যা, এভাবে শরণ গ্রহণকারী ব্যক্তির দুই প্রকার শরণ গ্রহণ আছে, যেমন: সদোষ ও নির্দোষ। নির্দোষ শরণ গ্রহণ করা হয় মৃত্যুর মাধ্যমে, আর সদোষ শরণ গ্রহণ করা হয় অন্য কোনো শাস্তার শরণ পূর্বোক্ত প্রকারে গ্রহণ করার মাধ্যমে, অর্থাৎ তার শরণ উক্ত প্রকারে বিপরীতভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে। উক্ত দুই প্রকার শরণ গ্রহণ শুধু সাধারণ ব্যক্তির (*পুথুজ্জন*) ক্ষেত্রেই হয়। যারা বুদ্ধগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ, বুদ্ধগুণের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন করে, অশ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রদর্শন করে, তাদের শরণ কলুষিত হয়। আর্য ব্যক্তিদের শরণ কিন্তু কখনোই ভঙ্গ হয় না এবং তাঁদের শরণ অকলুষিতই হয়। যেমন বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, এটি কিছুতেই সম্ভব নয় এবং এর কোনো সুযোগই নেই যে, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য কোনো শাস্তার শরণ গ্রহণ করবেন।” (অ.নি.১.২৭৬; ম.নি.৩.১২৮; ৰিভ.৮০৯) সাধারণ ব্যক্তিরা যতক্ষণ শরণ ভঙ্গ না করেন ততক্ষণ অভগ্নশরণ। তাঁদের সদোষ শরণ সাধারণত যেকোনো সময় ভেঙে যায় এবং তা কলুষতাযুক্ত ও অপ্রীতিকর ফলদায়ক হয়। নির্দোষ শরণ সাধারণত কোনো ফল দেয় না বিধায় তা নিষ্ফল বা ফলহীন, ভঙ্গ না হলে কিন্তু তা সুফল হিসেবে প্রীতিকর ফলই দিয়ে থাকে।

যেমন বলা হয়েছে:

“যাঁরা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছেন,

তাঁরা অপায়ভূমিতে গমন করবেন না।

মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে তাঁরা

দেবকায়কে পরিপূর্ণ করবেন।” (দী.নি.২.৩৩২; সং.নি.১.৩৭)

এখানে যাঁরা শরণ গ্রহণ ও কলুষতাগুলোকে সমুচ্ছেদ করার মাধ্যমে শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অপায়ে গমন করবেন না। অন্যরা কিন্তু শরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে (অপায়ে) গমন করবেন না। এভাবেই গাথাটির উদ্দেশ্যকে বুঝতে হবে।

এই পর্যন্ত হচ্ছে পার্থক্য ও সুফলের ব্যাখ্যা।

## গ্রহণীয় ব্যক্তির ব্যাখ্যা

**গ্রহণীয় ব্যক্তির ব্যাখ্যার ব্যাপারে** নিন্দুকরা বলেন যে, “আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি” এখানে যিনি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছেন তিনি বুদ্ধকে গ্রহণ করুন কিংবা শরণকে গ্রহণ করুন, উভয় ক্ষেত্রেই যেকোনো একটি বাক্য নিরর্থক হয়ে যায়। কেন? গ্রহণকার্যের ক্ষেত্রে দুটো কর্মকারক বিদ্যমান না থাকার কারণে। এ ক্ষেত্রে শব্দচিন্তাবিদরা “ছাগলকে গ্রামে নিয়ে যায়” ইত্যাদির মতো দুটি কর্মকারক অনুমোদন করেন না।

[[[ বিজ্ঞ পাঠক, এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যাগুলো পালির বাক্যরীতি অনুসারেই করা হয়েছে, যা বাংলা বাক্যরীতির সঙ্গে সব সময় মেলে না। তাই এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যাগুলো পড়তে গিয়ে আপনাদের খানিকটা খটকা লাগতে পারে, অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু করার কিছুই নেই। অনুবাদ করার সময় এই অনুচ্ছেদটি বাদ দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। সঙ্গতিপূর্ণ মনে না হলেও অনেকটা বাধ্য হয়েই অনুবাদ করেছি।—অনুবাদক ]]]

কিন্তু “সে পূর্বদিকে গমন করে, সে পশ্চিমদিকে গমন করে” ইত্যাদিতে (সং.নি.১.১৫৯; ৩.৮৭) ব্যবহৃত হওয়ার মতো যদি সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয় তখন? না, কারণ বুদ্ধের শরণের সমান অধিকারণভাবটি (অর্থাৎ অধিকরণ কারকের অবস্থা) অভিপ্রেত নয় বলে। অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য যদি তা-ই হতো, তা হলে তো একজন প্রতিহতচিত্ত ব্যক্তি বুদ্ধের কাছে গমন করলে সেও বুদ্ধের শরণ গ্রহণকারী হয়ে যেত। তাই যা ‘বুদ্ধ’ ভেবে বিশেষায়িত শরণ, তা-ই শুধু সে গ্রহণ করেছে। “এই শরণই নিরাপদ, এই শরণই উত্তম” (ধ.প.১৯২) এই উক্তির ভিত্তিতে যদি সমান অধিকরণভাবযুক্ত হয় তখন? না, কারণ এ ক্ষেত্রেও একই ভাবযুক্ত বলে। সেই গাথায় এই বুদ্ধ ইত্যাদি ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণকারীদের ভয় দূর করে দেওয়া নামক শরণে খারাপভাবে বিচরণ করে না বিধায় “শরণ নিরাপদ ও উত্তম” এই সমান অধিকরণভাবই অভিপ্রেত, তা সত্ত্বেও অন্যত্র গমনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে শরণ গ্রহণ সিদ্ধ হয় না বিধায় তা অনভিপ্রেত, অর্থাৎ তখন সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করে না। “এই শরণ গ্রহণের ফলে সে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হয়” এখানে গমনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় যদি শরণ গ্রহণ সিদ্ধ না হয়, তা হলে যখন সমান অধিকরণভাবযুক্ত হয় তখন? না, কারণ পূর্বোক্ত দোষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বলে। এ ক্ষেত্রে সমান অধিকরণভাবযুক্ত ও প্রতিহতচিত্ত ব্যক্তি হলেও সে এই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণকে ভিত্তি করে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে, এভাবে পূর্বোক্ত দোষের সমান হয়ে যেত, আমাদের কোনো দোষের দরকার নেই, এই কথাটি আর খাটতো না। যেমন, “হে আনন্দ, আমার কল্যাণমিত্রকে ভিত্তি করেই জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্ম হতে মুক্ত হয়ে থাকে” (সং.নি.১.১২৯) এখানে ভগবান নামক কল্যাণমিত্রের প্রভাবে মুক্ত হতে থাকা সত্ত্বগণ “কল্যাণমিত্রকে ভিত্তি করে মুক্ত হয়ে থাকে” বলা হয়েছে। এভাবে এখানে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণের প্রভাবে মুক্ত হতে থাকা ব্যক্তি “এই শরণ গ্রহণ করে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হয়” বলা হয়েছে, এভাবে এখানে এই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য বলে বুঝতে হবে।

এভাবে বুদ্ধকে গ্রহণের ব্যাপারটা ঠিক পুরোপুরি মেলে না, শরণকে গ্রহণের ব্যাপারটাও না, উভয়কে গ্রহণের ব্যাপারটাও না, বরং আমি গ্রহণ করছি বলে আশা করা যেতে পারে, এভাবে উদ্দিষ্ট গ্রহণকারীর কাছে গ্রহণীয় ব্যক্তিকে, এখানে এটিই কি বলার মতো যুক্তি? উত্তরে বলা যায়—

এখানে বুদ্ধই হচ্ছে গ্রহণীয় ব্যক্তি, গ্রহণের ভাবটি দেখানোর জন্যই তাঁর শরণ কথাটি বলা হয়েছে, অর্থাৎ আমি বুদ্ধকে শরণ হিসেবে গ্রহণ করছি। ইনিই আমার শরণ, ইনিই আমার মূল লক্ষ্য, দুঃখের ত্রাতা, হিতের বিধাতা, এই উদ্দেশ্যেই আমি তাঁকে গ্রহণ করছি, সম্মান করছি, সেবা করছি, তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করছি, অথবা আমি তাঁকে এভাবে জানি, বুঝি। “হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বারা প্রব্রজ্যা দেওয়া আমি অনুমোদন করছি” ইত্যাদিতে (মহাৰ.৩৪) শরণ গ্রহণের ভিত্তিতে “গ্রহণের ভাবটি দেখানোর জন্যই তাঁর শরণ” যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটি তো ঠিক নয়। না, সেটি ঠিক। কেন? কারণ তার অর্থ প্রকাশ পায় বলে। এখানেও তার অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, এটিও আগের মতোই বেঠিক হওয়া সত্ত্বেও সঠিকের মতো বলে বুঝতে হবে। অন্যটিও পূর্বোক্ত দোষের সমান হয়ে যেত, তাই যেভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সেভাবেই গ্রহণ করা উচিত।

এই হচ্ছে গ্রহণীয় ব্যক্তির ব্যাখ্যা।

## ধর্ম ও সংঘের শরণের ব্যাখ্যা

এখন “**এভাবে ধর্মের শরণ ইত্যাদি অন্য দুটির ব্যাখ্যাও জানা যাবে**” বলে যা বলা হয়েছে, সে-ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এই যে এখানে “আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি” এর অর্থবর্ণনা করা হলো, “আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি, আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি” এই বাক্য দুটিতেও একই অর্থবর্ণনাই বুঝতে হবে। এখানে ধর্ম ও সংঘ শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনাগত ব্যাখ্যাই শুধু ভিন্ন, বাকিগুলো পূর্ববৎ। কারো কারো মতে, এখানে যা ভিন্ন তা হলো—মার্গ, ফল ও নির্বাণই হচ্ছে ধর্ম। যাঁরা মার্গ গড়ে তুলেছেন এবং যাঁরা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন তাঁদের অপায়ে অপতনভাবকে ধারণ করার ভিত্তিতে এবং পরম আশ্বাস প্রদানের ভিত্তিতে তাঁরা মার্গবিরাগসম্পন্ন ব্যক্তিই হন, এই অর্থে ধর্ম, এটিই আমাদের মত এবং এটি অগ্রপ্রসাদ সূত্রটিকেই প্রতিষ্ঠিত করে। সেখানে বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, যতগুলো সৃষ্ট বিষয় (ধর্ম) আছে সেগুলোর মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়” এভাবে ইত্যাদি। (অ.নি.৪.৩৪; ইতিৰু.৯০)

চতুর্বিধ আর্যমার্গের অন্তর্গত চারি শ্রামণ্যফল, সমাধি-চর্চিত পুঞ্জপ্রবাহের অধিকারী ব্যক্তিদের সমষ্টিই হচ্ছে সংঘ, কারণ তাঁরা দৃষ্টি ও শীলকে সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে সংহত করেছেন। তাই তো ভগবান বলেছেন:

“হে আনন্দ, তুমি কী মনে করো, যে উচ্চতর বিষয়গুলো আমি তোমাদের দেশনা করেছি, যেমন: চার স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা, চার সম্যক প্রচেষ্টা (*পধান*), চার ঋদ্ধিপাদ, পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি বল, সাতটি বোধির অঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, হে আনন্দ, তুমি কি দেখেছ যে এই বিষয়গুলোতে দুজন ভিক্ষুও ভিন্নমত পোষণ করছে?” (ম.নি.৩.৪৩)

এই পরমার্থ সংঘের শরণই গ্রহণীয়। এই সংঘ সম্পর্কেই সূত্রে বলা হয়েছে, “শ্রদ্ধাযোগ্য, আতিথেয়তাযোগ্য, দক্ষিণাযোগ্য, অঞ্জলি নিবেদনযোগ্য, জগতের অতুলনীয় পুণ্যক্ষেত্র।” (ইতিৰু. ৯০; অ.নি.৪.৩৪, ১৮১) তা সত্ত্বেও এই সংঘের শরণ গ্রহণকারী যদি অন্য কোনো ভিক্ষুসংঘকে, বা ভিক্ষুণীসংঘকে, বা বুদ্ধপ্রমুখ সংঘকে, বা সম্মতি সংঘকে, অথবা চারজনের সংঘ ইত্যাদি ভেদে কোনো একজন ব্যক্তিকে, অথবা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রব্রজিতকে বন্দনা ইত্যাদি করে তখন তার শরণ গ্রহণ ভঙ্গ হয় না, কলুষিত হয় না, এটিই এখানে পার্থক্য। শেষে এই দ্বিতীয় শরণ গ্রহণের পার্থক্য ইত্যাদি বিধান পূর্বোক্ত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই পর্যন্ত হচ্ছে “এভাবে ধর্মের শরণ ইত্যাদি অন্য দুটির ব্যাখ্যাও জানা যাবে” এই কথাটির বর্ণনা।

## ধারাবাহিক ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দেশ

এখন “**ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, কারণও নির্দেশ করা হবে**”এখানেএই তিনটি শরণ গ্রহণের কথার মধ্যে সকল সত্ত্বের মধ্যে অগ্র বা শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রথমে বুদ্ধ, তাঁর থেকেই এর জন্ম বা উদ্ভব এবং তাঁর দ্বারাই এটি দেশিত হয়েছে বিধায় তাঁর পরেই ধর্ম, সেই ধর্মের আধার হন বিধায় এবং ধর্মকে চর্চা করেন বিধায় শেষে সংঘ। অথবা সকল সত্ত্বের হিতের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন বিধায় প্রথমে বুদ্ধ, তাঁর থেকেই এর জন্ম বা উদ্ভব এবং এটি সকল সত্ত্বদের হিত সাধন করে বিধায় তাঁর পরেই ধর্ম, হিত লাভের উদ্দেশ্যে পথে নেমেছেন এবং হিত অধিগত করেছেন হিসেবে শেষে সংঘ। শরণ গ্রহণের মাধ্যমেই তাঁদের কথা ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবেই ধারাবাহিক ব্যাখ্যার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে।

## উপমাযোগে প্রকাশ

এখন “**উপমাযোগে এই ত্রিশরণের কথাও প্রকাশ করা হবে**” বলে যা বলা হয়েছে, সে-ব্যাপারে বলা যায় যে, এখানে কিন্তু বুদ্ধ হচ্ছেন পূর্ণচন্দ্রের মতো, তাঁর দেশিত ধর্ম হচ্ছে চন্দ্রকিরণের মতো, আর সংঘ হচ্ছে পূর্ণচন্দ্রের কিরণের স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় পুলকিত লোকজনের মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন দীপ্তিমান তরুণ সূর্যের মতো, উক্ত প্রকার ধর্ম হচ্ছে দীপ্তিমান তরুণ সূর্যের রশ্মিজালের মতো, আর সংঘ হচ্ছে তার আলোয় আলোকিত পৃথিবীর মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন বন পুড়িয়ে ফেলা ব্যক্তির মতো, কলুষতার বন দহনকারী ধর্ম হচ্ছে বন পুড়িয়ে ফেলা আগুনের মতো, আর কলুষতাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার কারণে পুণ্যক্ষেত্র হিসেবে গণ্য সংঘ হচ্ছে বন পুড়িয়ে ফেলায় ক্ষেত হিসেবে গণ্য জমিজমার মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন বিশাল মেঘের মতো, ধর্ম হচ্ছে বৃষ্টির জলের মতো, আর কলুষতার ধুলোমুক্ত সংঘ হচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার ফলে ধুলোমুক্ত জনপদের মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন সুদক্ষ সারথির মতো, ধর্ম হচ্ছে আজানীয় ঘোড়াকে দমনের উপায়ের মতো, আর সংঘ হচ্ছে সুদমিত আজানীয় ঘোড়ার পালের মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন সকল প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির কাঁটা তুলে ফেলার ভিত্তিতে শল্যচিকিৎসকের মতো, ধর্ম হচ্ছে কাঁটা তুলে ফেলার উপায় বা পদ্ধতির মতো, আর মিথ্যাদৃষ্টির কাঁটা উৎপাটিত সংঘ হচ্ছে কাঁটা উৎপাটিত ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন মোহছানি তুলে ফেলার ভিত্তিতে চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতো, ধর্ম হচ্ছে ছানি তুলে ফেলার উপায় বা পদ্ধতির মতো, আর মোহছানি তুলে ফেলা পরিষ্কার চোখের অধিকারী সংঘ হচ্ছে পরিষ্কার চোখওয়ালা ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন অনুশয় বা সুপ্ত প্রবণতাযুক্ত কলুষতার ব্যাধি দূর করে দিতে সমর্থ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো, ধর্ম হচ্ছে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা ওষুধের মতো, আর অনুশয় বা সুপ্ত প্রবণতাযুক্ত কলুষতার ব্যাধি থেকে সেরে ওঠা সংঘ হচ্ছে রোগ থেকে সেরে ওঠা জনমণ্ডলীর মতো।

অথবা, বুদ্ধ হচ্ছেন একজন সুদেশকের মতো, ধর্ম হচ্ছে যাতায়াতের সুন্দর রাস্তা আছে এমন নিরাপদ জায়গার মতো, আর সংঘ হচ্ছে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানো ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ নাবিকের মতো, ধর্ম হচ্ছে জাহাজের মতো, আর সংঘ হচ্ছে পাড়ে পৌঁছানো সফল ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন হিমালয়ের মতো, ধর্ম হচ্ছে সেখানে জন্মানো ওষুধের মতো, আর সংঘ হচ্ছে সেই ওষুধ খেয়ে আরোগ্য লাভ করা ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন ধনদাতার মতো, ধর্ম হচ্ছে ধনের মতো, আর সঠিক উপায়ে আর্যধনলাভী সংঘ হচ্ছে ইচ্ছেমতো ধনলাভী ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া ব্যক্তির মতো, ধর্ম হচ্ছে গুপ্তধন, আর সংঘ হচ্ছে গুপ্তধনলাভী ব্যক্তির মতো।

তা ছাড়া, বুদ্ধ হচ্ছেন অভয়দাতা বীরপুরুষের মতো, ধর্ম হচ্ছে অভয়ের মতো, আর সব ধরনের ভয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত সংঘ হচ্ছে অভয়লাভী ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন আশ্বাসদাতার মতো, ধর্ম হচ্ছে আশ্বাসের মতো, আর সংঘ হচ্ছে আশ্বস্ত ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন একজন ভালো বন্ধুর মতো, ধর্ম হচ্ছে হিতোপদেশের মতো, আর সংঘ হচ্ছে হিতোপদেশ মেনে উপকারলাভী ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন ধনী ব্যক্তির মতো, ধর্ম হচ্ছে ধনরাশির মতো, আর সংঘ হচ্ছে ধনরাশি ভোগকারী ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন রাজকুমারদের স্নান করানো ব্যক্তির মতো, ধর্ম হচ্ছে মাথাসহ স্নান করার জলের মতো, আর সদ্ধর্মের জলে স্নান করা সংঘ হচ্ছে সুন্দরভাবে স্নান করা রাজকুমারবৃন্দের মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন একজন অলংকার নির্মাতার মতো, ধর্ম হচ্ছে অলংকারের মতো, আর সদ্ধর্মের অলংকারে অলংকৃত সংঘ হচ্ছে অলংকৃত রাজপুত্রদের মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন চন্দনগাছের মতো, ধর্ম হচ্ছে চন্দনগন্ধের মতো, আর সদ্ধর্ম মেনে চলার মাধ্যমে অন্তর্দাহ প্রশমিত সংঘ হচ্ছে চন্দনপ্রলেপ ব্যবহার করে দেহজ্বালা জুড়ানো ব্যক্তির মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন উত্তরাধিকারদাতা পিতার মতো, ধর্ম হচ্ছে উত্তরাধিকার, আর সদ্ধর্মের উত্তরাধিকার গ্রহণকারী সংঘ হচ্ছে উত্তরাধিকার গ্রহণকারী পুত্রবর্গের মতো। বুদ্ধ হচ্ছেন প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো, ধর্ম হচ্ছে সেখানে উৎপন্ন মধুর মতো, আর সংঘ হচ্ছে সেই মধুসেবী মৌমাছির দলের মতো। এভাবেই এই ত্রিশরণের কথা উপমাযোগে প্রকাশ করা হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্বে “**কার দ্বারা, কোথায়, কখন, কেন ত্রিশরণ ভাষিত হয়েছে**” ইত্যাদি চারটি গাথার মাধ্যমে অর্থবর্ণনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে, তা অর্থ অনুসারে প্রকাশ করা হলো।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

ত্রিশরণ বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# ২. শিক্ষাপদ বর্ণনা

## শিক্ষাপদ পাঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

এভাবে শরণ গ্রহণের দ্বারা শাসনে প্রবেশের রাস্তা তুলে ধরার পর, শাসনে প্রবেশ করা একজন উপাসক কিংবা প্রব্রজিতের পক্ষে যেসব শিক্ষাপদ প্রথমে শিক্ষা করা উচিত সেগুলো তুলে ধরার জন্য আলোচ্য শিক্ষাপদ পাঠের বর্ণনা করতে গিয়ে এখন এই হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী—

“যার দ্বারা, যেখানে, যখন ও

যেই কারণে এগুলো বলা হয়েছে,

এই পদ্ধতিতে বলে সাধারণ ও

বিশেষের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।”

“সাধারণভাবে যা বর্জনীয় এবং

যা প্রজ্ঞাপনের কারণে বর্জনীয়,

প্রতিটি পদের ব্যঞ্জনা ও অর্থ অনুসারে

ভাগ ভাগ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।”

“সকল সাধারণ শিক্ষাপদের সাধারণ ব্যাখ্যা,

এরপর প্রথম পাঁচটির বিশেষার্থ প্রকাশ করা হয়েছে।”

“প্রাণিহত্যা হতে শুরু করে একতা-ভিন্নতা ইত্যাদি ভেদে,

তদ্রূপ বিষয়বস্তু, গ্রহণ, ভঙ্গ ও মহাদোষাবহ অনুসারে।”

“প্রয়োগ, অঙ্গ, সমুত্থান, অনুভূতি, মূল, কর্ম,

বিরতি ও ফল অনুসারে ব্যাখ্যা জানতে হবে।”

“এরপর শেষের পাঁচটিকেও যোগ করতে হবে,

বিশেষ বিধি, জ্ঞেয়, হীন ইত্যাদির কথাও বলতে হবে।”

এখানে প্রাণিহত্যা হতে বিরতি ইত্যাদি এই দশটি শিক্ষাপদ ভগবানের দ্বারাই বলা হয়েছে, কোনো শিষ্য ইত্যাদির দ্বারা নয়। এবং সেগুলো বলা হয়েছে শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে আয়ুষ্মান রাহুলকে প্রব্রজ্যা দিয়ে, কপিলবাস্তু হতে শ্রাবস্তীতে পৌঁছানোর পর শ্রামণদের জন্য শিক্ষাপদ বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তাই তো বলা হয়েছে:

“এরপর ভগবান কপিলবাস্তুতে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করে শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে সফর করতে করতে শ্রাবস্তীতে এসে পৌঁছালেন। তখন ভগবান প্রায় সময় শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের বিহারে বাস করতেন। সেই সময়... শ্রামণেরা মনে মনে চিন্তা করল—“আমাদের শিক্ষাপদ কয়টি? এবং আমাদের কী কী শিক্ষা করতে হবে?” তারা ভগবানকে সে বিষয়টি জানাল। ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি শ্রামণদের জন্য দশটি শিক্ষাপদ বেঁধে দিচ্ছি। সেগুলোই শ্রামণদের শিক্ষা করতে হবে। প্রাণিহত্যা হতে বিরতি... সোনা-রুপো গ্রহণ করা থেকে বিরতি।” (মহাৰ.১০৫-৬)

এই “শিক্ষাপদগুলো গ্রহণ করে শিক্ষা করে” (দী.নি.১.১৯৩; ম.নি.২.২৪) সূত্রগুলো অনুসারে এবং শরণ গ্রহণে নির্দেশিত পাঠ অনুসারে “আমি প্রাণিহত্যা হতে বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি” এভাবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে বলে বুঝতে হবে। এভাবে এই পর্যন্ত “যার দ্বারা, যেখানে, যখন ও যেই কারণে এগুলো বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে বলে” সেই পদ্ধতিটিকে দেখতে হবে।

## সাধারণ ও বিশেষের ব্যাখ্যা

এখানে একদম শুরুতেই চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুটি শিক্ষাপদকে উপাসক ও শ্রামণদের জন্য সাধারণ ও নিত্য প্রতিপাল্য শীল হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু উপোসথ শীল হিসেবে উপাসকদের জন্য সপ্তম ও অষ্টম শিক্ষাপদ দুটিকে একটি শীলে পরিণত করে, ন্যূনতম বর্জনীয় বিষয়গুলো সবই শ্রামণদের জন্য যা উপাসকদের জন্যও তাই, কিন্তু একদম শেষ শিক্ষাপদটি শ্রামণদের জন্য বিশেষ শীলের অন্তর্গত, এভাবে সাধারণ ও বিশেষের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে হবে। এখানে প্রথম পাঁচটি শিক্ষাপদ একান্তই অকুশলচিত্ত হতে সমুত্থিত হওয়ায় প্রাণিহত্যা ইত্যাদি হতে সাধারণভাবে বর্জনীয় হিসেবে বিরত থাকা উচিত, আর শেষোক্ত পাঁচটি শিক্ষাপদ হতে প্রজ্ঞাপনের কারণে বর্জনীয় হিসেবে বিরত থাকা উচিত, এভাবে সাধারণভাবে যা বর্জনীয় এবং যা প্রজ্ঞাপনের কারণে বর্জনীয়, তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

## সাধারণ ব্যাখ্যা

যেহেতু এখানে “আমি বিরতির শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি” এই কথাটি সবকটি শিক্ষাপদেই সাধারণভাবে বলা হয়েছে, তাই ব্যঞ্জনা ও অর্থের দিক থেকে এই কথাটির সাধারণ ব্যাখ্যা বুঝতে হবে—

এখানে **ব্যঞ্জনা অনুসারে** ব্যাখ্যা হচ্ছে এই:বৈরীকে বিনাশ করে অর্থে বিরতি, অর্থাৎ বৈরীকে পরিত্যাগ করে, দূর করে দেয়, শেষ করে দেয়, অদৃশ্য করে দেয়, এই হচ্ছে এর অর্থ। অথবা একজন ব্যক্তি এই কারণভুক্ত বৈরী হতে বিরত থাকে বলে বিরতি, অর্থাৎ বিকারকে বেকার করে দেয় বিধায় বিরতি। এর দ্বারা তারা এখানে “বিরতির শিক্ষাপদ, পরিহারের শিক্ষাপদ” দুইভাবে শিক্ষা করে। শিক্ষা করা উচিত অর্থে শিক্ষা, গাড়িযোগে গমন করে অর্থে পদ। শিক্ষার পদ এই অর্থে শিক্ষাপদ, অর্থাৎ শিক্ষা অর্জনের উপায় অর্থে। অথবা মূল, আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা বলা হয়েছে। বিরতিই শিক্ষাপদ এই অর্থে বিরতির শিক্ষাপদ, অথবা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পরিহারের শিক্ষাপদ। সঠিকভাবে মেনে নিচ্ছি অর্থে গ্রহণ করছি, অর্থাৎ অব্যতিক্রমের অভিপ্রায়ে, অখণ্ডভাবে পালনের দ্বারা, নিশ্ছিদ্রভাবে পালনের দ্বারা এবং বিশুদ্ধভাবে পালনের দ্বারা আমি গ্রহণ করছি বলা হয়েছে।

কিন্তু **অর্থ অনুসারে** ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: বিরতি মানে হচ্ছে কামাবচর কুশলচিত্তযুক্ত বিরতি, সেই প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তির “যা সেই সময়ে প্রাণিহত্যা থেকে ক্ষান্তি, বিরতি, প্রতিবিরতি, নিবৃত্তি, অক্রিয়া, অকরণ, অপরাধ-না-করা, সীমা অনতিক্রম, সেতু ধ্বংসকরণ” এভাবে ইত্যাদি (ৰিভ.৭০৪) প্রকারে *বিভঙ্গ* গ্রন্থে বলা হয়েছে। এই বিরতি আবার লোকোত্তরও আছে, তবে এখানে এটি “আমি গ্রহণ করছি” বলায় গ্রহণের ভিত্তিতেই প্রবর্তিত হওয়ার যোগ্য, তাই এটি লোকোত্তর বিরতি হয় না, কামাবচর কুশলচিত্তযুক্ত বিরতির কথাই এখানে বলা হয়েছে।

**শিক্ষা** বলতে তিন প্রকার শিক্ষা, যেমন: অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্ত শিক্ষা ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা। কিন্তু এখানে সম্প্রাপ্ত বিরতি শীল, লৌকিক, বিদর্শন, রূপারূপধ্যান ও আর্যমার্গ শিক্ষা হিসেবে অভিপ্রেত। যেমন বলা হয়েছে:

“কোন ধর্মগুলো শিক্ষা? যেই সময়ে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশলচিত্ত উৎপন্ন হয়,... সেই সময়ে স্পর্শ হয়... অবিক্ষেপ হয়, এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শিক্ষা।

“কোন ধর্মগুলো শিক্ষা? যেই সময়ে রূপলোকে উৎপত্তির মার্গ গড়ে তোলেন, কাম হতে পৃথক হয়ে, অকুশল-ধর্ম হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যান... পঞ্চম ধ্যানে প্রবেশ করে বাস করেন... অবিক্ষেপ হয়, এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শিক্ষা।

“কোন ধর্মগুলো শিক্ষা? যেই সময়ে অরূপলোকে উৎপত্তির... নৈবসংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন সহগত... অবিক্ষেপ হয়, এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শিক্ষা।

“কোন ধর্মগুলো শিক্ষা? যেই সময়ে দুঃখমুক্তির দিকে পরিচালনাকারী লোকোত্তর ধ্যান গড়ে তোলেন... অবিক্ষেপ হয়, এই ধর্মগুলোই হচ্ছে শিক্ষা।” (ৰিভ.৭১২-৭১৩)

এই সমস্ত শিক্ষার মধ্যে যেকোনো একটি শিক্ষার পদ, অর্জনের উপায়, অথবা মূল, আশ্রয়, প্রতিষ্ঠা হয় বিধায় শিক্ষাপদ। তাই তো বলা হয়েছে, “শীলের ওপর নির্ভর করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাতটি বোধির অঙ্গ (*বোজ্ঝঙ্গ*) গড়ে তুলতে তুলতে, বহুলভাবে চর্চা করতে করতে” এভাবে ইত্যাদি। (সং.নি.৫.১৮২) এভাবে এখানে ব্যঞ্জনা ও অর্থ অনুসারে সাধারণ পদগুলোর সাধারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

## প্রথম পাঁচটি শিক্ষাপদের বর্ণনা

এখন “**এরপর প্রথম পাঁচটির বিশেষার্থ প্রকাশ করা হয়েছে... ব্যাখ্যা জানতে হবে**” বলে যা বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বলা হয় যে, **প্রাণিহত্যা** মানে এখানে **প্রাণী** বলতে বোঝায় জীবিতেন্দ্রিয়নির্ভর পুঞ্জপ্রবাহ, অথবা সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সত্ত্ব। কিন্তু সেই প্রাণীকে প্রাণী মনে করে, সেই প্রাণীর জীবিতেন্দ্রিয় ছিন্ন করার উপক্রম জাগিয়ে দেয় এমন, কায় ও বাক্যদ্বারের কোনো এক দ্বারে উৎপন্ন বধচেতনাই হচ্ছে প্রাণিহত্যা। **অদত্তগ্রহণ** মানে এখানে **অদত্ত** বলতে বোঝায় অন্যের অধিকৃত, অন্যের দ্বারা গৃহীত, যেটিকে অন্য ব্যক্তি ইচ্ছামতো যা কিছুই করুক না কেন তাতে সে দণ্ডনীয় ও নিন্দনীয় হয় না, সেই ধরনের অন্যের অধিকৃত বা অন্যের দ্বারা গৃহীত জিনিসকে অন্যের অধিকৃত বা অন্যের দ্বারা গৃহীত জিনিস মনে করে সেটি গ্রহণের উপক্রম জাগিয়ে দেয় এমন, কায় ও বাক্যদ্বারের কোনো এক দ্বারে উৎপন্ন চুরিচেতনাই হচ্ছে অদত্তগ্রহণ। **অব্রহ্মচর্য** বলতে অশ্রেষ্ঠ চর্যা, দুজন দুজন মিলে মৈথুন সেবনের চেতনা এবং কায়দ্বায়ে উৎপন্ন অসদ্ধর্ম সেবনের স্থান ছাড়িয়ে যাওয়ার চেতনাই হচ্ছে অব্রহ্মচর্য। **মিথ্যাবাক্য** বলতে এখানে **মিথ্যা** মানে হচ্ছে মিথ্যাকথা বলাকে মুখ্য করে অর্থবোধক বাক্যের প্রয়োগ বা কায়িক প্রয়োগ, মিথ্যাকথা বলার উদ্দেশ্যে অন্যকে মিথ্যাকথা বলামূলক কায় ও বাক্যপ্রয়োগ উৎপন্ন করে এমন, কায় ও বাক্যদ্বারের কোনো এক দ্বারে উৎপন্ন মিথ্যাচেতনাই হচ্ছে মিথ্যাবাক্য। **সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ** বলতে এখানে **সুরা** মানে হচ্ছে পাঁচ প্রকার সুরা, যেমন: ময়দার সুরা, পিঠার সুরা, ভাতের সুরা, গাঁজনে প্রক্ষিপ্ত সুরা ও সবকিছুর সংমিশ্রণে তৈরি সুরা। **আসব** মানে হচ্ছে ফুলের আসব, ফলের আসব, গুড়ের আসব, মধুর আসব ও সবকিছুর সংমিশ্রণে তৈরি আসব, এই পাঁচ প্রকার আসব। **মদ** মানে হচ্ছে পূর্বোক্ত দুটোই নেশা উদ্রেক করে অর্থে মদ, অথবা অন্য যা কিছু মত্ততা উদ্রেককর দ্রব্য আছে, অর্থাৎ যা খেলে বা পান করলে মানুষ মাতাল হয়, প্রমত্ত হয়, একেই বলা হয় মদ। **প্রমাদের কারণ** মানে হচ্ছে মানুষ যেই চেতনায় তা পান করে, খায়, গলাধঃকরণ করে, সেই চেতনাকেই নেশা ও প্রমাদের হেতু হওয়ার ভিত্তিতে প্রমাদের কারণ বলা হয়, অর্থাৎ গলাধঃকরণের অভিপ্রায়ে কায়দ্বারে উৎপন্ন সুরা-আসব-মদ গলাধঃকরণের চেতনাই হচ্ছে “সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ” বলে বুঝতে হবে। এভাবেই এখানে এই পর্যন্ত প্রাণিহত্যা ইত্যাদির ব্যাখ্যা জানতে হবে।

## একতা-ভিন্নতা ইত্যাদির ব্যাখ্যা

**একতা-ভিন্নতা ইত্যাদি ভেদে** বলতে এখানে বলা হয়েছে, বধ্য-বধকারী-প্রয়োগ-চেতনা ইত্যাদির একতা বা অভিন্নতার কারণে কি প্রাণিহত্যা বা অদত্তগ্রহণ ইত্যাদির একত্ব ও ভিন্নতার কারণে নানাত্ব হয়, নাকি হয় না? কিন্তু কেন এটি বলা হয়? যদি একতার কারণে একত্ব হয়ে থাকে, তা হলে যখন একটি বধ্য প্রাণীকে বহু বধকারী হত্যা করে, অথবা একজন বধকারী বহু বধ্য প্রাণীকে হত্যা করে, অথবা একজন ব্যক্তি স্বাহস্তিক ইত্যাদি প্রয়োগ করে বহু বধ্য প্রাণীকে হত্যা করে, অথবা একটি চেতনা বহু বধ্য প্রাণীর জীবিতেন্দ্রিয় ছিন্ন করার প্রক্রিয়া উৎপন্ন করে, তখন একটিই প্রাণিহত্যা হতো। আর যদি ভিন্নতার কারণে নানাত্ব হয়ে থাকে, তা হলে যখন একজন বধকারী একটি ছুরি দিয়ে একবার আঘাত করে বহু বধ্য প্রাণীকে হত্যা করে, অথবা বহু বধকারী দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, সোমদত্ত ইত্যাদি বহুজনকে বহুবার আঘাত করেও মাত্র একজনকে, অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত অথবা সোমদত্তকে হত্যা করে, অথবা বহু ব্যক্তি স্বাহস্তিক ইত্যাদি প্রয়োগ করে একটিমাত্র বধ্য প্রাণীকে হত্যা করে, অথবা বহু চেতনা একটিমাত্র বধ্য প্রাণীর জীবিতেন্দ্রিয় ছিন্ন করার প্রক্রিয়া উৎপন্ন করে, তখন বহু প্রাণিহত্যা হতো। এ ক্ষেত্রে এই দুটোর কোনোটিই ঠিক নয়। তার মানে হচ্ছে, এই সমস্ত বধ্য ইত্যাদির একতা বা অভিন্নতার কারণে একত্ব, ভিন্নতার কারণে নানাত্ব, অথবা অন্য কোনোভাবে একত্ব ও নানাত্ব হয় না, প্রাণিহত্যার ক্ষেত্রে সেটিই হচ্ছে বক্তব্য, বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও তাই।

এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, এখানে প্রাণিহত্যার ক্ষেত্রে বধ্য প্রাণী, বধকারী ইত্যাদির প্রত্যেকটি একতা বা অভিন্নতার কারণে একত্ব নয়, ভিন্নতার কারণেই নানাত্ব হয়, কিন্তু বধ্য প্রাণী, বধকারী ইত্যাদির সমন্বিত একতার কারণে একত্ব হয়, যেকোনো দুটির ক্ষেত্রেও তাই, অথবা তন্মধ্যে কোনো একটির ভিন্নতার কারণে নানাত্ব হয়। একইভাবে বহু বধকারী বহু শরনিক্ষেপ ইত্যাদির দ্বারা অথবা গর্ত খোঁড়া ইত্যাদি একবার মাত্র প্রয়োগ করে বহু বধ্য প্রাণীকে হত্যা করলেও বহু প্রাণিহত্যা হয়। একজন বধকারী একবার বা দুবার প্রয়োগ করে সেই প্রয়োগ উৎপন্ন করে এমন এক বা বহু চেতনা দিয়ে বহু বধ্য প্রাণীকে হত্যা করলেও বহু প্রাণিহত্যা হয়, এবং বহু বধকারী উক্ত প্রকারে বহু বা একবার প্রয়োগ করে একটি বধ্য প্রাণীকে হত্যা করলেও বহু প্রাণিহত্যা হয়। এই নিয়ম অদত্তগ্রহণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এভাবে এখানে একতা ও ভিন্নতা ইত্যাদির ভিত্তিতেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**বিষয়বস্তু অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যার বিষয়বস্তু (আলম্বন) হচ্ছে জীবিতেন্দ্রিয়। অদত্তগ্রহণ, অব্রহ্মচর্য, সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণের বিষয়বস্তু হচ্ছে পদার্থের মধ্যে রূপায়তন ইত্যাদি কোনো একটি সৃষ্ট বিষয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি যাকে মিথ্যা বলে তাকে ভিত্তি করে উৎপন্ন হওয়ার ভিত্তিতে মিথ্যাকথার বিষয়বস্তু হচ্ছে সত্ত্ব। কারো কারো মতে, অব্রহ্মচর্যের বিষয়বস্তুও হচ্ছে সত্ত্ব। সত্ত্ব যখন চুরির যোগ্য হয় তখন অদত্তগ্রহণের বিষয়বস্তু হচ্ছে সত্ত্ব। তা সত্ত্বেও এখানে সৃষ্ট বিষয়ের ভিত্তিতেই অদত্তগ্রহণের বিষয়বস্তু হচ্ছে সত্ত্ব, প্রজ্ঞপ্তি তথা ধারণার ভিত্তিতে নয়। এভাবে এখানে বিষয়বস্তু অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**গ্রহণ অনুসারে** প্রাণিহত্যা হতে বিরতি ইত্যাদি এগুলো একজন শ্রামণ ভিক্ষুর কাছ থেকে গ্রহণ করলেই গৃহীত হয়, কিন্তু একজন উপাসক নিজে নিজে গ্রহণ করলেও গৃহীত হয়, এবং অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করলেও গৃহীত হয়। সবগুলো একসঙ্গে গ্রহণ করলেও গৃহীত হয়, আবার প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে গ্রহণ করলেও গৃহীত হয়। কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে গ্রহণের সময় একটিই বিরতি হয়, একটিই চেতনা হয়, শুধু কৃত্যের ভিত্তিতে এগুলোকে পাঁচটি হিসেবে জানা যায়। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে গ্রহণের সময় কিন্তু পাঁচটি বিরতি হয়, পাঁচটি চেতনা হয় বলে বুঝতে হবে। এভাবে এখানে গ্রহণ অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**ভঙ্গ অনুসারে** এখানে শ্রামণদের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষাপদ ভঙ্গ হলে সবগুলোই ভঙ্গ হয়। তন্মধ্যে যেগুলো পারাজিকা সমতুল্য সেগুলোর মধ্যে যেটিই লঙ্ঘিত হোক তার সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক থাকে। কিন্তু গৃহীদের একটি শীল ভঙ্গ হলে একটিই শুধু ভঙ্গ হয়, এরপর যখন তারা সেই শীলটি গ্রহণ করে তখন আবার পঞ্চাঙ্গিক শীল সুসম্পন্ন হয়। অন্যরা কিন্তু বলে যে, “আলাদা আলাদা করে গ্রহণ করলে একটি ভঙ্গ হলে একটিই শুধু ভঙ্গ হয়, ‘পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত শীল গ্রহণ করছি’ এভাবে একসঙ্গে গ্রহণ করলে কিন্তু একটি ভঙ্গ হলে বাকি সবগুলোও ভঙ্গ হয়। কেন? গ্রহণের প্রক্রিয়াটি অভিন্ন হওয়ার কারণে, যেটিই লঙ্ঘিত হোক তার সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক থাকে।” এভাবে এখানে ভঙ্গ অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**মহাদোষাবহ অনুসারে** বলতে গুণহীন ইতর প্রাণী ইত্যাদির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা করলে তা অল্পদোষাবহ হয়, দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে বড়সড়ো কোনো প্রাণীকে হত্যা করলে তা মহাদোষাবহ হয়। কেন? কারণ অনেক বেশি বল প্রয়োগ করতে হয় বলে। বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমান হলেও প্রাণীটি দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে বড়সড়ো হওয়ার কারণে। কিন্তু গুণবান মানুষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অল্পগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তা অল্পদোষাবহ হয়, মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তা মহাদোষাবহ হয়। শরীরের গড়ন ও গুণের দিক দিয়ে সমান হলেও কলুষতা ও উপক্রম মৃদু বা হালকা হলে অল্পদোষাবহ, তীব্র হলে মহাদোষাবহ বলে বুঝতে হবে। এই নিয়ম বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও খাটে। তা ছাড়া এখানে সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের স্থান হতে বিরতি শীলের লঙ্ঘন যতটা মহাদোষাবহ, প্রাণিহত্যা ইত্যাদি শীলগুলোর লঙ্ঘন ততটা নয়। কেন? কারণ সেটি একজন মানুষকে তার জীবদ্দশায় উন্মত্ততার দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আর্যধর্ম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এভাবে এখানে মহাদোষাবহ অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**প্রয়োগ অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যার ছয় প্রকার প্রয়োগ; যথা: স্বাহস্তিক, আদেশভিত্তিক (*আণত্তিক*), নিক্ষেপণীয় (*নিস্সগ্গিয*), স্থাবর, বিদ্যাময় ও ঋদ্ধিময়। এখানে দেহের দ্বারা কিংবা দেহসংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর দ্বারা প্রহার করাই হচ্ছে স্বাহস্তিক প্রয়োগ, সেটি আবার উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন-ভেদে দুই প্রকার। এখানে উদ্দেশ্যমূলক মানে হচ্ছে সে যাকে লক্ষ্য করে প্রহার করে, সেই প্রাণীটি মারা গেলে তাতে তার কর্ম হয়। “যে কেউই মরুক” এভাবে উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রহার করার কারণে যে কেউ মারা গেলে তাতেও তার কর্ম হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রহার করার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাক, কিংবা পরে তার কারণে মারা যাক, প্রহার করার ক্ষণেই তার কর্ম হয়। প্রথমে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রহার করে, সেই প্রহারের দ্বারা মারা না গেলে, পুনরায় অন্য উদ্দেশ্যে প্রহার করলে, পরে যদি সে প্রথম প্রহারের দ্বারাই মারা যায়, তখনো তার কর্ম হয়। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার প্রহারের দ্বারা তার কর্ম হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় প্রহারের দ্বারা মারা গেলেও প্রথম প্রহারের দ্বারাই শুধু তার কর্ম হয়, আর উভয় প্রহারের কোনোটির দ্বারাই মারা না গেলে তার কোনো প্রাণিহত্যা কর্ম হয় না। বহুজন মিলে একটি প্রাণীকে প্রহার করার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে। এ ক্ষেত্রেও যার প্রহারের দ্বারা প্রাণীটি মারা যায়, তারই শুধু কর্ম হয়।

কিন্তু নির্দিষ্ট করে আদেশ করাই হচ্ছে আদেশভিত্তিক প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রেও স্বাহস্তিক প্রয়োগে বর্ণিত নিয়মেই তার কর্ম হয় বলে মনে রাখতে হবে। এখানে ছয় প্রকার প্রয়োগের নিয়মকে বুঝতে হবে এভাবে:

“বিষয়বস্তু, সময়, স্থান, অস্ত্র, দৈহিক ভঙ্গিমা ও ক্রিয়াবিশেষ,

এই ছয়টি বিষয় হচ্ছে আদেশভিত্তিক প্রয়োগের নিয়ামক।”

(পারা.অট্ঠ.১৭৪)

এখানে **বিষয়বস্তু** মানে হচ্ছে হত্যাযোগ্য প্রাণী। **সময়** মানে হচ্ছে সকালবেলা, সন্ধ্যাবেলা ইত্যাদি সময় এবং যৌবন, সুস্থ-সবল থাকাকালীন ইত্যাদি সময়। **স্থান** মানে হচ্ছে গ্রাম, গঞ্জ, শহর, বন, রাস্তা কিংবা চৌরাস্তার মোড় ইত্যাদি। **অস্ত্র** মানে হচ্ছে তলোয়ার, তির কিংবা বর্শা ইত্যাদি। **দৈহিক ভঙ্গিমা** মানে হচ্ছে হত্যাযোগ্য প্রাণীর ও হত্যাকারীর দাঁড়ানো কিংবা বসা ইত্যাদি।

**ক্রিয়াবিশেষ** মানে হচ্ছে বিদ্ধ করা, ছেদন করা, ভেঙে ফেলা কিংবা চুলসহ মাথার ছাল তুলে শঙ্খের মতো সাদা করা ইত্যাদি। কেউ যদি প্রতারণা করে যাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে তাকে হত্যা না করে অন্য কাউকে হত্যা করে তখন আদেশকারীর কোনো কর্ম হয় না। কিন্তু যদি প্রতারণা না করে নির্দেশিত প্রাণীটিকেই হত্যা করে তখন আদেশকারীর আদেশ করার মুহূর্তে এবং আদিষ্ট ব্যক্তির হত্যা করার মুহূর্তে উভয়েরই কর্ম হয়। এই নিয়ম সময় ইত্যাদির ক্ষেত্রেও খাটে।

হত্যা করার জন্য দেহের দ্বারা কিংবা দেহসংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর দ্বারা প্রহার করা ও নিক্ষেপ করাই হচ্ছে নিক্ষেপণীয় প্রয়োগ। তাও উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন-ভেদে দুই প্রকার, এবং তার কর্ম হওয়ার ব্যাপারটিকেও এখানে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে।

হত্যা করানোর জন্য গর্ত খোঁড়া, না দেখে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা, অথবা ওষুধে বিষ মেশানো ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করাই হচ্ছে স্থাবর প্রয়োগ। তাও উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন-ভেদে দুই প্রকার, এবং এখানেও পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই তার কর্ম হয় বলে বুঝতে হবে। পার্থক্য শুধু এই: ফাঁদ পাতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে গর্ত খোঁড়া ইত্যাদির মধ্যে অন্যদের টাকা খাইয়ে অথবা মাগনা হলেও যদি তার কারণে কেউ মারা যায় তখন ফাঁদ পাতা ব্যক্তিরই কর্ম হয়। যদি সে নিজে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে সেই গর্তটিকে নষ্ট করে সমান করে মাটি ভরে দিলেও কাদা পরিষ্কারকারী ব্যক্তি কাদা পরিষ্কার করার সময়, অথবা মাটি খননকারী ব্যক্তি মাটি খোঁড়ার সময় গর্ত করে ফেলে, অথবা মেঘ বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মাটি কাদা হয়ে যায়, কেউ যদি সেখানে পড়ে মারা যায়, অথবা কাদা লেগে মারা যায়, তখনো ফাঁদ পাতা ব্যক্তিরই কর্ম হয়। কিন্তু যদি যে টাকা পেয়েছে সে নিজে অথবা অন্য কেউ সেটিকে আরো বড়ো বা আরো গভীর করে, তার কারণে কেউ মারা যায়, তখন দুজনেরই কর্ম হয়। যেমন টাকার সঙ্গে টাকার মিল হয়, তেমনি সেখানে সমান করলেও সে কর্ম থেকে মুক্তি পায়। একইভাবে না দেখে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সেসব ঘটনা অনুসারেই কর্ম হয় বলে বুঝতে হবে।

কিন্তু হত্যা করানোর জন্য বিদ্যা প্রয়োগ করাই (অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণ করাই) হচ্ছে বিদ্যাময় প্রয়োগ। দাঁতের অস্ত্র ইত্যাদির (অর্থাৎ সাপের বিষদাঁত ইত্যাদির) মধ্যে দাঁত দিয়ে কামড়ানো ইত্যাদির মতো হত্যা করানোর জন্য কর্মবিপাকজাত ঋদ্ধি প্রয়োগ করাই হচ্ছে ঋদ্ধিময় প্রয়োগ। অদত্তগ্রহণের ক্ষেত্রে চুরি, জোর করে কেড়ে নেওয়া, লুকিয়ে রাখা, কৌশল অবলম্বন করা, চিহ্ন বদলানোর মাধ্যমে চুরি করা, স্বাহস্তিক, আদেশভিত্তিক ইত্যাদি প্রয়োগ, সেগুলোর ব্যাখ্যা অনুসারেই পার্থক্যকে বুঝতে হবে। অব্রহ্মচর্য ইত্যাদি তিনটির ক্ষেত্রে স্বাহস্তিক প্রয়োগই শুধু প্রযোজ্য হয়। এভাবে এখানে প্রয়োগ অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**অঙ্গ অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যার পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে, যেমন: (১) প্রাণী হওয়া, (২) প্রাণী বলে মনে করা, (৩) হত্যাচিত্ত উৎপন্ন হওয়া, (৪) হত্যার উপক্রম করা, এবং (৫) সেই উপক্রমে প্রাণীটি মারা যাওয়া। অদত্তগ্রহণেরও পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে, যেমন: (১) অন্যের জিনিস হওয়া, (২) অন্যের জিনিস বলে মনে করা, (৩) চুরিচিত্ত উৎপন্ন হওয়া, (৪) চুরির উপক্রম করা, এবং (৫) সেই উপক্রমে গৃহীতব্য জিনিসটি গ্রহণ করা। অব্রহ্মচর্যের অঙ্গ কিন্তু চারটি, যেমন: (১) যৌনসংসর্গের উপযুক্ত বিষয় হওয়া, (২) যৌনসংসর্গের চিত্ত উৎপন্ন হওয়া, (৩) যৌনসংসর্গে লিপ্ত হওয়া, এবং (৪) আনন্দ উপভোগ করা। এর পরের দুটির ক্ষেত্রেও একই। এখানে মিথ্যাবাক্যের ক্ষেত্রে (১) বিষয়টি মিথ্যা হওয়া, (২) মিথ্যা বলার চিত্ত উৎপন্ন হওয়া, (৩) মিথ্যা বলার জন্য চেষ্টা করা, এবং (৪) অন্য কাউকে মিথ্যাকথাটি বলার সময় অভিব্যক্তির আকারে উৎপন্ন হওয়া, এই চারটি অঙ্গ বুঝতে হবে। সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণের ক্ষেত্রে কিন্তু (১) সুরা ইত্যাদির মধ্যে কোনো একটি হওয়া, (২) মদ্যপানের ইচ্ছামূলক চিত্ত উৎপন্ন হওয়া, (৩) মদ্যপানের জন্য চেষ্টিত হওয়া এবং (৪) মদ্যপান শুরু করে দেওয়া, এই হচ্ছে চারটি অঙ্গ। এভাবে এখানে অঙ্গ অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**সমুত্থান অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যা, অদত্তগ্রহণ ও মিথ্যাবাক্য কায়-চিত্ত হতে, বাক্য-চিত্ত হতে এবং কায়-বাক্য-চিত্ত হতে, এই তিনটি হতে সমুত্থিত হয়। অব্রহ্মচর্য কায়-চিত্তের ভিত্তিতে মাত্র একটি হতে সমুত্থিত হয়। সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ কায় হতে এবং কায়-চিত্ত হতে, এই দুটি হতে সমুত্থিত হয়। এভাবে এখানে সমুত্থান অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**অনুভূতি অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যা শুধু দুঃখানুভূতিযুক্ত। অদত্তগ্রহণ তিন প্রকার অনুভূতির মধ্যে যেকোনো এক প্রকার অনুভূতিযুক্ত, মিথ্যাবাক্যও তদ্রূপ। অন্য দুটি সুখানুভূতি কিংবা অদুঃখ-অসুখানুভূতিযুক্ত। এভাবে এখানে অনুভূতি অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**মূল অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যা হচ্ছে বিদ্বেষ-মোহমূলক। অদত্তগ্রহণ ও মিথ্যাবাক্য হচ্ছে লোভ-মোহমূলক, অথবা বিদ্বেষ-মোহমূলক। অন্য দুটি হচ্ছে লোভ-মোহমূলক। এভাবে এখানে মূল অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**কর্ম অনুসারে** এখানে প্রাণিহত্যা, অদত্তগ্রহণ ও অব্রহ্মচর্য হচ্ছে যুগপৎ কায়কর্ম এবং কর্মপথপ্রাপ্ত, মিথ্যাবাক্য হচ্ছে শুধুই বাক্যকর্ম। কিন্তু যে মিথ্যাবাক্যটি অহিত সাধন করে সেটি কর্মপথপ্রাপ্ত হয়। অন্যটি শুধু কর্মই হয়। অর্থাৎ সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ হচ্ছে শুধুই কায়কর্ম। এভাবে এখানে কর্ম অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**বিরতি অনুসারে** এখানে বলা হয়েছে, “প্রাণিহত্যা ইত্যাদি হতে বিরত হওয়ার সময় কী হতে বিরত হয়?” উত্তরে বলা যায়, গ্রহণের ভিত্তিতে বিরত হওয়ার সময় নিজেকে কিংবা অন্যদের হত্যা করা ইত্যাদি অকুশল হতে বিরত হয়। কাকে ভিত্তি করে? যা থেকে বিরত হয় সেটিকে ভিত্তি করে। সম্প্রাপ্তের ভিত্তিতেও বিরত হওয়ার সময় উক্ত প্রকার অকুশল হতেই বিরত হয়। কাকে ভিত্তি করে? প্রাণিহত্যা ইত্যাদির উক্ত আলম্বন বা বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে। কিন্তু কারো কারো মতে, “সুরা, আসব ও মদ নামক সৃষ্টিগুলোকে ভিত্তি করে সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ হতে বিরত হয়, কিন্তু সত্ত্বসৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা চুরিযোগ্য ও ক্ষতিযোগ্য সেটিকে ভিত্তি করে অদত্তগ্রহণ ও মিথ্যাবাক্য হতে এবং সত্ত্বদের ওপর ভিত্তি করে প্রাণিহত্যা ও অব্রহ্মচর্য হতে বিরত হয়।” সে-ব্যাপারে অন্যদের বক্তব্য হচ্ছে, “এমনটি হলে তো সে ‘একটি ভাবতে গিয়ে অন্যটি করে, যা ত্যাগ করে তা জানেই না’ এমন মতবাদী হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে যা ত্যাগ করে তা নিজেকে হত্যা করা ইত্যাদি অকুশলকে ভিত্তি করে বিরত হয়।” তা ঠিক নয়। কেন? বর্তমান ও বাহ্যিক আলম্বন বিদ্যমান না থাকার কারণে। শিক্ষাপদ সম্পর্কে *বিভঙ্গ* গ্রন্থে “পাঁচটি শিক্ষাপদের মধ্যে কয়টি কুশল... কয়টি নির্দোষ (*অরণ*)?” জিজ্ঞেস করে “কুশলই হয়, সুখানুভূতিযুক্ত হয়” (ৰিভ.৭১৬) এভাবে প্রদত্ত উত্তরে “বর্তমান আলম্বন” এবং “বাহ্যিক আলম্বন” এভাবে যেই বর্তমান ও বাহ্যিক আলম্বনের কথা বলা হয়েছে, সেটি নিজেকে হত্যা করা ইত্যাদি অকুশলকে ভিত্তি করে বিরত হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঠিক মেলে না। কিন্তু “একটি ভাবতে গিয়ে অন্যটি করে, যা ত্যাগ করে তা জানেই না” বলে যা বলা হয়েছে, এর উত্তরে—কাজটি করার ভিত্তিতে উৎপন্ন করার সময় সে একটি ভাবতে গিয়ে অন্যটি করে না, অথবা যা ত্যাগ করে তা জানেই না” এভাবে বলা হয়।

“অমৃতকে ভিত্তি করে যে সর্বপাপকে ত্যাগ করে,

এখানে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে মার্গস্থ আর্যব্যক্তি।”

এভাবে এখানে বিরতি অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

**ফল অনুসারে** প্রাণিহত্যা ইত্যাদি সবকটিই দুর্গতিতে বিপাক উৎপন্ন করে, সুগতিতে অনিষ্ট, অকান্ত, অমনোজ্ঞ বিপাক উৎপন্ন করে, পরকালে ও এই জন্মে আত্মবিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি বিপাক উৎপন্ন করে। তা ছাড়াও “যা প্রাণিহত্যার সবচেয়ে লঘু বিপাক তা হচ্ছে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে সে অল্পায়ু হয়” (অ.নি.৮.৪০) এভাবে ইত্যাদি প্রকারে এখানে ফল অনুসারেও ব্যাখ্যা জানতে হবে।

তা ছাড়া, এখানে প্রাণিহত্যা ইত্যাদি হতে বিরতির ব্যাখ্যাও সমুত্থান, অনুভূতি, মূল, কর্ম ও সুফলের ভিত্তিতে জানতে হবে। এ ক্ষেত্রে যা জানানোর মতো বিষয় তা হলো: সবকটি বিরতিই চারটি হতে সমুত্থিত হয়, যথা: কায় হতে, কায়-চিত্ত হতে, বাক্য-চিত্ত হতে এবং কায়-বাক্য-চিত্ত হতে। সবকটি বিরতিই সুখানুভূতিযুক্ত অথবা অদুঃখ-অসুখানুভূতিযুক্ত, অলোভ ও অবিদ্বেষমূলক অথবা অলোভ, অবিদ্বেষ ও অমোহমূলক। এখানে চারটি বিরতি কায়কর্ম, মিথ্যাবাক্য হতে বিরতি বাক্যকর্ম এবং সবকটি মার্গক্ষণে চিত্ত হতেই সমুত্থিত হয়, তখন সবগুলোই মনোকর্ম।

**প্রাণিহত্যা হতে বিরতির দ্বারা** এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা, দৈহিকভাবে লম্বা-চওড়া হওয়া, দ্রুতগতিতে দৌড়ানোর সক্ষমতা, সুপ্রতিষ্ঠিত পা, সৌন্দর্য, কোমলতা, শুচিতা, বীরত্ব, মহাশক্তিধর হওয়া, লোকজন তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথা বলে, লোকজন তাকে ভীষণ ভালোবাসে, বধিরতা, দলের মধ্যে ভাঙন না ধরা, আতঙ্কগ্রস্ত না হওয়া, লাঞ্ছিত না হওয়া, অন্যের হাতে মৃত্যু না হওয়া, বিশাল পরিবারের অধিকারী হওয়া, রূপবান হওয়া, সুগঠিত দেহের অধিকারী হওয়া, নিরোগী হওয়া, শোকাহত না হওয়া, প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তি বা বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া, দীর্ঘায়ু হওয়া, এভাবে ইত্যাদি সুফল লাভ হয়।

**অদত্তগ্রহণ হতে বিরতির দ্বারা** বিশাল ধনী হওয়া, প্রভূত ধনধান্যের অধিকারী হওয়া, অফুরন্ত ভোগসম্পত্তির অধিকারী হওয়া, অনুৎপন্ন ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হওয়া, উৎপন্ন ভোগসম্পত্তি স্থিতিশীল থাকা, যেসব ভোগসম্পত্তি আশা করে সেগুলো শিগগিরই লাভ করা, রাজা-চোর-জল-আগুন ও অপ্রিয় উত্তরাধিকারীদের চাইতে বেশি অসামান্য ভোগসম্পত্তির অধিকারী হওয়া এবং অসামান্য ধন লাভ করা, অন্যদের চাইতে উত্তম জিনিসের অধিকারী হওয়া, নেই কী জিনিস তা অনুভব না করা, সুখে অবস্থান করা, এভাবে ইত্যাদি সুফল লাভ হয়।

**অব্রহ্মচর্য হতে বিরতির দ্বারা** শত্রুহীন হওয়া, সকলের কাছে প্রিয় হওয়া, অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-শয্যা ইত্যাদি লাভ করা, সুখে ঘুমানো, সুখে ঘুম থেকে জেগে ওঠা, অপায়ভয় হতে মুক্ত হওয়া, নারীত্ব কিংবা নপুংসকত্ব লাভের অযোগ্য হওয়া, ক্রোধস্বভাবী না হওয়া, প্রত্যক্ষকারী হওয়া, উঁচু কাঁধওয়ালা হওয়া, অধোমুখী না হওয়া, নারী-পুরুষ পরস্পরের কাছে প্রিয় হওয়া, ইন্দ্রিয়গুলো পরিপূর্ণ হওয়া, পরিপূর্ণ লক্ষণসম্পন্ন হওয়া, আশঙ্কাহীন হওয়া, শান্তস্বভাবের হওয়া, সুখে অবস্থান করা, অকুতোভয় হওয়া, প্রিয়বিয়োগ না হওয়া, এভাবে ইত্যাদি সুফল লাভ হয়।

**মিথ্যাবাক্য হতে বিরতির দ্বারা** ইন্দ্রিয়-প্রফুল্লতা, মধুর স্বরে কথা বলার ক্ষমতা, সমান ও পরিষ্কার দাঁতের অধিকারী হওয়া, অতিরিক্ত মোটা না হওয়া, অতিরিক্ত কৃশকায় না হওয়া, অতিরিক্ত বেঁটে না হওয়া, অতিরিক্ত লম্বা না হওয়া, সুখস্পর্শী হওয়া, মুখ থেকে উৎপলের গন্ধ বের হওয়া, আত্মীয়-পরিজনরা তার কথা শোনা, তার কথা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া, কমল ও উৎপলসদৃশ নরম, লালচে ও পাতলা জিহ্বার অধিকারী হওয়া, অচঞ্চল হওয়া, অচপল হওয়া, এভাবে ইত্যাদি সুফল লাভ হয়।

**সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ হতে বিরতির দ্বারা** অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত করণীয় কাজ সম্পর্কে অতি দ্রুত বুঝতে পারা, সদা স্মৃতিমান হওয়া, উন্মাদ না হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, অনলস হওয়া, মাথামোটা না হওয়া, বধির ও বোবা না হওয়া, মাতাল না হওয়া, প্রমত্ত না হওয়া, সম্মোহিত না হওয়া, বিহ্বল না হওয়া, হঠাৎ রেগে না যাওয়া, উৎকণ্ঠিত না হওয়া, সত্যকথা বলা, বিভেদমূলক কথা না বলা, কর্কশ কথা না বলা, বাজে আলাপ না করা, রাতদিন অতন্দ্র হয়ে থাকা, কৃতজ্ঞ হওয়া, উপকারের কথা মুখ ফুটে বলা, অকৃপণ হওয়া, দানশীল হওয়া, শীলবান হওয়া, সরল হওয়া, অক্রোধী হওয়া, পাপে লজ্জী হওয়া, পাপভীরু হওয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, মহাপ্রাজ্ঞ হওয়া, মেধাবী হওয়া, পণ্ডিত হওয়া, হিতাহিত সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়া, এভাবে ইত্যাদি সুফল লাভ হয়। এভাবে এখানে প্রাণিহত্যা ইত্যাদি হতে বিরতির ব্যাখ্যা সমুত্থান, অনুভূতি, মূল, কর্ম ও সুফলের ভিত্তিতেও জানতে হবে।

## শেষের পাঁচটি শিক্ষাপদের বর্ণনা

এখন—

“এরপর শেষের পাঁচটিকেও যোগ করতে হবে,

ব্যতিক্রম, জ্ঞেয়, হীন ইত্যাদির কথাও বলতে হবে।”—

যা বলা হয়েছে তার অর্থবর্ণনা হচ্ছে এই: প্রথম পাঁচটি শিক্ষাপদের বর্ণনার সঙ্গে যা মিল পাওয়া যায় সেটি সেখান থেকে গ্রহণ করে শেষের পাঁচটি শিক্ষাপদে যোগ করতে হবে। এখানে এই হচ্ছে তার ব্যাখ্যা: যেমন প্রথম পাঁচটি শিক্ষাপদে **আলম্বন অনুসারে** সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণের আলম্বন বা বিষয়বস্তু হচ্ছে রূপায়তন ইত্যাদি কোনো একটি সৃষ্টি (*সঙ্খার*), এখানে বিকালে ভোজনের ক্ষেত্রেও তাই। এই নিয়মে সবকটি শিক্ষাপদের আলম্বনের পার্থক্যকে বুঝতে হবে। **গ্রহণ অনুসারে** যেমন প্রথম পাঁচটি একজন শ্রামণ কিংবা উপাসক কর্তৃক গ্রহণের মাধ্যমে গ্রহীত হয়, এগুলোর ক্ষেত্রেও তাই। **অঙ্গ অনুসারে** যেমন এখানে প্রাণিহত্যা ইত্যাদির বিভিন্ন ধরনের অঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তেমনি এখানেও বিকালে ভোজনের চারটি অঙ্গ রয়েছে, যেমন: (১) বিকাল হওয়া, (২) যাবকালিক খাদ্য হওয়া (অর্থাৎ সকালবেলা খাওয়ার উপযোগী খাদ্য হওয়া), (৩) গলাধঃকরণ করা, এবং (৪) উন্মাদ না হওয়া। এই অনুসারে বাকি শিক্ষাপদগুলোর অঙ্গগুলোকে বুঝতে হবে। যেমন এখানে **সমুত্থান অনুসারে** সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ কায় হতে ও কায়-চিত্ত হতে, এই দুটি হতে সমুত্থিত হয়, বিকালে ভোজনও তাই। এই নিয়মে সবকটি শিক্ষাপদের সমুত্থানকে বুঝতে হবে। যেমন এখানে **অনুভূতি অনুসারে** অদত্তগ্রহণ তিন প্রকার অনুভূতির মধ্যে যেকোনো এক প্রকার অনুভূতিযুক্ত, বিকালে ভোজনও তাই। এই নিয়মে সবকটি শিক্ষাপদের অনুভূতির সম্প্রয়োগ বা সংযোগকে বুঝতে হবে। যেমন এখানে **মূল অনুসারে** অব্রহ্মচর্য হচ্ছে লোভ-মোহমূলক, বিকালে ভোজনও তাই। অন্য দুটিকে এবং এই নিয়মে সবকটি শিক্ষাপদের মূলগত পার্থক্যকে বুঝতে হবে। যেমন এখানে **কর্ম অনুসারে** প্রাণিহত্যা ইত্যাদি কায়কর্ম, বিকালে ভোজন ইত্যাদিও তাই। কিন্তু কায়দ্বার ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপত্তির পর্যায় অনুযায়ী সোনা-রুপো গ্রহণ কায়কর্ম কিংবা বাক্যকর্ম হয়, কর্মপথের ভিত্তিতে নয়। **বিরতি অনুসারে** যেমন এখানে বিরত হওয়ার সময় নিজেকে কিংবা অন্যদের হত্যা করা ইত্যাদি অকুশল হতে বিরত হয়, তেমনি এখানে বিকালে ভোজন ইত্যাদি অকুশল হতে, অথবা একইসঙ্গে কুশল হতেও। যেমন প্রথম পাঁচটি বিরতি চারটি হতে সমুত্থিত হয়, যথা: কায় হতে, কায়-চিত্ত হতে, বাক্য-চিত্ত হতে এবং কায়-বাক্য-চিত্ত হতে; সবকটিই সুখানুভূতিযুক্ত কিংবা অদুঃখ-অসুখানুভূতিযুক্ত; সবকটিই অলোভ ও অবিদ্বেষমূলক অথবা অলোভ, অবিদ্বেষ ও অমোহমূলক; এবং সবকটিই নানা প্রকার ইষ্ট ফল উৎপন্ন করে, এখানেও তেমন।

“এরপর শেষের পাঁচটিকেও যোগ করতে হবে,

ব্যতিক্রম, জ্ঞেয়, হীন ইত্যাদির কথাও বলতে হবে।”—

এখানে কিন্তু **বিকালে ভোজন** বলতে মধ্যাহ্ন পার হয়ে যাওয়ার পর ভোজন করা। এটি হচ্ছে অনুমোদিত কাল বা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ভোজন করা, তাই এটিকে “বিকালে ভোজন” বলা হয়, সেই বিকালে ভোজন হতে। **নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দর্শন** বলতে এখানে **নাচ** মানে হচ্ছে যেকোনো ধরনের নাচ, **গান** মানে হচ্ছে যেকোনো ধরনের গান, **বাদ্য** মানে হচ্ছে যেকোনো ধরনের বাজনা। **বিরূপ দৃশ্য দর্শন** মানে হচ্ছে কলুষতা উৎপত্তির কারণ হওয়ার ভিত্তিতে কুশলপক্ষকে ধ্বংস করে বিরূপ দৃশ্য দেখা, অথবা বিরূপ দৃশ্যের মধ্যে পড়ে এমন কোনো দৃশ্য দেখাই হচ্ছে বিরূপ দৃশ্য দর্শন। এখানে বিরূপ দৃশ্য দর্শনকে ব্রহ্মজাল সূত্রে বর্ণিত নিয়মেই গ্রহণ করতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে:

“অথবা, যেমন কোনো কোনো মাননীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাপ্রদত্ত খাদ্য খেয়ে বিরূপ দৃশ্য দর্শনে নিয়োজিত হয়ে বাস করে; যেমন: নাচ, গান, বাদ্য, নাট্য প্রদর্শনী, ঐতিহাসিক কাহিনি, করতালি, মন্ত্রজপ, কুম্ভখুঁটি, অভিনেতার অভিনয়, লৌহগোলকের খেলা, বাঁশের খেলা, অস্থিধৌতকরণ, হাতির লড়াই, ঘোড়ার লড়াই, মোষের লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, ছাগলের লড়াই, ভেড়ার লড়াই, মোরগলড়াই, তিতির পাখির লড়াই, লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, নকল যুদ্ধ, সৈন্য গণনার স্থান, সৈন্যবিন্যাস, সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, অথবা এই জাতীয় বিরূপ দৃশ্য দর্শন হতে শ্রমণ গৌতম বিরত থাকেন। (দী.নি.১.১৩)

অথবা, যেভাবে বলা হয়েছে সেই ধরনের নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দেখাই হচ্ছে নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দর্শন; সেই নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দর্শন হতে। “দর্শন ও শ্রবণ” এই শব্দদুটির ক্ষেত্রে যেমন “সে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিপরীত দর্শনসম্পন্ন হয়” এভাবে ইত্যাদিতে (অ.নি.১.৩০৮) অচক্ষুদ্বারে উৎপন্ন হলেও বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করাকেই “দর্শন” বলা হয়েছে, তেমনি শ্রবণকেও “দর্শন” বলা হয়েছে। দর্শনের ইচ্ছায় গিয়ে দেখলে এখানে ব্যতিক্রম হয় (অর্থাৎ শীলভঙ্গ হয়)। কিন্তু দাঁড়ানো, বসা ও শোয়ার স্থানে দূর থেকে ভেসে আসা নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দেখলে, অথবা গমনের সময় চোখে পড়া নাচ, গান, বাদ্য ও বিরূপ দৃশ্য দেখলে তাতে কলুষতা হয় (অর্থাৎ পাপ হয়) বটে, কিন্তু ব্যতিক্রম হয় না (অর্থাৎ শীলভঙ্গ হয় না)। এ ক্ষেত্রে ধর্মাশ্রয়ী গানও (অর্থাৎ ধর্ম-সম্পর্কীত বা ধর্মীয় গানও) শুনতে পারে না, কিন্তু গীতাশ্রয়ী ধর্ম শুনতে পারে বলে বুঝতে হবে। [*ধম্মূপসংহিতম্পি চেত্থ গীতং ন ৰট্টতি, গীতূপসংহিতো পন ধম্মো ৰট্টতীতি ৰেদিতব্বো।*]

মালা ইত্যাদি ধারণ ইত্যাদি যথার্থ শব্দ যোগ করতে হবে। এখানে **মালা** মানে হচ্ছে ফুল দিয়ে তৈরি যেকোনো ধরনের মালা। **প্রসাধনী** মানে হচ্ছে গায়ে মাখার জন্য পিষে তৈরি করা যেকোনো প্রসাধনী। বাকি সব ধরনের সুগন্ধি চূর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি যেকোনো ধরনের সুগন্ধিই (পারফিউম) হচ্ছে **সুগন্ধি**। সেসব (রূপচর্চার উদ্দেশ্যে) গায়ে মাখতে পারে না, সেগুলো দিয়ে সাজগোজ করতে পারে না, কিন্তু রোগ হলে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। পূজা করার জন্য নিয়ে আসা হলে তা গ্রহণ করলেও কোনোভাবেই ব্যবহার করতে পারে না। **উচ্চশয্যা** মানে আদর্শ মাপের চাইতে উঁচু খাট। (উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে খাটের উচ্চতার আদর্শ মাপ হচ্ছে সুগত আঙুলে আট আঙুল, অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের এক হাত, ইন্সির হিসাবে ১৮ ইন্সি।) **মহাশয্যা** মানে হচ্ছে অননুমোদিত বিছানা ও বিছানার চাদর। উভয় প্রকার শয্যা গ্রহণ করলেও কোনোভাবেই ব্যবহার করতে পারে না। **সোনা** মানে হচ্ছে স্বর্ণ বা সুবর্ণ। **রুপো** মানে হচ্ছে মুদ্রা, টাকা-পয়সা, লোহার মুদ্রা, কাঠের মুদ্রা, গালা দিয়ে তৈরি মুদ্রা ইত্যাদি যে দেশে যে ধরনের মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, উভয়ই হচ্ছে সোনা-রুপো। যেকোনো প্রকারে এবং যেকোনো পর্যায়ে সেসব গ্রহণ করতে পারে না। এভাবেই বিশেষ বিধির কথা বলা উচিত।

এই দশটি শিক্ষাপদ হীন ইচ্ছার দ্বারা অথবা হীন চিত্ত, বীর্য ও গভীর বিবেচনার (*ৰীমংসা*) দ্বারা গৃহীত হলে হীন, মধ্যম ইচ্ছা ইত্যাদির দ্বারা গৃহীত হলে মধ্যম এবং উত্তম ইচ্ছা ইত্যাদির দ্বারা গৃহীত হলে উত্তম। অথবা তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও মানের দ্বারা কলুষিত হলে হীন, কলুষিত না হলে মধ্যম এবং স্থানে স্থানে প্রজ্ঞার দ্বারা অনুগৃহীত হলে উত্তম। অথবা জ্ঞানবিযুক্ত কুশলচিত্তের দ্বারা গৃহীত হলে হীন, প্ররোচিত (*সসঙ্খারিক*) কিন্তু জ্ঞানযুক্ত কুশলচিত্তের দ্বারা গৃহীত হলে মধ্যম এবং স্বতঃস্ফূর্ত (*অসঙ্খারিক*) ও জ্ঞানযুক্ত কুশলচিত্তের দ্বারা গৃহীত হলে উত্তম। এভাবেই জ্ঞেয়, হীন ইত্যাদিকেও বুঝতে হবে।

এই পর্যন্ত পূর্বে “**যার দ্বার, যেখানে, যখন ও যেই কারণে**” ইত্যাদি ছয়টি গাথাযোগে শিক্ষাপদ পাঠ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে যেই সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে, সেটি অর্থ অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

শিক্ষাপদ বর্ণনা সমাপ্ত।

# ৩. দেহের বত্রিশটি অংশের বর্ণনা

## শব্দগুলোর সম্পর্ক বর্ণনা

এখন এভাবে এই দশটি শিক্ষাপদ বিশুদ্ধভাবে চর্চা করে শীলে প্রতিষ্ঠিত কুলপুত্রের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং চিত্তকে গড়ে তোলার জন্য, যা বুদ্ধের উৎপত্তি না হলে অপ্রচলিতপূর্ব এবং সকল তীর্থিয়দের আওতার বাইরে, সেটিকে বিভিন্ন সূত্রে—

“হে ভিক্ষুগণ, একটি বিষয় গড়ে তুললে, বহুলভাবে চর্চা করলে তা মহাসংবেগের দিকে নিয়ে যায়। মহাকল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। মহান যোগক্ষেমের দিকে নিয়ে যায়। মহান স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। জ্ঞানদর্শন লাভের দিকে নিয়ে যায়। এই জীবনে সুখে অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়। বিদ্যাবিমুক্তিফল সাক্ষাৎ করার দিকে নিয়ে যায়। কোন একটি বিষয়? কায়গতস্মৃতি (অর্থাৎ দেহকে নিয়ে স্মৃতি)। হে ভিক্ষুগণ, যারা কায়গতস্মৃতি পরিভোগ করে না, তারা অমৃত পরিভোগ করে না। হে ভিক্ষুগণ, যারা কায়গতস্মৃতি পরিভোগ করে, তারা অমৃত পরিভোগ করে। হে ভিক্ষুগণ, যারা কায়গতস্মৃতি আরম্ভ করেছে তারা অপরিভুক্ত অমৃত পরিভোগ করেছে, হারানো অমৃত ফিরে পেয়েছে, অযত্ন করা অমৃতকে সমাদর করা শুরু করেছে।” (অ.নি.১.৫৬৪-৫৭০)

এভাবে ভগবান অনেক প্রকারে প্রশংসা করার পর—

“হে ভিক্ষুগণ, কায়গতস্মৃতিকে কীভাবে গড়ে তুললে ও কীভাবে বহুলভাবে চর্চা করলে মহাশক্তিশালী ও মহাসুফলদায়ক হয়? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অরণ্যে গিয়ে অথবা” (ম.নি.৩.১৫৪)

ইত্যাদি প্রকারে আনাপান পর্ব (শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্যান পর্ব), দৈহিক ভঙ্গিমা পর্ব, চার সম্প্রজ্ঞান পর্ব, দেহের ঘৃণ্যতায় মনোযোগ পর্ব, চার ধাতুতে মনোযোগ পর্ব, নয় প্রকার শ্মশানিক ধ্যান পর্ব, এই চৌদ্দটি পর্বের ভিত্তিতে কায়গতস্মৃতি কর্মস্থান বা ধ্যানের বিষয়বস্তু নির্দেশ করেছেন। এখন সেই ভাবনাটিকে ব্যাখ্যা করার সময় এসেছে। এখানে যেহেতু দৈহিক ভঙ্গিমা পর্ব, চার সম্প্রজ্ঞান পর্ব ও চার ধাতুতে মনোযোগ পর্ব, এই তিনটিকে বিদর্শনের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। নয় প্রকার শ্মশানিক ধ্যান পর্বটিকে বিদর্শন-জ্ঞানগুলোর মধ্যে বিপদানুদর্শনের ভিত্তিতে (*আদীনৰানুপস্সনাৰসেন*) বলা হয়েছে। আর এখানে মৃতদেহটি ফুলেফেঁপে উঠেছে (*উদ্ধুমাতক*) ইত্যাদিকে নিয়ে যেই সমাধি-ভাবনা লাভের আশা করা যায় সেটির সম্পর্কে *বিশুদ্ধিমার্গ* গ্রন্থের অশুভ ভাবনা নির্দেশে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু আনাপান পর্ব ও দেহের ঘৃণ্যতায় মনোযোগ পর্ব, এই দুটি সমাধির ভিত্তিতে বলা হয়েছে। তন্মধ্যে আনাপান পর্বটি আনাপান স্মৃতি বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্যানের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি কর্মস্থান। কিন্তু এই যে—

“পুনরায়, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু পায়ের পাতা থেকে ওপরদিকে এবং মাথার চুল থেকে নিচের দিকে পর্যবেক্ষণ করে দেখে। এই দেহ চামড়া দিয়ে আবৃত এবং নানা প্রকার অশুচি জিনিসে পরিপূর্ণ—‘এই দেহে আছে চুল, লোম... মূত্র।” (ম.নি.৩.১৫৪)

এভাবে বিভিন্ন স্থানে মগজকে হাড়ের মজ্জার অন্তর্ভুক্ত করে দেশিত কায়গতস্মৃতিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেহের বত্রিশটি অংশের কর্মস্থান বা ধ্যান শুরু হয়েছে, এই হচ্ছে তার অর্থবর্ণনা:—

এখানে **আছে** মানে হচ্ছে বিদ্যমান আছে। **এই** মানে হচ্ছে যা পায়ের পাতা থেকে ওপরদিকে এবং মাথার চুল থেকে নিচের দিকে চামড়া দিয়ে আবৃত এবং নানা প্রকার অশুচি জিনিসে পরিপূর্ণ বলা হয়, সেই। **দেহে** মানে হচ্ছে শরীরে। এই শরীর অশুচি জিনিসের ভাণ্ডার এই অর্থে, অথবা ঘৃণ্য চুল ইত্যাদি এবং চক্ষুরোগ ইত্যাদি শত শত রোগের উৎপত্তিস্থল এই অর্থে এটিকে ‘দেহ’ বলা হয়। **চুল... মূত্র** মানে এই চুল ইত্যাদি হচ্ছে দেহের বত্রিশটি অংশ, এখানে “এই দেহে চুল আছে, লোম আছে” এভাবেই এগুলোর সম্পর্কটিকে বুঝতে হবে। এর দ্বারা কী বলা হয়েছে? পায়ের পাতা থেকে ওপরদিকে, মাথার চুল থেকে নিচের দিকে, দেহের চারপাশটা চামড়া দিয়ে ঘেরা এই ব্যাম পরিমাণ (অর্থাৎ চার হাত পরিমাণ) এইটুকু কলেবরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কেউ কোনো মণি, মুক্তো, বৈদূর্যমণি, আগর, চন্দন, জাফরান বা কুঙ্কুম, কর্পূর, অথবা সুগন্ধি চূর্ণ ইত্যাদি বিন্দুমাত্রও শুচিভাব দেখতে পায় না, বরং পরম দুর্গন্ধযুক্ত, ঘৃণ্য ও দেখতে বিশ্রী চুল, লোম ইত্যাদি নানা রকম অশুচি জিনিসকেই সে দেখতে পায়।

এই পর্যন্ত হচ্ছে শব্দগুলোর সম্পর্ক বর্ণনা।

## অশুভ ভাবনা

অশুভ ভাবনার ভিত্তিতে এর বর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: এই প্রাণিহত্যা হতে বিরতির শিক্ষাপদ ইত্যাদি ভেদে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, পরিশুদ্ধভাবে চর্চা করে একজন নবীন কুলপুত্র ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার শুদ্ধি অধিগত করার জন্য দেহের বত্রিশটি অংশের কর্মস্থান ভাবনায় নিয়োজিত হতে চাইলে তার সামনে প্রথমে আবাস, পরিবার, লাভ, দল, কাজকর্ম, ভ্রমণ, আত্মীয়স্বজন, বইপত্র, ব্যাধি ও অলৌকিক শক্তির প্রতিবন্ধকতা, অথবা কীর্তি-প্রতিবন্ধকতাসহ দশটি প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। কিন্তু তাকে তো আবাস, পরিবার, লাভ, দল, আত্মীয়স্বজন ও কীর্তির বন্ধন পরিত্যাগ করে, কাজকর্ম, ভ্রমণ ও বইপত্রে মনোযোগ না দিয়ে, রোগ থাকলে চিকিৎসা করে, এভাবে মোট দশটি প্রতিবন্ধকতাকে ছিন্ন করতে হবে। প্রতিবন্ধকতাগুলোকে ছিন্ন করার পর তাকে কাঙ্ক্ষিত নৈষ্ক্রম্য লাভের ইচ্ছায় পরম সাদাসিধে জীবনযাপনের ব্রত গ্রহণ করে, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিনয়াচারকে পরিত্যাগ না করে, শাস্ত্রজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অর্জন সমন্বিত হয়ে, অথবা তন্মধ্যে যেকোনো একটি সমন্বিত হয়ে, বিনয়সম্মতভাবে কর্মস্থানদায়ক গুরুর কাছে গমন করতে হবে এবং ঠিকমতো ব্রতপালনের দ্বারা গুরুকে খুশি করে নিজের ইচ্ছার কথা নিবেদন করতে হবে। তখন তিনি তার নিমিত্ত, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-চরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি জেনে নিয়ে, যদি এই কর্মস্থান বা ধ্যানের বিষয়বস্তুটিই তার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন, এরপর তিনি নিজে যেই বিহারে বাস করেন সেও যদি সেই বিহারেই বাস করতে চায়, তখন তাকে সংক্ষেপে কর্মস্থান শিখিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সে যদি অন্যত্র বাস করতে ইচ্ছুক হয় তখন তাকে কোনটি পরিত্যাগ করা উচিত, কোনটি গ্রহণ করা উচিত ইত্যাদি কথা বলার মাধ্যমে, মুখ্যত লোভচরিত্রের উপযোগী ইত্যাদি কথা বলার মাধ্যমে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা উচিত। গুরুর কাছ থেকে এভাবে মুখ্যত ও সবিস্তারে কর্মস্থান শিক্ষা করে, গুরুর অনুমতি নিয়ে—

“মহা আবাস, নতুন আবাস, জীর্ণ আবাস,

রাস্তার ধারে আবাস, পুকুর, শাকসবজি,

ফুল, ফল ও বিখ্যাত আবাস।

শহরের আবাস, বাগান ও আবাদি জমি,

অনুপযোগী ব্যক্তি এবং বন্দরের আবাস,

প্রত্যন্ত অঞ্চল, রাজ্যসীমা ও অসুবিধা,

কল্যাণমিত্রের অভাব। পণ্ডিতদের বর্ণিত

এই আঠারোটি স্থানকে বিপজ্জনক পথের মতোই

দূর থেকে বর্জন করতে হয়।” (ৰিসুদ্ধি.১.৫২)

এভাবে যেই আঠারোটি আবাস বর্জন করা উচিত বলা হয়েছে, সেগুলো বর্জন করার পর—

“হে ভিক্ষুগণ, কীভাবে একটি আবাস পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত হয়? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, (১) যে আবাসটি বেশি দূরেও নয় আবার বেশি কাছেও নয়, আসা-যাওয়ার রাস্তাও আছে, (২) দিনের বেলা বেশি লোকজন থাকে না, রাতেও লোকজনের শব্দ খুব বেশি শোনা যায় না, (৩) মশা-মাছি, বাতাস, রোদ ও সরীসৃপের উপদ্রব বেশি নেই, (৪) কিন্তু সেই আবাসে অবস্থানকালে অনায়াসে চীবর, ভিক্ষান্ন, আবাস ও রোগীর যাবতীয় ওষুধপত্র পাওয়া যায়, এবং (৫) সেই আবাসে স্থবির ভিক্ষুগণ বসবাস করেন যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, সূত্রপিটকের চারটি নিকায় যাঁদের মুখস্ত, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতিকাধর, মাঝেমধ্যে তাঁদের কাছে গিয়ে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়—‘ভন্তে, এটি কী রকম? এর অর্থ কী?’ তখন তাঁরা অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন, দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ করে বুঝিয়ে দেন এবং অনেক ধরনের সন্দেহজনক বিষয়ে সন্দেহ দূর করে দেন। এভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, একটি আবাস পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত হয়।” (অ.নি.১০.১১)

এভাবে যেই পঞ্চাঙ্গ সমন্বিত আবাসের কথা বলা হয়েছে, সেই ধরনের আবাসে গিয়ে, সকল করণীয় কাজ সম্পন্ন করে, কাম্য বিষয়গুলোতে বিপদ এবং নৈষ্ক্রম্যে সুফল পর্যবেক্ষণ করে, বুদ্ধের বুদ্ধত্বগুণ, ধর্মের ধর্মগুণ ও সংঘের সুপথে গমনের গুণ অনুস্মরণ করে তাতে চিত্তকে প্রসন্ন করে—

“বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, বর্ণ দ্বারা, আকার দ্বারা,

দিক দ্বারা, অবস্থান দ্বারা ও সীমা দ্বারা—

এভাবে বিজ্ঞ ব্যক্তি সাত প্রকারে শিক্ষা করেন।”

এভাবে যেই সাত প্রকার শিক্ষা-কৌশলের কথা বলা হয়েছে, এবং ক্রমানুসারে, বেশি দ্রুত নয়, বেশি ধীরেও নয়, চিত্তবিক্ষেপ দূর করে, প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে, ক্রমানুসারে বাদ দিয়ে, অর্পণা অনুসারে এবং তিনটি সূত্র অনুসারে, এভাবে মোট দশ প্রকার মনোযোগ-কৌশলের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর কোনোটিকেই বাদ না দিয়ে দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনা শুরু করা উচিত। এভাবে শুরু করলে তবেই দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনা পুরোপুরি সফল হয়, অন্যথায় সফল হয় না।

এখানে একেবারে শুরুতেই চামড়া-পঞ্চক গ্রহণ করে একজন ত্রিপিটকধরকে “চুল, লোম” ইত্যাদি প্রকারে অনুক্রমে, তাতে দক্ষ হয়ে উঠলে “চামড়া, দাঁত” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে বিপরীত ক্রমে, তাতেও দক্ষ হয়ে উঠলে উভয় প্রকারে অনুক্রমে ও বিপরীত ক্রমে, বাইরে ঘুরে বেড়াতে থাকা চিন্তাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য, পালি শব্দগুলোতে দক্ষতা অর্জনের জন্য এবং মৌখিকভাবে দেহের অংশগুলোর স্বভাবকে ধরার জন্য মনে মনে অর্ধমাস ভাবনা করা উচিত। তার এই মৌখিক ভাবনা বাইরে ঘুরে বেড়াতে থাকা চিন্তাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে মনে মনে ভাবনা করার পক্ষে এবং পালি শব্দগুলোতে দক্ষতা অর্জনের পক্ষে সুবিধা হয়। অশুভ জিনিসের বর্ণ-লক্ষণগুলোর মধ্যে যেকোনো একটিকে গ্রহণ করে মনে মনে (অর্ধমাস) ভাবনা করা উচিত। এরপর ঠিক সেই পদ্ধতিতে কিডনি-পঞ্চক অর্ধমাস, এরপর উভয় পঞ্চক অর্ধমাস, এরপর ফুসফুস-পঞ্চক অর্ধমাস, এরপর সেই তিনটি পঞ্চক অর্ধমাস, এরপর মগজ-পঞ্চক অর্ধমাস, এরপর চারটি পঞ্চকও অর্ধমাস, এরপর মেদ-ষটক (অর্থাৎ ছয়টি বিষয়ের সমষ্টি) অর্ধমাস, এরপর মেদ-ষটকসহ পাঁচটি পঞ্চক অর্ধমাস, এরপর মূত্র-ষটক অর্ধমাস, এরপর দেহের বত্রিশটি অংশের সবকটিকে নিয়ে অর্ধমাস, এভাবে মোট ছয় মাস ধরে বর্ণ-আকার-দিক-অবস্থান-সীমার ভিত্তিতে নিরূপণ করে ভাবনা করা উচিত। এই পদ্ধতিটি মধ্যম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। মৃদুপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির আজীবন ভাবনা করা উচিত। কিন্তু তীক্ষ্ণপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির অচিরেই ভাবনা সফল হয়।

এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, “দেহের এই বত্রিশটি অংশকে কীভাবে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করতে হয়?” “এই দেহে আছে চুল” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে চামড়া-পঞ্চক ইত্যাদি বিভাগ অনুসারে দেহের এই বত্রিশটি অংশকে নিয়ে ভাবনা করার সময় সে **চুল**-কে বর্ণের দিক থেকে কালো বলে নিরূপণ করে, অথবা চোখে যে-রকম দেখা যায়। আকারের দিক থেকে এটিকে সে দাড়িপাল্লার লম্বা ও গোলাকার দণ্ডের ন্যায় বলে নিরূপণ করে। কিন্তু দিক অনুসারে যেহেতু এই দেহে নাভির ওপরে থাকলে তাকে ওপরে এবং নিচে থাকলে তাকে নিচে বলা হয়, তাই এটি এই দেহের ওপরদিকে উৎপন্ন বলে সে নিরূপণ করে। অবস্থানের দিক থেকে এটি কপালের কিনারা, কানের কাছে চুলের জট ও ঘাড়ের নিম্নাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ মাথার চামড়ায় উৎপন্ন। এ ক্ষেত্রে উইঢিবির চূড়ায় জন্মানো তৃণগুল্মগুলো যেমন “আমরা উইঢিবির চূড়ায় জন্মেছি” বলে জানতে পারে না, এবং উইঢিবির চূড়াও “আমার ওপর তৃণগুল্ম জন্মেছে” বলে জানতে পারে না, তেমনি চুল “আমরা মাথার চামড়ায় উৎপন্ন হয়েছি” বলে জানতে পারে না, মাথার চামড়াও “আমার ওপর চুল উৎপন্ন হয়েছে” বলে জানতে পারে না। এগুলো (অর্থাৎ চুলগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন, অনির্দিষ্ট, শূন্য, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, ঘৃণ্য ও জঘন্য, কোনো সত্ত্ব নয়, ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটিতে একই সীমা ও আলাদা সীমা হিসেবে দুই প্রকার সীমা আছে। এখানে চুল নিচে অবস্থিত চামড়ায় ধানের আগা পরিমাণ প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠিত নিজের মূল তথা গোড়া, ওপরে আকাশ এবং আড়াআড়িভাবে পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ, এভাবে একই সীমার ভিত্তিতে, এবং চুলগুলো বাদবাকি দেহের একত্রিশটি অংশ নয়, বাদবাকি দেহের একত্রিশটি অংশও চুল নয়, এভাবে আলাদা সীমার ভিত্তিতে সে নিরূপণ করে। এভাবে সে চুলগুলোকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

বাকিগুলোর মধ্যে **লোম**-কে সে বর্ণের দিক থেকে বেশির ভাগ সময় নীলবর্ণ হিসেবেই নিরূপণ করে, অথবা চোখে যে-রকম দেখা যায়। আকারে সেগুলো নিচে ধনুকের মতো বাঁকানো, অথবা ওপরে তালগাছের ডালের মতো বক্র। দিক অনুসারে সেগুলো দুদিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে সেগুলো হাত ও পায়ের তলা বাদে প্রায় বাকি সমস্ত শরীরের চামড়ায়উৎপন্ন হয়।

এখানে, পুরোনো গ্রামের মাটিতে জন্মানো দূর্বাঘাসগুলো যেমন “আমরা পুরোনো গ্রামের মাটিতে জন্মেছি” বলে জানে না এবং পুরোনো গ্রামের মাটিও “আমার ওপর দূর্বাঘাসগুলো জন্মেছে” বলে জানে না, তেমনি লোমগুলো “আমরা শরীরের চামড়ায় উৎপন্ন হয়েছি” বলে জানে না এবং শরীরের চামড়াও “আমার ওপর লোমগুলো উৎপন্ন হয়েছে” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ লোমগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন, অনির্দিষ্ট, শূন্য, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, ঘৃণ্য ও জঘন্য, কোনো সত্ত্ব নয়, ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে নিচে অবস্থিত চামড়ায় উকুনের ডিম পরিমাণ প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠিত নিজের মূল তথা গোড়া, ওপরে আকাশ এবং আড়াআড়িভাবে পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে লোমগুলোর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে লোমগুলোকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর **নখগুলো** যার পরিপূর্ণ তার বিশটি থাকে। সবকটি নখই বর্ণের দিক থেকে মাংসহীন স্থানে সাদা, মাংসের সঙ্গে লেপটে থাকা স্থানে তামাটে রঙের হয় বলে সে নিরূপণ করে। আকারে সেগুলো নিজ নিজ অধিষ্ঠিত স্থানের মতো, অনেকটা মহুয়া ফলের মতো, অথবা মাছের আঁশের মতো বলে সে নিরূপণ করে। দিক অনুসারে সেগুলো দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে সেগুলো আঙুলের মাথায় অবস্থিত।

এখানে, গ্রাম্য বালকদের দ্বারা লাঠির মাথায় রাখা মহুয়া ফলগুলো যেমন “আমাদের লাঠির মাথায় রাখা হয়েছে” বলে জানে না এবং লাঠিগুলোও “আমাদের মাথায় মহুয়া ফল রাখা হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি নখগুলো “আমরা আঙুলের মাথায় অবস্থিত” বলে জানে না এবং আঙুলগুলোও “আমাদের মাথায় নখগুলো অবস্থিত” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ নখগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে নিচে মূল তথা গোড়াগুলো আঙুলের মাংস অথবা প্রতিষ্ঠিত তলা, ওপরে ও নখগুলোর মাথায় আকাশ এবং উভয় পাশে আঙুলগুলোর উভয় পাশের চামড়া দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে নখগুলোর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে নখগুলোকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর **দাঁতগুলো** যার পরিপূর্ণ তার বত্রিশটি থাকে। সবকটি দাঁতই বর্ণের দিক থেকে সাদা হিসেবে সে নিরূপণ করে। যার দাঁতগুলো সমান তার দাঁতগুলো খসখসে পাতাছিন্ন সঙ্খপটলের মতো এবং সমানভাবে গাঁথা সাদা ফুলের মুকুলের মালার মতো দেখায়। কিন্তু যার দাঁতগুলো অসমান তার দাঁতগুলো জরাজীর্ণ আসনশালায় পরপর সাজানো ছোটো টুলের মতো নানা আকৃতির হয় বলে আকারের দিক থেকে সে নিরূপণ করে। সেগুলোর উভয় দাঁতের পাটির একেবারে শেষপ্রান্তে ওপরে এবং নিচে দুটি দুটি করে আটটি দাঁত ছোটো টুলের আকৃতির হয় যেগুলো চারটি তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট ও চতুর্মূলিক, সেগুলোর পাশে একই সারিতে বিন্যস্ত আটটি দাঁত ক্রুশাকৃতির হয় যেগুলো তিনটি তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট ও ত্রিমূলিক। আবার সেগুলোর পাশেই একই সারিতে ওপরে এবং নিচে একটি একটি করে চারটি দাঁত যানবাহনের ঠেসের আকৃতির হয় যেগুলো দুটি তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট ও দ্বিমূলিক। আবার সেগুলোর পাশেই একই সারিতে বিন্যস্ত চারটি লম্বা ছুঁচালো ধারালো দাঁত মল্লিকা কুঁড়ির আকৃতির হয় যেগুলো একটি তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট ও একমূলিক। এরপর উভয় দাঁতের পাটির মাঝামাঝি অবস্থানে নিচে চারটি, ওপরে চারটি করে আটটি দাঁত লাউয়ের বীজের আকৃতির হয় যেগুলো একটি তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট ও একমূলিক। দিক অনুসারে সেগুলো ওপরদিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে সেগুলো ওপরের চোয়ালের হাড়ে নিম্নমুখী তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট এবং নিচের চোয়ালের হাড়ে ঊর্ধ্বমুখী তীক্ষ্ণ প্রান্তবিশিষ্ট হয়ে অবস্থিত।

এখানে, নতুন বাড়ি নির্মাণকারী লোকের দ্বারা নিচের শক্ত মাটিতে পোঁতা ও উপরিতলে প্রবিষ্ট খুঁটিগুলো যেমন “আমরা নিচের শক্ত মাটিতে পোঁতা ও উপরিতলে প্রবিষ্ট” বলে জানে না এবং নিচের শক্ত মাটিও “আমার মধ্যে খুঁটিগুলো পোঁতা” বলে জানে না, উপরিতলটিও “আমার মধ্যে খুঁটিগুলো প্রবিষ্ট” বলে জানে না, তেমনি দাঁতগুলো “আমরা নিচের চোয়ালের হাড়ে অবস্থিত, ওপরের চোয়ালের হাড়ে প্রবিষ্ট” বলে জানে না, নিচের চোয়ালের হাড়টিও “আমার মধ্যে দাঁতগুলো অবস্থিত” বলে জানে না, ওপরের চোয়ালের হাড়টিও “আমার মধ্যে দাঁতগুলো প্রবিষ্ট” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ দাঁতগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে নিচে চোয়ালের হাড়ের গর্ত দিয়ে চোয়ালের হাড়টি প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠিত নিজের মূল বা গোড়া, ওপরে আকাশ এবং আড়াআড়িভাবে পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে দাঁতগুলোর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে দাঁতগুলোকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের ভেতরকার নানা ঘৃণ্য জিনিসের ভাণ্ডারকে আচ্ছাদনকারী **চামড়া**-কে সে বর্ণের দিক থেকে সাদা বলে নিরূপণ করে। যদিও ত্বকের রঙে রঞ্জিত হওয়ায় সেটি কালো, সাদা ইত্যাদি বর্ণের ভিত্তিতে নানাবর্ণের মতো দেখায় বটে, তা সত্ত্বেও একই বর্ণের ভিত্তিতে সেটি সাদাই হয়। অগ্নিশিখার অভিঘাত, প্রহরণ, প্রহার ইত্যাদির দ্বারা ত্বকের সেই পাতলা আবরণটি ধ্বংস হলে তখন চামড়ার সেই সাদাভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আকারের দিক থেকে সংক্ষেপে বললে সেটি জ্যাকেট বা জামা আকৃতির, আর বিস্তারিতভাবে বললে নানা আকৃতির হয়। সেই অনুসারে পায়ের আঙুলের চামড়া হচ্ছে রেশম পোকার কোষাকৃতি, পায়ের পৃষ্ঠের চামড়া হচ্ছে পুঁটলি দিয়ে আবদ্ধ জুতোর আকৃতি, জঙ্ঘার (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ) চামড়া হচ্ছে তালপাতা দিয়ে বানানো ভাতের পুঁটলির আকৃতি, ঊরুর চামড়া হচ্ছে চালভর্তি লম্বা বস্তার আকৃতি, নিতম্ব বা পাছার চামড়া হচ্ছে জলভর্তি জলছাঁকনির আকৃতি, পিঠের চামড়া হচ্ছে তক্তার ওপর বিছানো চামড়ার আকৃতি, পেটের চামড়া হচ্ছে বীণার খোলের ওপর বিছানো চামড়ার আকৃতি, বুকের চামড়া হচ্ছে অনেকটা চৌকোনা, দুই বাহুর চামড়া হচ্ছে তূণের ওপর বিছানো চামড়ার আকৃতি, হাতের পৃষ্ঠের চামড়া হচ্ছে ক্ষুরের খোপের আকৃতি, অথবা চিরুনির খোপের আকৃতি, হাতের আঙুলের চামড়া হচ্ছে চাবির খোপের আকৃতি, গলার চামড়া হচ্ছে গলার বর্মের আকৃতি, মুখের চামড়া হচ্ছে কোনো পোকার দ্বারা ছিন্নভিন্ন পাখির বাসার আকৃতি, মাথার চামড়া হচ্ছে ছাবেকের ঝোলার আকৃতি।

চামড়াকে (ধ্যানের বিষয়বস্তু হিসেবে) গ্রহণকারী যোগীর দ্বারা ওপরের ঠোঁট থেকে শুরু করে চামড়া ও মাংসের মাঝখানে চিত্তকে প্রেরণ করে, প্রথমে মুখের চামড়া নিরূপণ করা উচিত, এরপর মাথার চামড়া, এরপর গলার বাইরের চামড়া, এরপর অনুক্রমে ও বিপরীত ক্রমে ডান হাতের চামড়া। এরপর সেই ক্রম ধরে বাম হাতের চামড়া, এরপর পিঠের চামড়া, নিতম্ব বা পাছার চামড়া, এরপর অনুক্রমে ও বিপরীত ক্রমে ডান পায়ের চামড়া, এরপর বাম পায়ের চামড়া, এরপর মূত্রাশয়, উদর, হৃৎপিণ্ড ও গলার ভেতরের চামড়া, এরপর নিচের চোয়ালের চামড়া, এরপর নিচের ঠোঁটের চামড়া। এভাবে পুনরায় ওপরের ঠোঁটের চামড়া পর্যন্ত। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি সারা শরীরকে মুড়ে রেখেছে।

এখানে, ভেজা চামড়ায় মোড়া পেটিকাটির ভেজা চামড়া যেমন “আমার দ্বারা পেটিকাটি মোড়া” বলে জানে না, এবং পেটিকাটিও “আমি ভেজা চামড়ায় মোড়া” বলে জানে না, তেমনি চামড়াও “আমার দ্বারা এই চারটি মৌলিক উপাদানের গঠিত দেহটি আবৃত” বলে জানে না, এবং এই চারটি মৌলিক উপাদানে গঠিত দেহটিও “আমি চামড়ায় আবৃত” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ চামড়াগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। এটি কেবল—

“ভেজা চামড়ায় আবৃত, নয়টি দ্বারসম্পন্ন

ও বিশাল ফোড়াবিশিষ্ট, যার চারপাশ থেকে

পচা দুর্গন্ধযুক্ত অশুচি নিঃসৃত হয়।”

সীমার দিক থেকে এটি নিচে মাংস দিয়ে প্রতিষ্ঠিত তলের দ্বারা, অথবা ওপরে ত্বকের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে চামড়ার একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে চামড়াকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে নয়শো পেশি দিয়ে গঠিত **মাংস**-কে বর্ণের দিক থেকে সে রক্তপলাশ ফুলসদৃশ বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি নানা আকৃতির হয়। সেই অনুসারে জঙ্ঘার (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ) মাংস হচ্ছে তালপাতা দিয়ে বানানো ভাতের পুঁটলির আকৃতি, আবার কারো কারো মতে অবিকশিত কৃমিকুলের আকৃতি। ঊরুর মাংস হচ্ছে সুধা চূর্ণ করার পাটার নোড়ার আকৃতি, নিতম্ব বা পাছার মাংস হচ্ছে উনুনের প্রান্তের আকৃতি, পিঠের মাংস হচ্ছে তালের গুড়ের পাতলা খণ্ডের আকৃতি, দুই পাঁজরের মাঝখানকার মাংস হচ্ছে শস্যাগারের ভেতরের পাতলা মাটির প্রলেপের আকৃতি, স্তনের মাংস হচ্ছে পড়ে যাওয়া গোলাকার মাটির দলার আকৃতি, দুই বাহুর মাংস হচ্ছে লেজ, মাথা ও পা-কাটা এবং চামড়া তুলে ফেলা বিশাল ইঁদুরের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে ফোলা মাংসের আকৃতি। গালের মাংস হচ্ছে গালে রাখা করঞ্জবীজের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে ব্যাঙের আকৃতি। জিভের মাংস হচ্ছে নুহীপাতার আকৃতি, নাকের মাংস হচ্ছে অধোমুখ করে রাখা পাতার থলের আকৃতি, চক্ষুকোটরের মাংস হচ্ছে আধপাকা ডুমুরের আকৃতি, মাথার মাংস হচ্ছে পাত্র পোড়ানোর সময় কড়াইয়ে হালকা প্রলেপের আকৃতি। মাংসকে (ধ্যানের বিষয়বস্তু হিসেবে) গ্রহণকারী যোগীর দ্বারা এই সমস্ত স্থূল মাংসকে আকারের ভিত্তিতে নিরূপণ করা উচিত। এভাবে নিরূপণ করতে পারলে সূক্ষ্ম মাংসগুলোও জ্ঞানগোচর হয়। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি তিন শতাধিক হাড়ের ওপর লেপটে আছে।

এখানে, পুরু মাটি দিয়ে লেপা দেয়ালের পুরু মাটি যেমন “আমার দ্বারা দেয়াল লেপা হয়েছে” বলে জানে না, এবং দেয়ালও “আমাকে পুরু মাটি দিয়ে লেপা হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি নয়শো পেশি দিয়ে গঠিত মাংস “আমি তিন শতাধিক হাড়কে লেপটে আছি” বলে জানে না, তিন শতাধিক হাড়ও “নয়শো পেশি দিয়ে গঠিত মাংস আমাকে লেপটে আছে” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ মাংসগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। এটি কেবল—

“নয়শো পেশি দিয়ে গঠিত মাংসবিশিষ্ট,

লিপ্ত কলেবর, নানা কৃমিকুলে আকীর্ণ,

বিষ্ঠাস্থানের মতোই পচা দুর্গন্ধযুক্ত।”

সীমার দিক থেকে এটি নিচে হাড়ের পুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত তল দ্বারা, অথবা ওপরে চামড়া দ্বারা, আর আড়াআড়িভাবে পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে মাংসের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে মাংসকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে নয়শো রকমের **পেশিতন্তু**-কে বর্ণের দিক থেকে সে সাদা বলেই নিরূপণ করে, কেউ কেউ আবার মধুবর্ণের বলেও নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এগুলো নানা আকৃতির হয়। সেই অনুসারে বড়ো বড়ো পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে কন্দল কুঁড়ির আকৃতি, এর চাইতে সূক্ষ্মতর পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে শুয়োর ধরার জালের দড়ির আকৃতি, এর চাইতে ছোটো পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে দুর্গন্ধলতার (*পূতিলতা*) আকৃতি, এর চাইতে ছোটো পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে শ্রীলঙ্কার বড়ো বীণার তারের আকৃতি, এর চাইতে ছোটো পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে স্থূল সুতোর আকৃতি, হাত ও পায়ের পৃষ্ঠের পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে পাখির পায়ের আকৃতি, মাথার পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে গ্রাম্য বালকদের মাথায় রাখা বিরলতর অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রের আকৃতি, পিঠের পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে ভেজানোর পর রোদে মেলে দেওয়া মৎস্যজালের আকৃতি, এই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাদবাকি পেশিতন্তুগুলো হচ্ছে শরীরে জাল বোনার মতো করে বানানো জামার আকৃতি। দিক অনুসারে এগুলো দুই দিকেই উৎপন্ন। তন্মধ্যে ডান কানের লতি থেকে শুরু করে কণ্ডরা (tendon) নামক বড়ো বড়ো পাঁচটি পেশিতন্তু সামনে-পেছনে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে বামপাশে চলে গিয়েছে, বাম কানের লতি থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো পাঁচটি পেশিতন্তু সামনে-পেছনে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে ডানপাশে চলে গিয়েছে, ডানপাশের গলার বেষ্টনী থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো পাঁচটি পেশিতন্তু সামনে-পেছনে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে বামপাশে চলে গিয়েছে, বামপাশের গলার বেষ্টনী থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো পাঁচটি পেশিতন্তু সামনে-পেছনে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে ডানপাশে চলে গিয়েছে, ডান হাতকে সামনে-পেছনে প্যাঁচিয়ে প্যাচিয়ে পাঁচটি করে পেশিতন্তু, মোট দশটি বড়ো বড়ো পেশিতন্তু ওপরের দিকে উঠে গেছে। একইভাবে বাম হাতকে, ডান পা-কে ও বাম পা-কে, এভাবে এই ষাটটি বড়ো বড়ো পেশিতন্তুই শরীরের ধারক ও নিয়ামক বলে সে নিরূপণ করে। অবস্থানের দিক থেকে এগুলো সারা শরীরের অস্থিচামড়া ও অস্থিমাংসের মধ্যে হাড়গুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে।

এখানে, লতার জাল দিয়ে বাঁধানো কঞ্চির বেড়ার লতার জাল যেমন “আমাদের দ্বারাই কঞ্চির বেড়া বাঁধা হয়েছে” বলে জানে না, এবং কঞ্চির বেড়াও “লতার জাল দিয়েই আমাদের বাঁধা হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি পেশিতন্তুগুলোও “আমাদের দ্বারাই তিন শতাধিক হাড়কে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং তিন শতাধিক হাড়ও “পেশিতন্তুগুলো দিয়েই আমাদের বেঁধে রাখা হয়েছে” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ পেশিতন্তুগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। এগুলো কেবল—

“নয়শো পেশিতন্তুবিশিষ্ট হয়,

সেগুলো ব্যাম পরিমাণ কলেবরে

হাড়গোড়ের পুঞ্জকে বেঁধে রাখে,

লতা দিয়ে বাড়িকে বেঁধে রাখার মতো।”

সীমার দিক থেকে এগুলো নিচে তিনশো হাড়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত তল দ্বারা, অথবা ওপরে চামড়া ও মাংস দ্বারা, আর আড়াআড়িভাবে পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে পেশিতন্তুর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে পেশিতন্তুগুলোকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের বত্রিশটি দাঁতের হাড়কে আলাদাভাবে গ্রহণ করায় বাকিগুলো হচ্ছে চোষট্টিটি হাতের হাড়, চৌষট্টিটি পায়ের হাড়, চৌষট্টিটি মাংসে আশ্রিত নরম হাড়, দুটি গোড়ালির হাড়, একেকটি পায়ে দুটি করে গুল্ফের হাড়, দুটি জঙ্ঘাস্থি বা পায়ের নলার হাড়, একটি হাঁটুর হাড়, একটি ঊরুর হাড়, দুটি কোমরের হাড়, আঠারোটি পিঠের কাঁটা বা মেরুদণ্ডের হাড়, চব্বিশটি পাঁজরের হাড়, চৌদ্দটি বুকের হাড়, একটি হৃৎপিণ্ডের হাড়, দুটি কাঁধ ও বুক সংযোগকারী হাড়, দুটি কাঁধের হাড়, দুটি বাহুর হাড়, দুটি করে হাতের হাড় (অর্থাৎ কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ), সাতটি গলার হার, দুটি চোয়ালের হাড়, একটি নাকের হাড়, দুটি চোখের হাড়, দুটি কানের হাড়, একটি কপালের হাড়, একটি মাথার খুলির পেছনের অংশের হাড়, নয়টি মাথার খুলির হাড়, এভাবে ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত বহু ধরনের **হাড়**, সবকটিই বর্ণের দিক থেকে সাদা বলে সে নিরূপণ করে।

আকারের দিক থেকে সেগুলো নানা আকৃতির হয়। সেই অনুসারে পায়ের আঙুলের ডগার হাড়গুলো হচ্ছে *কতক* বীজের আকৃতি, এর পরবর্তী আঙুলগুলোর মাঝের পর্বের হাড়গুলো হচ্ছে অপরিপূর্ণ কাঁঠালের বীজের আকৃতি, আঙুলগুলোর মূলপর্বের হাড়গুলো হচ্ছে ছোটো ড্রামের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে ময়ূরের ছোটো ছোটো টুকরোর আকৃতি। পদতলের হাড়গুলো হচ্ছে চূর্ণকৃত *কন্দল* (স্থলজ শাপলা) ডাঁটার স্তূপের আকৃতি, গোড়ালির হাড়গুলো হচ্ছে একটিমাত্র আঁটিযুক্ত তালের বীজের আকৃতি, গুল্ফের হাড়গুলো হচ্ছে একসঙ্গে বাঁধা ক্রীড়াগোলকের আকৃতি, জঙ্ঘা বা পায়ের নলার হাড়গুলোর মধ্যে ছোটো হাড়গুলো হচ্ছে ধনুকদণ্ডের আকৃতি, বড়ো হাড়গুলো হচ্ছে ক্ষুধা-পিপাসায় শুকিয়ে যাওয়া ধমনির আকৃতি, গুল্ফের হাড়ের যেখানে জঙ্ঘা বা পায়ের নলার হাড়গুলো বসে সেখানে পায়ের নলার হাড়গুলো হচ্ছে আগার বাকল অপসারিত খেজুর গাছের আকৃতি, হাঁটুর হাড়ের যেখানে পায়ের নলার হাড়গুলো বসে সেখানে পায়ের নলার হাড়গুলো হচ্ছে মৃদঙ্গের মাথার আকৃতি, হাঁটুর হাড় হচ্ছে একদিকে গলে যাওয়া বুদবুদের আকৃতি, ঊরুর হাড়গুলো হচ্ছে ভালো করে ছাঁটা হয়নি এমন কুড়ালের হাতলের আকৃতি, কোমরের হাড়ের যেখানে ঊরুর হাড়গুলো বসে সেখানে ঊরুর হাড়গুলো স্বর্ণকারদের আগুন জ্বালানোর শলাকা রাখার স্থানের আকৃতি, সেগুলো বসানোর স্থানটি হচ্ছে প্রান্তছিন্ন বিশাল পুন্নাগ ফলের আকৃতি, কোমরের হাড়গুলো হচ্ছে দুটি একসঙ্গে মিলে কুমোরের চুলার আকৃতি, আবার কারো কারো মতে তাপসদের ব্যবহৃত তাকিয়ার আকৃতি, নিতম্ব বা পাছার হাড়গুলো হচ্ছে অধোমুখী করে রাখা সাপের ফণার আকৃতি, যার সাত আটটি স্থানে নানা সাইজের ছিদ্র আছে, আঠারোটি মেরুদণ্ডের হাড় হচ্ছে ভেতর থেকে দেখলে উপর্যুপরি স্থাপিত এবং চতুর্দিকে বেষ্টিত সীসার পাতের আকৃতি, বাইরে থেকে দেখলে সেগুলো আংটির সারির আকৃতি, সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে করাতের দাঁতের মতো দুই তিনটি কাঁটাযুক্ত হাড় থাকে। চব্বিশটি পাঁজরের হাড়ের মধ্যে পরিপূর্ণগুলো হচ্ছে পরিপূর্ণ শ্রীলঙ্কার কাচির আকৃতি, অপরিপূর্ণগুলো হচ্ছে অপরিপূর্ণ শ্রীলঙ্কার কাচির আকৃতি, আবার কারো কারো মতে সবকটি পাঁজরের হাড়ই হচ্ছে সাদা মুরগির প্রসারিত ডানার আকৃতি। চৌদ্দটি বুকের হাড় হচ্ছে জীর্ণ রথের কাঠামোর আকৃতি, হৃৎপিণ্ডের হাড় হচ্ছে চামচের ফণা বা চামচের মাথার আকৃতি, কাঁধ ও বুক সংযোগকারী হাড়গুলো হচ্ছে ছোটো লোহার ছুরির হাতলের আকৃতি, সেগুলোর নিচের হাড়টি অর্ধচন্দ্রাকৃতি, পিঠ ও বাহুর সংযোগকারী হাড়গুলো হচ্ছে কুঠারের ফণার আকৃতি, আবার কারো কারো মতে শ্রীলঙ্কান অর্ধছিন্ন কুড়ালের আকৃতি। বাহুর হাড়গুলো হচ্ছে আয়নার হাতলের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে বড়ো ছুরির হাতলের আকৃতি। হাতের সামনের অংশের হাড়গুলো হচ্ছে জোড়া তালগাছের কাণ্ডের মতো, মণিবন্ধ বা কব্জির হাড়গুলো হচ্ছে একসঙ্গে ধরে রাখা সীসার পাতের আকৃতি, হাতের পৃষ্ঠতলের হাড়গুলো হচ্ছে চূর্ণকৃত *কন্দল* বা স্থলজ শাপলার ডাঁটার স্তূপের আকৃতি, হাতের আঙুলগুলোর মূলপর্বের হাড়গুলো হচ্ছে ছোট্ট ড্রামের আকৃতি, মধ্যপর্বের হাড়গুলো হচ্ছে অপরিপূর্ণ কাঁঠালের বীজের আকৃতি, আগার পর্বের হাড়গুলো হচ্ছে *কতক* বীজের আকৃতি, সাতটি গলার হাড় হচ্ছে দণ্ডের দ্বারা বিদ্ধ করে এক সারিতে স্থাপিত বাঁশের গিরার আকৃতি, নিচের চোয়ালের হাড়টি হচ্ছে কামারদের হাতুড়ির দড়ির আকৃতি, ওপরের চোয়ালের হাড়টি হচ্ছে ছাঁচার ছুরির (অর্থাৎ যে ছুরি দিয়ে আঁখের ছাল ছাঁচা হয়) আকৃতি, চক্ষুকোটর ও নাকের কোটরের হাড়গুলো হচ্ছে শাঁস বের করে নেওয়া কচি তালের বীজের আকৃতি, কপালের হাড়টি হচ্ছে অধোমুখী করে রাখা শঙ্খপাত্রের আকৃতি, কানের গোড়ার হাড়গুলো হচ্ছে নাপিতের ক্ষুরের খোপের আকৃতি, কপাল ও কানের গোড়ার ওপরে কাপড় বাঁধার স্থানে হাড়টি হচ্ছে সংকুচিত ঘট পূর্ণ পাত্রখণ্ডের আকৃতি, মাথার খুলির পেছনের অংশের হাড়টি হচ্ছে মুখ কেটে রাখা বাঁকা নারিকেলের আকৃতি, মাথার খুলির হাড়গুলো হচ্ছে সেলাই করে জর্জরিত লাউয়ের খোলের আকৃতি। দিক অনুসারে এগুলো দুই দিকেই উৎপন্ন।

অবস্থানের দিক থেকে সাধারণভাবে বললে সারা শরীর জুড়ে আছে, তবে বিশেষ করে বলতে গেলে মাথার হাড়গুলো গলার হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, গলার হাড়গুলো মেরুদণ্ডের হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, মেরুদণ্ডের হাড়গুলো কোমরের হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, কোমরের হাড়গুলো ঊরুর হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, ঊরুর হাড়গুলো হাঁটুর হাড়গুলোর ওপর, হাঁটুর হাড়গুলো পায়ের নলার হাড়গুলোর ওপর, পায়ের নলার হাড়গুলো গুল্ফের হাড়গুলোর ওপর, গুল্ফের হাড়গুলো পদতলের হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, পদতলের হাড়গুলো ও গুল্ফের হাড়গুলো জড়াজড়ি করে ধরে আছে, গুল্ফের হাড়গুলো ও হাঁটুর হাড়গুলো... গলার হাড়গুলো ও মাথার হাড়গুলো জড়াজড়ি করে ধরে আছে, এভাবেই বাদবাকি হাড়গুলোকে বুঝতে হবে।

এখানে, একটি বাড়ির ইট, কড়িকাঠ ইত্যাদির মধ্যে ওপরের ইট ইত্যাদিগুলো যেমন “আমরা নিচের ইট ইত্যাদির ওপর প্রতিষ্ঠিত” বলে জানে না, এবং নিচের ইট ইত্যাদিগুলোও “আমরা ওপরের ইট ইত্যাদিকে ধরে বসে আছি” বলে জানে না, তেমনি মাথার হাড়গুলোও “আমরা গলার হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত” বলে জানে না,... গুল্ফের হাড়গুলোও “আমরা পদতলের হাড়গুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত” বলে জানে না, এবং পদতলের হাড়গুলোও “আমরা গুল্ফের হাড়গুলোকে ধরে বসে আছি” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ হাড়গুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। এই তিন শতাধিক হাড় কেবল নয়শো পেশিতন্তু এবং নয়শো মাংসপেশির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে লেপটে আছে, চামড়া দিয়ে দৃঢ়ভাবে ঢেকে রাখা আছে, সতেরো হাজার স্নায়ু দিয়ে প্রবাহিত রসবিশিষ্ট, নিরানব্বই হাজার লোমকূপ দিয়ে ঘাম, বর্জ্য ও আশি ধরনের কৃমিকুল প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে এমন, এগুলোকেই দেহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যাকে স্বভাবের ভিত্তিতে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে একজন যোগী গ্রহণের উপযোগী কিছুই দেখতে পায় না, সে শুধু পেশিতন্তু দিয়ে আবদ্ধ নানা ঘৃণ্য জিনিসে পরিপূর্ণ হাড়গোড়ের পুঞ্জকেই দেখতে পায়। যাকে দেখে সে দশবলের পুত্র বলেই মনে করে। যেমন বলা হয়েছে:

“হাড়গুলো প্রান্তভাগ দিয়ে থরে থরে বসানো,

কোনোটিই অনেক সন্ধির দ্বারা যুক্ত নয়।

পেশিতন্তু দিয়ে আবদ্ধ, বার্ধক্য দ্বারা পীড়িত,

অচেতন এবং মরা কাষ্ঠখণ্ড সদৃশ।”

“ঘৃণ্য জিনিসে ঘৃণ্য জিনিস উৎপন্ন হয়েছে,

অশুচি জিনিসে পচা জিনিস উৎপন্ন হয়েছে,

দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসে দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস উৎপন্ন হয়েছে

এবং ভঙ্গুর জিনিসে ক্ষয়ধর্মী জিনিস উৎপন্ন হয়েছে।”

“হাড়ের পুঁটলিতে হাড়ের পুঁটলি এবং

পচা দেহে পচা জিনিস উৎপন্ন হয়েছে।

আপনারা তার প্রতি লোভকে দমন করুন,

এবং দশবলের পুত্র হোন।”

সীমার দিক থেকে এই হাড়গুলো ভেতরে হাড়ের মজ্জা দ্বারা, ওপরে মাংস দ্বারা, মাথায় এবং গোড়ায় পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে হাড়গুলোর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে হাড়গুলোকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে পূর্বে যেমনটি বলা হয়েছে ঠিক তত ধরনের হাড়ের অভ্যন্তরে থাকা **হাড়ের মজ্জা**-কে সে বর্ণের দিক থেকে সাদা বলেই নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে সেগুলো নিজ নিজ অবস্থানের আকৃতির হয়। যেমন: বড়ো বড়ো হাড়গুলোর ভেতরে থাকা হাড়ের মজ্জাগুলো হচ্ছে সিদ্ধ করে, ঘেঁটে বড়ো বড়ো বাঁশের পাবযুক্ত নলে তুলে রাখা বড়ো বড়ো বেতের অঙ্কুরের আকৃতি, ছোটো ছোটো হাড়গুলোর ভেতরে থাকা হাড়ের মজ্জাগুলো হচ্ছে সিদ্ধ করে, ঘেঁটে ছোটো ছোটো বাঁশের পাবযুক্ত নলে তুলে রাখা ছোটো ছোটো বেতের অঙ্কুরের আকৃতি। দিক অনুসারে এগুলো দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এগুলো হাড়গুলোর ভেতরেই অবস্থিত।

এখানে, বাঁশের চোঙা ইত্যাদির মধ্যে ভরে দেওয়া দই-গুড়গুলো যেমন “বাঁশের চোঙা ইত্যাদির মধ্যে আমাদের ভরে দেওয়া হয়েছে” বলে জানে না, এবং বাঁশের চোঙা ইত্যাদিগুলো “আমাদের মধ্যে দই-গুড় ভরে দেওয়া হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি হাড়ের মজ্জাও “হাড়গুলোর মধ্যে আমাকে ভরে দেওয়া হয়েছে” বলে জানে না, এবং হাড়গুলোও “আমাদের মধ্যে হাড়ের মজ্জা ভরে দেওয়া হয়েছে” বলে জানে না। এগুলো (অর্থাৎ হাড়ের মজ্জাগুলো) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে হাড়গুলোর অভ্যন্তরস্থ তলের দ্বারা এবং হাড়ের মজ্জার অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে হাড়ের মজ্জার একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে হাড়ের মজ্জাকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে দুটি গোলকাকৃতির **কিডনি**-কে বর্ণের দিক থেকে সে হালকা লাল, রক্তপ্রবাল গাছের বীজের বর্ণের বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে গ্রাম্য বালকদের সুতো দিয়ে বানানো ক্রীড়াগোলকের আকৃতি, কারো কারো মতে একই বৃন্তে থাকা দুটি আমের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে কিডনিগুলো হৃৎপিণ্ডকে ঘিরে আছে এবং দুটি স্থূল পেশিতন্তুতে আবদ্ধ, যে পেশিতন্তুগুলো প্রথমে গলা থেকে একমূল হয়ে বের হয়ে সামান্য গিয়ে দুভাগ হয়েছে।

এখানে, বৃন্তাবদ্ধ দুটি আম যেমন “আমি বৃন্তের সঙ্গে বাঁধা আছি” বলে জানে না, এবং বৃন্তও “আমার সঙ্গে দুটি আম বাঁধা আছে” বলে জানে না, তেমনি কিডনিও “আমি স্থূল পেশিতন্তু দিয়ে বাঁধা আছি” বলে জানে না, এবং স্থূল পেশিতন্তুগুলোও “আমরা কিডনিতে আবদ্ধ আছি” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ কিডনি) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি কিডনির অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে কিডনির একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে কিডনিকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে থাকা **হৃৎপিণ্ড**-কে বর্ণের দিক দিয়ে সে পদ্মপাতার পৃষ্ঠের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি বাইরের পাতাগুলো সরিয়ে নিম্নমুখী করে রাখা পদ্মমুকুলের আকৃতি, তাও আবার আগাছিন্ন পুন্নাগফলের মতো একপাশ অনাবৃত, বাইরে মসৃণ, ভেতরে ঝিঙাফলের অভ্যন্তরভাগ সদৃশ। প্রজ্ঞাবহুল ব্যক্তিদের হৃৎপিণ্ড হয় সামান্য বিকশিত, আর মন্দপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মুকুলিত ফুলের মতো। যেই রূপ বা পদার্থকে আশ্রয় করে মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞানধাতু উৎপন্ন হয়, সেটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট মাংসপিণ্ড নামক হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে মাত্র আধ মুঠো পরিমাণ রক্ত জমা থাকে, সেই রক্ত লোভচরিত্র ব্যক্তির লাল হয়, বিদ্বেষচরিত্র ব্যক্তির কালো হয়, মোহচরিত্র ব্যক্তির মাংস ধোয়া জলের মতো হয়, বিতর্কচরিত্র ব্যক্তির মসুর ডালের রঙের হয়, শ্রদ্ধাচরিত্র ব্যক্তির কনকচাঁপা ফুলের রঙের হয়, প্রজ্ঞাচরিত্র ব্যক্তির স্বচ্ছ, শান্ত, অনাবিল, উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ, যা ধৌত খাঁটি মণির মতো দ্যুতিমান বলে মনে হয়। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি শরীরের অভ্যন্তরে দুটো স্তনের মাঝে অবস্থিত।

এখানে, জানালার দুটি পাল্লার মাঝে অবস্থিত হুড়কোর স্তম্ভটি যেমন “আমি জানালার দুটি পাল্লার মাঝে অবস্থিত” বলে জানে না, এবং জানালার পাল্লাগুলোও “আমাদের মাঝে একটি হুড়কোর স্তম্ভ লাগানো আছে” বলে জানে না, তেমনি হৃৎপিণ্ডটিও “আমি দুটি স্তনের মাঝে অবস্থিত” বলে জানে না, এবং স্তনগুলোও “আমাদের মাঝে হৃৎপিণ্ডটি অবস্থিত” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি হৃৎপিণ্ডের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে হৃৎপিণ্ডকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে থাকা **যকৃৎ** নামক এক জোড়া মাংসপিণ্ডকে বর্ণের দিক থেকে সে লাল, অর্থাৎ লাল শাপলাপাতার পৃষ্ঠের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি গোড়ায় একটি, কিন্তু আগায় দুটো রক্তকাঞ্চন পাতার আকৃতি, তাও আবার জড়বুদ্ধিসম্পন্নদের বড়সড়ো একটি মাত্র পিণ্ড হয়, আর প্রজ্ঞাবানদের ছোটো ছোটো দুটি কিংবা তিনটি পিণ্ড হয়। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি দুটি স্তনের অভ্যন্তরে ডানপাশে অবস্থিত।

এখানে, পাত্রের পাশে লেগে থাকা মাংসপেশি যেমন “আমি পাত্রের পাশে লেগে আছি” বলে জানে না, এবং পাত্রের পাশটিও “আমার পাশে মাংসপেশি লেগে আছে” বলে জানে, তেমনি যকৃৎও “আমি দুটি স্তনের অভ্যন্তরে ডানপাশকে আশ্রয় করে স্থিত আছি” বলে জানে না, এবং স্তনের অভ্যন্তরে ডানপাশটিও “আমাকে আশ্রয় করে যকৃৎটি স্থিত আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ যকৃৎ) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি যকৃতের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে যকৃতের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে যকৃৎকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে লুকানো এবং প্রকাশ্য ভেদে দুই প্রকার **ঝিল্লি**-কে বর্ণের দিক থেকে সে সাদা, মিহি সুতি কাপড়ের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি নিজের স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে লুকানো ঝিল্লিটি হৃৎপিণ্ড ও কিডনিকে ঘিরে অবস্থিত, আর প্রকাশ্য ঝিল্লিটি সারা শরীরে চামড়ার নিচ থেকে মাংসকে ঢেকে অবস্থিত।

এখানে, ছেঁড়া কাপড়ে মোড়া মাংসের মধ্যে ছেঁড়া কাপড়টি যেমন “আমার দ্বারা মাংসটি মুড়ে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং মাংসটিও “ছেঁড়া কাপড় দিয়ে আমাকে মোড়া হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি ঝিল্লিও “আমার দ্বারা হৃৎপিণ্ড, কিডনি এবং সারা শরীরে চামড়ার নিচ থেকে মাংসকে মুড়ে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং হৃৎপিণ্ড, কিডনি এবং সারা শরীরের মাংসও “ঝিল্লি দিয়ে আমাকে মোড়া হয়েছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ ঝিল্লি) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি নিচে মাংসের দ্বারা, ওপরে চামড়া দ্বারা, আর আড়াআড়িভাবে ঝিল্লির অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে ঝিল্লির একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে ঝিল্লিকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে থাকা **প্লীহা**-কে বর্ণের দিক থেকে সে নীল, শুকনো *নিগ্গুণ্ডী* ফুলের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি প্রায় কালো বাছুরের সাত আঙুল পরিমাণ অবদ্ধ জিহ্বার আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি হৃৎপিণ্ডের বামপাশে, পেটের উপরিভাগকে আশ্রয় করে অবস্থিত, যেটি আঘাত পেয়ে সেখান থেকে বাইরে রেরিয়ে আসলে সত্ত্বদের জীবন নাশ হয়।

এখানে, তোরণের মাথার পাশকে আশ্রয় করে অবস্থিত গোবরের দলাটি যেমন “আমি তোরণের মাথার পাশকে আশ্রয় করে স্থিত আছি” বলে জানে না, এবং তোরণের মাথার পাশটিও “গোবরের দলাটি আমাকে আশ্রয় করে স্থিত আছে” বলে জানে না, তেমনি প্লীহাও “আমি পেটের উপরিভাগকে আশ্রয় করে স্থিত আছি” বলে জানে না, পেটের উপরিভাগটিও “প্লীহা আমাকে আশ্রয় করে স্থিত আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ প্লীহা) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে প্লীহা প্লীহার অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে প্লীহার একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে প্লীহাকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে থাকা বত্রিশটি মাংসখণ্ড ভেদে **ফুসফুস**-কে বর্ণের দিক থেকে সে লাল, খুব বেশি পাকেনি এমন ডুমুরের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি অসমানভাবে কাটা পুরু বা মোটা পিঠাখণ্ডের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে ছাদ তৈরির টালিখণ্ডের স্তূপের আকৃতি। এটি দেহের অভ্যন্তরে ভুক্ত অন্ন-পানীয়ের অভাবে উৎপন্ন কর্মজাত তাপের প্রভাবে একদলা চিবানো খড়ের মতো নিরস ও পুষ্টিগুণহীন হয়। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি শরীরের অভ্যন্তরে দুটি স্তনের মাঝে হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের উপরিভাগকে আচ্ছাদিত করে ঝুলে থাকে।

এখানে, জীর্ণ কুঠুরির অভ্যন্তরে ঝুলন্ত পাখির বাসাটি যেমন “আমি জীর্ণ কুঠুরির অভ্যন্তরে ঝুলন্ত অবস্থায় আছি” বলে জানে না, এবং জীর্ণ কুঠুরির অভ্যন্তরটিও “আমার মধ্যে পাখির বাসা ঝুলন্ত অবস্থায় আছে” বলে জানে না, তেমনি ফুসফুসও “আমি শরীরের অভ্যন্তরে দুটি স্তনের মাঝে ঝুলে আছি” বলে জানে না, শরীরের অভ্যন্তরে দুটি স্তনের মাঝামাঝি স্থানটিও “আমার মধ্যে ফুসফুসটি ঝুলে আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ ফুসফুস) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি ফুসফুসের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে ফুসফুসের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে ফুসফুসকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যে পুরুষের বত্রিশ হাত এবং নারীর আটাশ হাত লম্বা, এবং একুশটি স্থানে কুণ্ডলী পাকিয়ে বা ভাঁজ হয়ে থাকা **অন্ত্র**-কে (নাড়িভুঁড়ি) বর্ণের দিক থেকে সে সাদা, কাঁকরের গুঁড়ির রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি মাথাকে ভেঙে ফেলে রক্তপূর্ণ খোলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা জিনিসের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি ওপরে গলা এবং নিচে পায়ুপথের সঙ্গে সংলগ্ন এবং গলা থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

এখানে, রক্তপূর্ণ খোলের মধ্যে রাখা মাথা-কাটা মেঠো সাপের শরীর যেমন “আমাকে রক্তপূর্ণ খোলের মধ্যে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং রক্তপূর্ণ খোলটিও “আমার মধ্যে মাথা-কাটা মেঠো সাপের শরীর রাখা হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি অন্ত্রও “আমাকে শরীরের অভ্যন্তরে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং শরীরের অভ্যন্তরও “আমার মধ্যে অন্ত্র রাখা হয়েছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ অন্ত্র) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি অন্ত্রের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে অন্ত্রের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে অন্ত্রকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যে অন্ত্রের ভেতরে **অন্ত্রগুণ**-কে বর্ণের দিক থেকে সে সাদা, সাদা শাপলার শেকড়ের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি সাদা শাপলার শেকড়ের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে গরুর মূত্রের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি একুশটি অন্ত্রভাঁজের বা অন্ত্রকুণ্ডলীর মাঝে অবস্থিত, অনেকটা পাপোষের রশির কুণ্ডলীকে একসঙ্গে সেলাই করে রাখার মতো। এটি অন্ত্রের ভাঁজগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে, যাতে সেগুলো কোদাল, কুড়াল ইত্যাদি দিয়ে কাজ করার সময় পড়ে না যায়, অনেকটা যন্ত্র যখন টানে তখন যন্ত্রের পাতগুলো যাতে খুলে না যায় সেজন্য সেগুলোকে একসঙ্গে বাঁধা সুতোর মতো।

এখানে, পাপোষ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রশির কুণ্ডলীকে সুতার দ্বারা সেলাই করে রাখা হলেও পাপোষের রশির কুণ্ডলী যেমন “আমাকে দিয়ে পাপোষ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রশির কুণ্ডলীটি সেলাই করা হয়েছে” বলে জানে না, এবং পাপোষ হিসেবে ব্যবহারের জন্য রশির কুণ্ডলীটিও “সুতাগুলো আমাকে সেলাই করে স্থিত আছে” বলে জানে না, তেমনি অন্ত্রগুণও “আমি অন্ত্রের একুশটি কুণ্ডলীকে বেঁধে স্থিত আছি” বলে জানে না, এবং অন্ত্রও “অন্ত্রগুণ আমাকে বেঁধে স্থিত আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ অন্ত্রগুণ) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে এটি অন্ত্রগুণের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে অন্ত্রগুণের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে অন্ত্রগুণকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যে থাকা **পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য**-কে বর্ণের দিক থেকে সে গলাধঃকরণ করা আহারের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি জলছাঁকনিতে শিথিলভাবে বদ্ধ চালের স্তূপের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি পাকস্থলীতে অবস্থিত। পাকস্থলী হচ্ছে উভয়দিকে পিষতে থাকা কোনো লম্বা ভেজা কাপড়ের মাঝখানে (বাতাসের দ্বারা) সৃষ্ট ফোলা অংশের মতো অন্ত্রপিণ্ড বা অন্ত্রের দলা। এটি বাইরে মসৃণ, ভেতরে পচা মাংস ও নোংরা আবর্জনার ওপর পড়ে থাকা আমের ফুলের মতো, আবার কারো কারো মতে পচা কাঁঠালের চামড়ার অভ্যন্তরভাগের মতো। সেখানে গোল কৃমি (তক্কোটক), ফোড়া উৎপন্নকারী কৃমি (গণ্ডুপ্পাদক), তালছিদ্রকারী কৃমি (তালহীরক), সুচের মতো মুখ কৃমি (সূচীমুখক), ফিতা কৃমি (পটতন্তক), সুতা কৃমি (সুত্তক) ইত্যাদি বত্রিশ প্রকার কৃমি পরিবার আকুলিবিকুলি করে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করতে করতে বসবাস করে। খাদ্য-পানীয়ের অভাব হলে তারা চিৎকার করে লাফিয়ে লাফিয়ে হৃৎপিণ্ডের মাংসকে প্রহার করে। খাদ্য-পানীয় গেলার সময় তারা ওপরের দিকে মুখ করে থাকে এবং প্রথমে গেলা দুই তিন গ্রাস তাড়াতাড়ি কেড়ে নেয়। সেটিই সেই কৃমিদের সূতিকাগার, পায়খানাঘর, হাসপাতাল এবং শ্মশান। যেমন: খরার সময়ে ভারী বৃষ্টি হলে জলের তোড়ে প্রস্রাব, পায়খানা, চামড়া, হাড় ও পেশিতন্তুর টুকরো, থুতু, শিকনি, রক্ত ইত্যাদি ভেসে গিয়ে চণ্ডালগ্রামের মুখে অবস্থিত আবর্জনার গর্তে পড়ে গিয়ে কাদা-জলে মাখামাখি হয়ে থাকে। দুই তিন দিন পরে সেখানে কৃমি পরিবার জন্মায়, সেটি তখন রোদের তাপে তপ্ত হতে থাকে, ওপরে ফেনা-বুদবুদ উঠতে থাকে, এবং কালচে নীলবর্ণ ধারণ করে, যা এমন দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘৃণ্য হয় যে সেখানে যাওয়াই যায় না, দেখা বা স্বাদ নেওয়া তো দূরের কথা। ঠিক সেভাবে নানা প্রকার খাদ্য-পানীয় দাঁতের মুষলের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে, জিহ্বা হাতের দ্বারা নাড়াচাড়া করে, থুতু ও লালা দ্বারা সংবদ্ধ হলে সেখানেই তাদের বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি চলে যায়। সেটি তখন তাঁতীর মলম এবং কুকুরের বমির মতো হয়ে পাকস্থলীতে পড়ে গিয়ে পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ুতে ডুবে যায়। সেখানে এটি উদরের আগুন বা ক্ষুধার আগুনের তাপে তপ্ত হতে থাকে, কৃমি পরিবারগুলো আকুলিবিকুলি করতে থাকে, ওপরে ফেনা-বুদবুদ উঠতে থাকে। এভাবে এটি পরম পচা দুর্গন্ধ ঘৃণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যা শুনলেও খাদ্য-পানীয়গুলোতে আর রুচি থাকে না, প্রজ্ঞাচোখ দিয়ে দেখলে তো আর কথাই নেই। সেখানে পতিত হয়ে খাদ্য-পানীয়গুলো পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ সেই প্রাণীগুলো খায়, এক ভাগ উদরাগ্নির তাপে পুড়ে যায়, এক ভাগ মূত্র হয়, এক ভাগ মল হয়, আরেক ভাগ পুষ্টি হয়ে রক্ত-মাংসকে পুষ্টি জোগায়।

এখানে, অত্যন্ত ঘৃণ্য কুকুরের খাবারের পাত্রে থাকা কুকুরের বমি যেমন “আমাকে কুকুরের পাত্রে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং কুকুরের খাবারের পাত্রও “আমার মধ্যে কুকুরের বমি রাখা আছে” বলে জানে না, তেমনি পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্যও “আমাকে এই পরম দুর্গন্ধযুক্ত ঘৃণ্য পাকস্থলীতে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, এবং পাকস্থলীও “আমার মধ্যে পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য রাখা হয়েছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্যের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্যের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে পাকস্থলীর ভুক্তদ্রব্যকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যে থাকা **মল**-কে বর্ণের দিক থেকে সে বেশির ভাগই ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি নিচের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি মলাশয়ে অবস্থিত। মলাশয় হচ্ছে নাভির নিচে ও মেরুদণ্ডের গোড়ার মাঝখানে অবস্থিত (অর্থাৎ সামনে নাভি, পেছনে মেরুদণ্ডের গোড়া, মাঝখানে মলাশয়), যা উচ্চতায় আট আঙুল মাপের বাঁশের নালির মতো। যেমন উঁচুভূমিতে বর্ষার জল পড়লে তা গড়িয়ে গিয়ে নিম্নভূমিগুলো পূর্ণ করে থাকে, ঠিক সেভাবে পাকস্থলীতে (আমাসয) পড়ে যাওয়া খাদ্য-পানীয়গুলো জঠরাগ্নি দ্বারা সেদ্ধ হতে হতে ফেনা-বুদবুদ তুলে মুষলের দ্বারা পিষ্ট হওয়ার মতো নরম হয়ে থাকে। এরপর তা অন্ত্রের খাদের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মলাশয়ে পৌঁছে গিয়ে বাঁশের গিরার মধ্য দিয়ে ঠেলেঠুলে ঢুকাতে থাকা হলদে মাটির মতো সেখানে একসঙ্গে জমা হয়ে থাকে।

এখানে, বাঁশের নালিতে মর্দন করে ঢুকানো নরম হলদে মাটি যেমন “আমি বাঁশের নালির মধ্যে স্থিত আছি” বলে জানে না, এবং বাঁশের নালিও “আমার মধ্যে নরম হলদে মাটি স্থিত আছে” বলে জানে না, তেমনি মলও “আমি মলাশয়ে স্থিত আছি” বলে জানে না, এবং মলাশয়ও “আমার মধ্যে মল স্থিত আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ মল) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে মল মলের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে মলের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে মলকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে মাথার খুলির অভ্যন্তরে থাকা **মগজ**-কে বর্ণের দিক থেকে সে সাদা, একদলা ব্যাঙের ছাতার রং বলে নিরূপণ করে। আবার কারো কারো মতে জ্বাল দেওয়ার কারণে উপচে পড়া দুধের রং। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি মাথার খুলির অভ্যন্তরে চারটি ভাগ অনুসারে রাখা চারটি ময়দার তালের মতো পুঞ্জীভূত চার আঙুল সমান পিণ্ড হয়ে অবস্থিত।

এখানে, পুরোনো লাউয়ের খোলে রাখা ময়দার তাল বা জ্বাল দেওয়ার কারণে উপচে পড়া দুধ যেমন “আমি পুরোনো লাউয়ের খোলের মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং পুরোনো লাউয়ের খোলও “আমার মধ্যে ময়দার তাল বা জ্বাল দেওয়ার কারণে উপচে পড়া দুধ আছে” বলে জানে না, তেমনি মগজও “আমি মাথার খুলির মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং মাথার খুলির অভ্যন্তরও “আমার মধ্যে মগজ আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ মগজ) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে মগজ মগজের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে মগজের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে মগজকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে বদ্ধ ও অবদ্ধ ভেদে দুই প্রকার **পিত্ত**-কে বর্ণের দিক থেকে সে ঘন মহুয়া তেলের রং বলে নিরূপণ করে। আবার কারো কারো মতে, অবদ্ধপিত্তের বর্ণ হচ্ছে শুকনো বকুল ফুলের রং। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে অবদ্ধপিত্ত মাংসবিহীন স্থানগুলো, যেমন: চুল, লোম, দাঁত, নখ এবং শক্ত শুকনো চামড়া বাদে অবশিষ্ট সারা শরীরে জলে পড়ে যাওয়া তেলবিন্দুর মতো ছড়িয়ে থাকে। এটি কুপিত হলে, অর্থাৎ এতে গণ্ডগোল দেখা দিলে তখন চোখগুলো হলদে হয় ও ঘুরতে থাকে, গা কাঁপে ও চুলকায়। বদ্ধপিত্ত হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মাঝে যকৃৎকে আশ্রয় করে থাকা বড়ো পোরোল ফলের কোয়ার মতো পিত্তথলিতে থাকে। এতে গণ্ডগোল দেখা দিলে সত্ত্বরা উন্মাদ হয়, চিত্ত বিপর্যস্ত হয়ে লাজ-ডর ত্যাগ করে অনুচিত কাজ করে, অনুচিত কথা বলে, অনুচিত চিন্তা করে।

এখানে, জলকে পরিব্যাপ্ত করে থাকা তেল যেমন “আমি জলকে পরিব্যাপ্ত করে আছি” বলে জানে না, এবং জলও “তেল আমাকে পরিব্যাপ্ত করে আছে” বলে জানে না, তেমনি অবদ্ধপিত্তও “আমি শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে আছি” বলে জানে না, শরীরও “অবদ্ধপিত্ত আমাকে পরিব্যাপ্ত করে আছে” বলে জানে না। বড়ো পোরোলের খোলে থাকা বৃষ্টির জল যেমন “আমি বড়ো পোরোলের খোলের মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং বড়ো পোরোলের খোলও “আমার মধ্যে বৃষ্টির জল আছে” বলে জানে না, তেমনি বদ্ধপিত্তও “আমি পিত্তথলিতে আছি” বলে জানে না, এবং পিত্তথলিও “আমার মধ্যে বদ্ধপিত্ত আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ পিত্ত) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে পিত্ত পিত্তের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে পিত্তের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে পিত্তকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে থাকা এক পাত্র পরিমাণ **শ্লেষ্মা**-কে বর্ণের দিক থেকে সাদা, *কচ্ছক* গাছের (একপ্রকার ডুমুর গাছ) পাতার রসের রং বলে সে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি পাকস্থলীতে অবস্থিত। জলে কাঠ অথবা পাত্রের ভাঙা টুকরো পড়লে জলের ওপরে থাকা শৈবাল ও শেওলাগুলো যেমন দুভাগে ভাগ হয়ে আবার একত্র হয়, ঠিক সেভাবে খাদ্য-পানীয় খাওয়ার সময় সেগুলো পাকস্থলীতে পড়লে শ্লেষ্মা দুভাগে ছিন্ন হয়ে আবার একত্র হয়। এটি দুর্বল হলে পাকস্থলী তখন পাকা ফোড়ার মতো অথবা পচা মুরগির ডিমের মতো খুব ঘৃণ্য পচা গন্ধযুক্ত হয়। তা থেকে উঠে আসা গন্ধের কারণে ঢেকুর উঠলে এবং মুখ থেকেও পচা দুর্গন্ধ বের হয়। তখন তাকে বলতে হয়, “সরে যাও, তোমার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে!” এই শ্লেষ্মা বেড়ে গিয়ে গাঢ় হলে তা পায়খানার গর্তের ঢাকনার মতো করে সেই পচা গন্ধটাকে পাকস্থলীর মধ্যেই আটকে রাখে।

এখানে, আবর্জনার ডোবার ওপরে থাকা ফেনার দলা যেমন “আমি আবর্জনার ডোবার মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং আবর্জনার ডোবাও “আমার মধ্যে ফেনার দলা আছে” বলে জানে না, তেমনি শ্লেষ্মাও “আমি পাকস্থলীতে আছি” বলে জানে না, এবং পাকস্থলীও “আমার মধ্যে শ্লেষ্মা আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ শ্লেষ্মা) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে শ্লেষ্মা শ্লেষ্মার অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে শ্লেষ্মার একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে শ্লেষ্মাকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যেকার **পুঁজ**-কে বর্ণের দিক থেকে সে শুকনো পাতার রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি পুঁজ জমা হয়ে থাকার মতো কোনো স্থায়ী স্থান নেই। শরীরের যেখানে যেখানে গোঁজ, কাঁটা, প্রহার, আগুনের শিখা ইত্যাদি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেই সেই স্থানে রক্ত স্থির হয়ে থেকে বা বসে গিয়ে পচে যায়, ফোড়া, বিষফোড়া ইত্যাদি দেখা দেয়, সেখানেই এই পুঁজ থাকে।

এখানে, গাছের যেখানে যেখানে কুড়াল ইত্যাদি দিয়ে আঘাত করা হয় সেখানে গলে বেরিয়ে পড়া রস যেমন “আমি গাছের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং গাছের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটিও “আমার মধ্যে রস আছে” বলে জানে না, তেমনি পুঁজও “আমি শরীরের যেখানে যেখানে গোঁজ, কাঁটা ইত্যাদি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফোড়া, বিষফোড়া ইত্যাদি দেখা দেয় সেখানে আছি” বলে জানে না, এবং শরীরের স্থানও “আমার মধ্যে পুঁজ আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ পুঁজ) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে পুঁজ পুঁজের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে পুঁজের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে পুঁজকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে জমাট-বাঁধা রক্ত ও বিচরণশীল রক্ত, এভাবে দুই প্রকার **রক্তের** মধ্যে জমাট-বাঁধা রক্তকে বর্ণের দিক থেকে সে সেদ্ধ ঘন লাক্ষারসের রং বলে নিরূপণ করে, আর বিচরণশীল রক্তকে সে বিশুদ্ধ লাক্ষারসের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এর পুরোটিই নিজের স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে জমাট-বাঁধা রক্ত ওপরের দিকে উৎপন্ন, আর বিচরণশীল রক্ত দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে বিচরণশীল রক্ত চুল, লোম, দাঁত, নখগুলোর মাংসহীন স্থান এবং শক্ত শুকনো চামড়া বাদে সারা উপজাত শরীরে (উপাদিণ্ণ সরীরং) শিরাজালের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। একপাত্রপূর্ণ পরিমাণ জমাট-বাঁধা রক্ত যকৃতের নিচের অংশকে পূর্ণ করে থাকে। সেখান থেকে এটি হৃৎপিণ্ড, কিডনি ও ফুসফুসের ওপরে একটু একটু করে চুঁইয়ে পড়ে। এভাবে এটি কিডনি, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও ফুসফুসকে ভেজা রাখে। কিডনি, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ভেজা না থাকলে সত্ত্বরা পিপাসিত হয়।

এখানে, জীর্ণশীর্ণ পাত্রে রাখা জলের নিচে মাটির ঢেলা ইত্যাদিকে ভেজানোর সময় যেমন “আমি জীর্ণশীর্ণ পাত্রে রাখা নিচের মাটির ঢেলা ইত্যাদিকে ভেজাচ্ছি” বলে জানে না, এবং জীর্ণশীর্ণ পাত্রের নিচে থাকা মাটির ঢেলা ইত্যাদিও “আমার মধ্যে জল আছে, অথবা আমরা ভিজতে ভিজতে অবস্থান করছি” বলে জানে না, তেমনি রক্তও “আমি যকৃতের নিচের দিকে থাকা কিডনি, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিকে ভেজাতে ভেজাতে অবস্থান করছি” বলে জানে না, যকৃতের নিচের দিকে থাকা কিডনি, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদিও “আমাদের মধ্যে রক্ত আছে, অথবা আমরা ভিজতে ভিজতে অবস্থান করছি” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ রক্ত) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে রক্ত রক্তের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে রক্তের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে রক্তকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যেকার **ঘাম**-কে বর্ণের দিক থেকে সে পরিষ্কার তিলের তেলের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি জমাট বেঁধে থাকার মতো এমন কোনো স্থায়ী স্থান নেই, যেখানে এটি রক্তের মতো সব সময় থাকে। অথবা যেহেতু পদ্মনাল ও শাপলা ডাঁটার গুচ্ছ জল থেকে অসমানভাবে ছিঁড়ে তুলে আনা মাত্র যেভাবে সেগুলো থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে, ঠিক সেভাবে আগুনের তাপ, সূর্যতাপ, তাপমাত্রা বা ঋতুর পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে শরীর যখন উত্তপ্ত হয়, তখন সকল চুল ও লোমকূপের ফাঁক দিয়ে ঘাম নিঃসৃত হয়। তাই এর আকার চুল ও লোমকূপের ফাঁকগুলোর ভিত্তিতে বুঝতে হবে। পূর্বাচার্যগণ বলেছেন, “ঘামকে (ধ্যানের বিষয়বস্তু হিসেবে) গ্রহণকারী যোগীর কেবল চুল ও লোমকূপগুলোর ফাঁক পূর্ণ করে থাকা ঘামে মনোযোগ দেওয়া উচিত।”

এখানে, পদ্ম ও শাপলার ডাঁটা ও মূলের গুচ্ছগুলোর মধ্যেকার ফাঁকা স্থান থেকে নির্গত হওয়া জল যেমন “আমি পদ্ম ইত্যাদির গুচ্ছগুলোর মধ্যেকার ফাঁকা স্থান থেকে নির্গত হচ্ছি” বলে জানে না, এবং পদ্ম ও শাপলার ডাঁটা ও মূলের গুচ্ছগুলোর মধ্যেকার ফাঁকা স্থানগুলোও “আমাদের মধ্য থেকে জল নির্গত হচ্ছে” বলে জানে না, তেমনি ঘামও “আমি চুলের গোড়া ও লোমকূপের ফাঁকা স্থানগুলো থেকে নির্গত হচ্ছি” বলে জানে না, এবং চুলের গোড়া ও লোমকূপের ফাঁকা স্থানগুলোও “আমাদের মধ্য থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ ঘাম) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে ঘাম ঘামের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে ঘামের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে ঘামকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে চামড়া ও মাংসের মাঝখানে থাকা **মেদ**-কে বর্ণের দিক থেকে সে ফালি করা হলুদের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। একইভাবে সুখী ও স্থূল শরীরে এটি চামড়া ও মাংসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকা হলুদ ও লাল রঙা মিহি সুতি কাপড়ের আকৃতি হয়, আর কৃশ শরীরে এটি নলার মাংস, ঊরুর মাংস, মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে থাকা পিঠের মাংস ও পেটকে আবৃত করে থাকা মাংসের ওপরে দ্বিগুণ বা তিনগুণ করে রাখা হলুদ ও লাল রঙা মিহি সুতি কাপড়ের আকৃতি হয়। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে মোটা শরীরে এটি সারা শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে, আর কৃশ শরীরে এটি নলার মাংস ইত্যাদিকে আশ্রয় করে থাকে, যা নামে তেল হলেও পরম ঘৃণ্য হওয়ায় সেটি মাথার তেল, খাওয়ার তেল, অথবা প্রদীপের তেলের মধ্যে পড়ে না।

এখানে, মাংসের স্তূপকে আশ্রয় করে থাকা হলুদ ও লাল রঙা মিহি সুতি কাপড়টি যেমন “আমি মাংসের স্তূপকে আশ্রয় করে আছি” বলে জানে না, এবং মাংসের স্তূপটিও “হলুদ ও লাল রঙা মিহি সুতি কাপড়টি আমাকে আশ্রয় করে আছে” বলে জানে না, তেমনি মেদও “আমি সারা শরীরকে অথবা পায়ের নলা ইত্যাদির মাংসকে আশ্রয় করে আছি” বলে জানে না, এবং সারা শরীর অথবা পায়ের নলা ইত্যাদির মাংসও “মেদ আমাকে আশ্রয় করে আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ মেদ) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে মেদ মেদের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে মেদের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে মেদকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের **অশ্রু**-কে বর্ণের দিক থেকে সে স্বচ্ছ তিলের তেলের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি চোখের কোটরে অবস্থিত। এটি কিন্তু পিত্তথলির পিত্তের মতো সব সময় চোখের কোটরে থাকে না। সত্ত্বরা যখন মনের আনন্দে বড়ো করে হাসে, অথবা মনের দুঃখে কাঁদে, বিলাপ করে, অথবা সে-রকম কোনো বিষম আহার (বেশি ঝাল, বেশি গরম ইত্যাদি আহার) খায়, অথবা যখন তাদের চোখে ধোঁয়া, ধুলো, মাটি ইত্যাদি লাগে, তখন এই মনের আনন্দ, মনের দুঃখ, বিপরীত আহার, ঋতু ইত্যাদি কারণে অশ্রু উৎপন্ন হয়ে চোখের কোটর পূর্ণ করে থাকে, এবং সেখান থেকে চুঁইয়ে পড়ে। পূর্বাচার্যগণ বর্ণনা করে থাকেন যে, “অশ্রুকে (ধ্যানের বিষয়বস্তু হিসেবে) গ্রহণকারী যোগীর কেবল চোখের কোটর পূর্ণ করে থাকা অশ্রুতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।”

এখানে, মাথাছিন্ন কচি তালশাঁসের কোটরে থাকা জল যেমন “আমি মাথাছিন্ন কচি তালশাঁসের কোটরের মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং মাথাছিন্ন কচি তালশাঁসের কোটরও “আমাদের মধ্যে জল আছে” বলে জানে না, তেমনি অশ্রুও “আমি চোখের কোটরে আছি” বলে জানে না, এবং চোখের কোটরও “আমাদের মধ্যে অশ্রু আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ অশ্রু) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে অশ্রু অশ্রুর অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে অশ্রুর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে অশ্রুকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে বিলীন হওয়া বা গলে যাওয়া তৈল নামক **চর্বি**-কে বর্ণের দিক থেকে সে ভাতের ফেনের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া তেলের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি হাতের তালু, হাতের পৃষ্ঠতল, পায়ের তলা, পায়ের পৃষ্ঠতল, নাকের ডগা, কপাল, কাঁধের চূড়ায় অবস্থিত। তবে এটি এসব স্থানে সব সময় বিলীন অবস্থায় থাকে না। যখন আগুনের তাপ, সূর্যতাপ, তাপমাত্রা বা ঋতুর পরিবর্তন, ধাতুর গোলযোগ ইত্যাদি কারণে সেই স্থানগুলো উষ্ণ হয়, তখন এটি গোসলের সময় পরিষ্কার জলের ওপরে ছড়িয়ে পড়া তেলবিন্দুর মতো সেই স্থানগুলোতে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে।

এখানে, জলাধারগুলোতে ছড়িয়ে থাকা কুয়াশা যেমন “আমি জলাধারগুলোতে ছড়িয়ে আছি” বলে জানে না, এবং জলাধারগুলোও “কুয়াশা আমাদের ওপর ছড়িয়ে আছে” বলে জানে না, তেমনি চর্বিও “আমি হাতের তালু ইত্যাদিতে ছড়িয়ে আছি” বলে জানে না, এবং হাতের তালু ইত্যাদিও “চর্বি আমাদের ওপর ছড়িয়ে আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ চর্বি) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে চর্বি চর্বির অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে চর্বির একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে চর্বিকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরে মুখের ভেতরে থাকা **থুতু**-কে বর্ণের দিক থেকে সে সাদা, ফেনার রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে সমুদ্রের ফেনার আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি উভয় গালের পাশ দিয়ে নেমে এসে জিহ্বায় অবস্থান করে। তবে এটি এখানে সব সময় জমা হয়ে থাকে না। যখন সত্ত্বরা বিশেষ কোনো আহার দেখে, অথবা স্মরণ করে, অথবা গরম, তেতো, ঝাল, নোনা, টক কোনো কিছু মুখে দেয়, অথবা যখন তাদের হৃদয় ম্রিয়মান হয়, অথবা কোনো কিছুতে যদি ঘৃণা আসে, তখন থুতু উৎপন্ন হয়ে উভয় গালের পাশ দিয়ে নেমে এসে জিহ্বায় অবস্থান করে। এটি জিহ্বার আগায় পাতলা হয়, মূল জিহ্বায় ঘন হয় এবং মুখে দেওয়া খই, চাল বা অন্য কোনো খাদ্যকে নদীর বালিতে খনন করা কুয়োর জলের মতো অফুরানভাবে ভেজাতে সমর্থ।

এখানে, নদীর বালিতে খোঁড়া কুয়োর তলায় থাকা জল যেমন “আমি কুয়োর তলায় আছি” বলে জানে না, এবং কুয়োর তলাটিও “আমার মধ্যে জল আছে” বলে জানে না, তেমনি থুতুও “আমি উভয় গালের পাশ দিয়ে নেমে জিহ্বার পৃষ্ঠতলে অবস্থান করছি” বলে জানে না, এবং জিহ্বার পৃষ্ঠতলও “উভয় গালের পাশ দিয়ে নেমে থুতু আমার ওপর অবস্থান করছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ থুতু) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে থুতু থুতুর অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে থুতুর একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে থুতুকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের **শিকনি**-কে বর্ণের দিক থেকে সে সাদা, কচি তালশাঁসের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি, আবার কারো কারো মতে, নাকের ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনবরত ঝরতে থাকা শিকনি হচ্ছে ছুঁড়ে মারা কচি বাঁশের আগার আকৃতি। দিক অনুসারে এটি ওপরের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি নাসারন্ধ্র বা নাকের ছিদ্র পূর্ণ করে অবস্থান করে। তবে এটিও সর্বদা এখানে জমা হয়ে থাকে না। কোনো ব্যক্তি যখন পদ্মপাতায় দই বেঁধে নিচে কাঁটা দিয়ে ছিদ্র করে, তখন সেই ছিদ্র দিয়ে দইয়ের রস গলে বাইরে বেয়ে পড়ে, ঠিক সেভাবে যখন সত্ত্বরা কাঁদে, অথবা বিপরীত আহার, ঋতুর কারণে ধাতু বিক্ষুব্ধ হয়, তখন মাথার ভেতর থেকে পচা শ্লেষ্মায় পরিণত হওয়া মগজ গলে তালুর ওপরে মাথার নিচের ফাঁক দিয়ে নেমে এসে নাকের ফুটো পূর্ণ করে অবস্থান করে, অথবা সেখান থেকে চুঁইয়ে পড়ে।

এখানে, ঝিনুকের খোলে রাখা পচা দই যেমন “আমি ঝিনুকের খোলে আছি” বলে জানে না, এবং ঝিনুকের খোলও “আমার মধ্যে পচা দই আছে” বলে জানে না, তেমনি শিকনিও “আমি নাসারন্ধ্র বা নাকের ছিদ্রগুলোতে আছি” বলে জানে না, এবং নাসারন্ধ্রগুলোও “আমাদের মধ্যে শিকনি আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ শিকনি) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে শিকনি শিকনির অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে শিকনির একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে শিকনিকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের অভ্যন্তরে থাকা **গ্রন্থিতেল** হচ্ছে শরীরের জোড়াগুলোর অভ্যন্তরে থাকা পিচ্ছিল ঘৃণ্য জিনিস। বর্ণের দিক থেকে সে এটিকে কনকচাঁপা ফুলের রসের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি তার স্থানের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি দুই দিকেই উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি একশো আশিটি হাড়ের জয়েন্ট বা জোড়ার অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং জোড়াগুলোতে তেল দেওয়া বা পিচ্ছিল রাখার কাজ করে। এটি যার অল্প বা দুর্বল হয়, তার উঠতে বসতে, আসতে যেতে, হাত-পা ও শরীর গুটাতে এবং প্রসারিত করতে হাড়গুলো কটকট শব্দ করে। সে তখন আঙুলের তুড়ির মতো শব্দ করতে করতে চলাফেরা করে। কেবল এক যোজন বা দুই যোজন পথ গেলেই তার বায়ুধাতু বিক্ষুব্ধ হয়, গা ব্যথা হয়। যার এই গ্রন্থিতেল প্রচুর থাকে, তার উঠতে বসতে ইত্যাদিতে হাড়গুলো কটকট শব্দ করে না। দীর্ঘপথ হেঁটে গেলেও তার বায়ুধাতু বিক্ষুব্ধ হয় না, গা ব্যথা হয় না।

এখানে, তৈলাক্ত করার তেল যেমন “আমি অক্ষদণ্ডকে তৈলাক্ত করে অবস্থান করছি” বলে জানে না, এবং অক্ষদণ্ডও “আমাকে তেল দিয়ে তৈলাক্ত করে রাখা হয়েছে” বলে জানে না, তেমনি গ্রন্থিতেলও “আমি একশো আশিটি হাড়ের জোড়াকে তৈলাক্ত করে অবস্থান করছি” বলে জানে না, এবং একশো আশিটি হাড়ের জোড়াও “গ্রন্থিতেল আমাদের তৈলাক্ত করে অবস্থান করছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ গ্রন্থিতেল) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে গ্রন্থিতেল গ্রন্থিতেলের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে গ্রন্থিতেলের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে গ্রন্থিতেলকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এরপর শরীরের মধ্যে থাকা **মূত্র**-কে বর্ণের দিক থেকে সে শিমের ক্ষারীয় জলের রং বলে নিরূপণ করে। আকারের দিক থেকে এটি জল ভরে উপুড় করে রাখা জলের কলসির অভ্যন্তরে থাকা জলের আকৃতি। দিক অনুসারে এটি নিচের দিকে উৎপন্ন। অবস্থানের দিক থেকে এটি মূত্রথলির অভ্যন্তরে অবস্থিত। মুত্রথলি (ৰত্থি) বলতে মূত্রের থলিকে বুঝায়। আবর্জনার গর্তে ফেলে দেওয়া মুখহীন রাবণঘটে যেমন সেই আবর্জনাস্তূপের রস প্রবেশ করে, কিন্তু কোন পথে প্রবেশ করেছে তা দেখা যায় না, ঠিক সেভাবে শরীর থেকে মূত্রথলিতে মূত্র প্রবেশ করলেও কোন পথে প্রবেশ করে তা দেখা যায় না। তবে বের হওয়ার পথটি স্পষ্ট। মূত্রথলি মূত্রপূর্ণ হলে সত্ত্বদের তখন প্রস্রাব করার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এখানে, মুখহীন বড়সড়ো কোনো কলসিকে আবর্জনার ডোবায় ফেলে দিলেও সেই কলসি যেমন “আমি মুখহীন কলসির ভেতরে আছি” বলে জানে না, এবং কলসিও “আমার মধ্যে আবর্জনার ডোবার রস ঢুকে আছে” বলে জানে না, তেমনি মূত্রও “আমি মূত্রথলির মধ্যে আছি” বলে জানে না, এবং মূত্রথলিও “আমার মধ্যে মূত্র আছে” বলে জানে না। এটি (অর্থাৎ মূত্র) চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ-বিরহিত, অচেতন... ব্যক্তি নয় বলে সে নিরূপণ করে। সীমার দিক থেকে মূত্র মূত্রের অংশের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে সে নিরূপণ করে। এটিই হচ্ছে মূত্রের একই সীমা। আলাদা সীমা কিন্তু চুলের মতোই। এভাবে সে মূত্রকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করে।

এভাবে কেউ যদি এই দেহের বত্রিশটি অংশকে বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপণ করতে থাকে তখন তার সেই ধ্যানচর্চার ফলে চুল ইত্যাদি আরো বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ দেহের অংশের আকারে প্রতিভাত হয়। এরপর থেকে বত্রিশ রঙের ফুলবিশিষ্ট এক সুতোয় গাঁথা মালা দেখে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে যেমন সবগুলো ফুল একসঙ্গে স্পষ্ট হয়, ঠিক সেভাবেই “এই দেহে আছে চুল” এভাবে এই দেহকে দেখে এর সমস্ত বিষয়গুলো একসঙ্গে স্পষ্ট হয়। চুলগুলোকে নিয়ে স্মৃতিচর্চার পর না থেমে স্মৃতিকে একেবারে মূত্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এরপর থেকে ঘুরে বেড়ানোর সময় মানুষ, ইতর প্রাণী ইত্যাদি এবং সত্ত্বদের আকার বা গঠন ত্যাগ করে দেহের অংশের রাশি হিসেবে তার মনে প্রতিভাত হয়, এবং এমনকি খাওয়ার সময়েও খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি দেহের অংশের রাশিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে তার প্রতিভাত হয়।

এখানে বলা হয়েছে, “তা হলে এরপর তাকে কী করতে হবে?” উত্তরে বলা যায়, সেই নিমিত্তকেই বারবার চর্চা করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে, বহুলভাবে অভ্যাস করতে হবে, সুন্দরভাবে নিরূপিত বিষয়কে আরো নিরূপণ করতে হবে। কীভাবে সে সেই নিমিত্তকে বারবার চর্চা করে, গড়ে তোলে, বহুলভাবে অভ্যাস করে, সুন্দরভাবে নিরূপিত বিষয়কে আরো নিরূপণ করে? সে সেই চুল ইত্যাদির দেহের অংশের আকারে প্রতিভাত হওয়া নিমিত্তকে বারবার চর্চা করে, স্মৃতির দ্বারা লেগে থাকে, অনুসরণ করে, গমন করে, স্মৃতিগর্ভকে গ্রহণ করে। অথবা এখানে লব্ধ স্মৃতিকে সে বাড়াতেই থাকে অর্থে সেটিকে ‘গড়ে তোলে’ বলা হয়। ‘বহুলভাবে অভ্যাস করে’ মানে হচ্ছে বারবার স্মৃতিযুক্ত বিতর্ক-বিচার দিয়ে তাতে আঘাত করে। ‘সুন্দরভাবে নিরূপিত বিষয়কে আরো নিরূপণ করে’ মানে হচ্ছে যেভাবে করলে সুষ্ঠুভাবে নিরূপিত হয়, পুনরায় অদৃশ্য হয়ে না যায়, ঠিক সেভাবেই সে সেটিকে স্মৃতি দিয়ে নিরূপণ করে, নির্ধারণ করে, শক্ত করে বেঁধে রাখে।

অথবা ক্রমানুসারে, বেশি দ্রুত নয়, বেশি ধীরেও নয়, চিত্তবিক্ষেপ দূর করে, প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে, ক্রমানুসারে বাদ দিয়ে, অর্পণা অনুসারে এবং তিনটি সূত্র অনুসারে, এভাবে পূর্বে যে দশ প্রকার মনোযোগ-কৌশলের কথা বলা হয়েছে। এখানে ক্রমানুসারে মনোযোগ দিলে সে বারবার চর্চা করে, বেশি দ্রুত নয় আবার বেশি ধীরেও নয় আকারে মনোযোগ দিলে সে গড়ে তোলে, চিত্তবিক্ষেপ দূর করে মনোযোগ দিলে সে বহুলভাবে অভ্যাস করে, প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে ইত্যাদির ভিত্তিতে মনোযোগ দিলে সে সুন্দরভাবে নিরূপিত বিষয়কে আরো নিরূপণ করে বলে বুঝতে হবে।

এখানে বলা হয়েছে, “কিন্তু কীভাবে সে ক্রমানুসারে ইত্যাদির ভিত্তিতে এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়?” উত্তরে বলা যায়, সে চুলে মনোযোগ দিয়ে, এরপর লোমে মনোযোগ দেয়, নখে নয়। একইভাবে লোমে মনোযোগ দিয়ে, এরপর সে নখে মনোযোগ দেয়, দাঁতে নয়। এই নিয়ম সর্বত্রই প্রযোজ্য। কেন? কারণ ক্রম না মেনে বিশৃঙ্খলভাবে মনোযোগ দিলে একজন অদক্ষ ব্যক্তি যেমন বত্রিশটি ধাপবিশিষ্ট সিঁড়িতে ক্রম না মেনে বিশৃঙ্খলভাবে উঠতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে, সেই সিঁড়ি থেকে পা ফসকে পড়ে যায় এবং সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারে না, ঠিক একইভাবে এখানেও ভাবনা পূর্ণতা প্রাপ্তির ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য স্বাদ না পেয়ে তার চিত্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনা হতে বিচ্যুত হয়, ভাবনা আর হয় না।

ক্রমানুসারে মনোযোগ দেওয়ার সময় সে “চুল, লোম” বলে বলে **বেশি দ্রুত** মনোযোগ দেয় না। বেশি দ্রুত মনোযোগ দিলে একজন দীর্ঘপথগামী ব্যক্তি যেমন রাস্তাটি ‍কোথায় সমান, কোথায় অসমান, কোথায় কি গাছপালা আছে, কোথায় স্থল, কোথায় নিচু, কোথায় রাস্তা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে, ইত্যাদি খেয়াল করতে পারে না, তাতে করে সে রাস্তা সম্পর্কে দক্ষও হয় না এবং তার রাস্তাও এতটুকু ছোটো হয়ে আসে না, ঠিক একইভাবে এখানেও সে বর্ণ, আকার ইত্যাদি দেহের বত্রিশটি অংশের নিমিত্তগুলো খেয়াল করতে পারে না, তাতে করে সে দেহের বত্রিশটি অংশেও দক্ষ হয় না এবং তার কর্মস্থানও এতটুকু ছোটো হয়ে আসে না।

সে যেমন বেশি দ্রুত মনোযোগ দেয় না, তেমনি **বেশি ধীরেও** মনোযোগ দেয় না। বেশি ধীরে মনোযোগ দিলে সেই তিন যোজন পথ যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেমন মাঝপথে গাছ, পর্বত, হ্রদে বিলম্ব করার কারণে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, মাঝপথেই সিংহ-বাঘ ইত্যাদির দ্বারা তার জীবন সংকটাপন্ন হয়, ঠিক একইভাবে এখানেও সে দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনার পূর্ণতা সাধন করতে পারে না, ভাবনা শেষ করার আগেই তার চিত্ত কামচিন্তা ইত্যাদির দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

বেশি ধীরে মনোযোগ না দেওয়ার সময়ও সে **চিত্তবিক্ষেপ দূর করে** মনোযোগ দেয়। চিত্তবিক্ষেপ দূর করে মানে হচ্ছে যেভাবে মনোযোগ দিলে অন্যান্য নির্মাণকাজ ইত্যাদিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না, ঠিক সেভাবেই সে মনোযোগ দেয়। বাহ্যিক বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যার চিত্ত চুল ইত্যাদিতে অসমাহিত সে ভাবনার পূর্ণতা সাধন করতে না পেরে, মাঝখানেই দুর্দশাগ্রস্ত হয় তক্ষশিলায় যাওয়ার সময় বোধিসত্ত্বের বন্ধুর মতো। কিন্তু অবিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যার চিত্ত চুল ইত্যাদিতে সমাহিত সে ভাবনার পূর্ণতা সাধন করতে পারে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলারাজ্যে নিরাপদে পৌঁছানোর মতো। এভাবে চিত্তবিক্ষেপ দূর করে মনোযোগ দিলে উপদেশ মেনে চলতে দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি অনুসারে তাদের মনে সেই বিষয়গুলো (অর্থাৎ চুল, লোম ইত্যাদি) অশুভ হিসেবে, বা বর্ণ হিসেবে, অথবা শূন্য হিসেবে প্রতিভাত হয়।

এরপর সে প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে সেই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়। **প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে** মানে হচ্ছে চুল, লোম এভাবে ইত্যাদি প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ ত্যাগ করে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে ঠিক সেভাবেই সে অশুভ ইত্যাদির বশে মনোযোগ দেয়। কীভাবে? অরণ্যে বসবাসের জন্য যাওয়া মানুষেরা যেমন জায়গাগুলো অচেনা হলে জলের স্থানকে চেনার জন্য গাছের ডাল ভাঙা ইত্যাদি চিহ্ন দিয়ে সেই অনুসারে গিয়ে জল পান করে, কিন্তু যখন জায়গাগুলো তাদের চেনা হয়ে যায় তখন তারা সেই চিহ্ন ছেড়ে, সেই চিহ্নে কোনো মনোযোগ না দিয়েই জলের স্থানে গিয়ে জল পান করে, ঠিক একইভাবে সে চুল লোম ইত্যাদি প্রকারে সেই সেই প্রচলিত নামের ভিত্তিতে প্রথমে সেই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়, এরপর যখন তার মনে সেই বিষয়গুলো অশুভ ইত্যাদির বশে প্রতিভাত হয় তখন সেই প্রচলিত নামকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ ত্যাগ করে অশুভ ইত্যাদির বশে মনোযোগ দেয়।

এখানে বলা হয়েছে, “কিন্তু কীভাবে তার মনে সেই বিষয়গুলো অশুভ ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রতিভাত হয়, কীভাবে বর্ণের ভিত্তিতে, অথবা কীভাবে শূন্যের ভিত্তিতে? এবং কীভাবে সে এই বিষয়গুলোতে অশুভের ভিত্তিতে মনোযোগ দেয়, কীভাবে বর্ণের ভিত্তিতে, অথবা কীভাবে শূন্যের ভিত্তিতে?” (উত্তরে বলা যায়) চুল তার মনে বর্ণ, আকার, গন্ধ, আবাসস্থল ও অবস্থান, এই পাঁচ প্রকারে অশুভের ভিত্তিতে প্রতিভাত হয়, তাই সে এই পাঁচ প্রকারে অশুভের ভিত্তিতে এতে মনোযোগ দেয়। যেমন, এই চুল বর্ণের দিক থেকে অশুভ, অত্যন্ত ঘৃণ্য। তাই তো মানুষেরা দিনের বেলা খাদ্য বা পানীয়ের মধ্যে পড়ে থাকা চুলের মতো কোনো কিছুকে বা সুতোকে দেখে চুল মনে করে খাদ্য বা পানীয়টি মনোজ্ঞ হলেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অথবা ঘৃণা করে। চুল আকারের দিক থেকেও অশুভ হয়। তাই তো মানুষেরা দিনের বেলা খাদ্য বা পানীয়ের মধ্যে পড়ে থাকা চুলের মতো কোনো কিছুকে বা সুতোকে স্পর্শ করে চুল মনে করে খাদ্য বা পানীয়টি মনোজ্ঞ হলেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অথবা ঘৃণা করে। চুল গন্ধের দিক থেকেও অশুভ হয়। তাই তো তেল না মাখলে, অথবা ফুলের সুগন্ধ ইত্যাদি না মাখলে চুলগুলোর গন্ধ অত্যন্ত জঘন্য হয়, আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া চুলের গন্ধ শুঁকে সত্ত্বগণ নাক বন্ধ করে ও মুখ বিকৃত করে। চুল আবাসস্থলের দিক থেকেও অশুভ। তাই তো মানুষ নানা ধরনের অশুচি জিনিস ফেলে দেওয়ায় আবর্জনার স্থানে কাঁটানটে (amaranthus polygonoides plant) উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠার মতো পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত নিঃসৃত হওয়ার ফলে সেগুলো সেখানে জমা হয়, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। চুল অবস্থানের দিক থেকেও অশুভ। তাই তো আবর্জনার স্থানে গজিয়ে ওঠা কাঁটানটে উদ্ভিদের মতো অত্যন্ত ঘৃণ্য লোম ইত্যাদি একত্রিশটি ঘৃণ্য জিনিসের স্তূপের ওপর মানুষদের মাথা জুড়ে পরিবেষ্টিত করে থাকা ভেজা চামড়ায় উৎপন্ন। এই নিয়ম লোম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এভাবে এই বিষয়গুলো অশুভ হিসেবে প্রতিভাত হলে তখন সে অশুভ হিসেবেই সেগুলোতে মনোযোগ দেয়।

কিন্তু তার মনে যদি বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিভাত হয়, তখন চুলগুলো নীল-কৃৎস্নের ভিত্তিতেই প্রতিভাত হয়। একইভাবে লোম, দাঁত সাদা-কৃৎস্নের ভিত্তিতে। এই নিয়ম সর্বত্রই প্রযোজ্য। তখন সে সেই সেই কৃৎস্নের ভিত্তিতেই এগুলোতে মনোযোগ দেয়, এভাবে বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিভাত হলে তখন সে বর্ণের ভিত্তিতে মনোযোগ দেয়। কিন্তু তার মনে যদি শূন্য হিসেবে প্রতিভাত হয়, তখন চুলগুলো নিবিড়তার পার্থক্যকে নিরূপণ করার মাধ্যমে পুষ্টি-অষ্টক নামক গুচ্ছের আকারে প্রতিভাত হয়। একইভাবে লোম ইত্যাদিও প্রতিভাত হয়। সেভাবেই সে এগুলোতে মনোযোগ দেয়। এভাবে শূন্য হিসেবে প্রতিভাত হলে তখন সে শূন্য হিসেবে মনোযোগ দেয়।

এভাবে মনোযোগ দেওয়ার সময় সে এই বিষয়গুলোতে ক্রমানুসারে বাদ দিয়ে মনোযোগ দেয়। **ক্রমানুসারে বাদ দিয়ে** মানে হচ্ছে অশুভ ইত্যাদির মধ্যে যেকোনো একটির ভিত্তিতে প্রতিভাত হলে তখন চুলকে বাদ দিয়ে লোমে মনোযোগ দেওয়ার সময় জোঁক যেভাবে লেজ দিয়ে ধরে থাকা স্থানের প্রতি আকুল প্রত্যাশী হয়েই ঠোঁট দিয়ে অন্য স্থানকে কামড়ে ধরে, সেটিকে কামড়ে ধরার পর সে অন্যটিকে ছেড়ে দেয়, ঠিক সেভাবে সে চুলগুলোর প্রতি আকুল প্রত্যাশী হয়েই লোমে মনোযোগ দেয়, লোমগুলোতে মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হলে তখন সে চুলগুলোকে ছেড়ে দেয়। এই নিয়ম সর্বত্রই প্রযোজ্য। এভাবে ক্রমানুসারে বাদ দিয়ে মনোযোগ দিলে তখন তার মনে অশুভ ইত্যাদির মধ্যে যেকোনো একটির ভিত্তিতে সেই বিষয়গুলো প্রতিভাত হওয়ার সময় নির্বিশেষে প্রতিভাত হয়, আরো বেশি সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়।

এরপর যার সেই বিষয়গুলো **অশুভের ভিত্তিতে** প্রতিভাত হয় এবং আরো বেশি সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়, বানর যেমন বত্রিশটি তালগাছ আছে এমন একটি তালবনে শিকারির তাড়া খেতে খেতে একটি গাছেও টিকতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়, এরপর একটি ঘন তালপাতায় ছাওয়া তালগুচ্ছের আড়ালে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, ঠিক সেভাবে তার বানররূপী চিত্ত বত্রিশটি অংশবিশিষ্ট এই দেহে সেই যোগীর তাড়া খেতে খেতে দেহের একটি অংশেও টিকতে না পেরে, দৌড়ে গিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যখন অনেক ধরনের আলম্বনবিশিষ্ট বনের প্রতি আশাহীন হয়ে থেমে যায়, তখন চুল ইত্যাদির মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে দক্ষ হয় বা চরিত্রের অনুরূপ হয়, অথবা যেটিতে তার পূর্বকৃত পুণ্য আছে সেটিকে ভিত্তি করে উপচার সমাধির বশে স্থির হয়। এরপর সে সেই নিমিত্তকে বিতর্কের দ্বারা বারবার চিন্তা করে, যথাক্রমে প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদর্শন শুরু করে আর্যভূমিতে পৌঁছায়।

কিন্তু যার সেই বিষয়গুলো **বর্ণের ভিত্তিতে** প্রতিভাত হয়, তার চিত্তও বানর যেমন... তখন চুল ইত্যাদির মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে দক্ষ হয় বা চরিত্রের অনুরূপ হয়, অথবা যেটিতে তার পূর্বকৃত পুণ্য আছে সেটিকে ভিত্তি করে উপচার সমাধির বশে স্থির হয়। এরপর সে সেই নিমিত্তকে বিতর্কের দ্বারা বারবার চিন্তা করে, যথাক্রমে নীল-কৃৎস্ন বা হলুদ-কৃৎস্নের ভিত্তিতে পাঁচটি রূপাবচর ধ্যানই উৎপন্ন করে, সেগুলোর যেকোনো একটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদর্শন শুরু করে আর্যভূমিতে পৌঁছায়।

কিন্তু যার সেই বিষয়গুলো **শূন্যের ভিত্তিতে** প্রতিভাত হয়, সে লক্ষণের ভিত্তিতে মনোযোগ দেয়। লক্ষণের ভিত্তিতে মনোযোগ দেওয়ার সময় সে চার ধাতুকে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপচার ধ্যান লাভ করে। এরপর সে মনোযোগ দেওয়ার সময় সেই বিষয়গুলোতে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা বা তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে মনোযোগ দেয়। এটিই হচ্ছে তার বিদর্শনের নিয়ম। সে এই বিদর্শন শুরু করে যথাক্রমে সঠিক পদ্ধতি মেনে চর্চা করে আর্যভূমিতে পৌঁছায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত “কিন্তু কীভাবে সে ক্রমানুসারে ইত্যাদির ভিত্তিতে এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়?” বলে যেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো। এবং “ভাবনার ভিত্তিতে এর বর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে” বলে যা বলা হয়েছে, তার অর্থ এখানে প্রকাশিত হলো।

## বিবিধ পদ্ধতি

এখন দেহের এই বত্রিশটি অংশের বর্ণনা ও চর্চায় দক্ষ হওয়ার জন্য এই **বিবিধ পদ্ধতিকে** বুঝতে হবে এভাবে:

“নিমিত্তের ভিত্তিতে, লক্ষণের ভিত্তিতে,

ধাতুর ভিত্তিতে, শূন্যের ভিত্তিতে ও পুঞ্জ ইত্যাদির ভিত্তিতে

দেহের বত্রিশটি অংশের বিশ্লেষণকে জানতে হবে।”

এখানে **নিমিত্তের ভিত্তিতে** মানে হচ্ছে এভাবে উক্ত প্রকার দেহের এই বত্রিশটি অংশের মধ্যে একশো ষাট প্রকার নিমিত্ত থাকে, যেগুলোর ভিত্তিতে একজন যোগী দেহের বত্রিশটি জিনিসকে অংশ হিসেবে (*কোট্ঠাসতো*) গ্রহণ করে থাকে। যেমন: চুলের বর্ণ-নিমিত্ত, আকার-নিমিত্ত, দিক-নিমিত্ত, স্থান-নিমিত্ত, সীমা-নিমিত্ত, এই পাঁচ প্রকার নিমিত্ত থাকে। একইভাবে লোম ইত্যাদিতেও।

**লক্ষণের ভিত্তিতে** মানে হচ্ছে দেহের বত্রিশটি অংশের মধ্যে একশো আটাশ প্রকার লক্ষণ থাকে, যেগুলোর ভিত্তিতে একজন যোগী দেহের বত্রিশটি অংশে লক্ষণ অনুসারে মনোযোগ দেয়। যেমন: চুলের শক্ত-লক্ষণ, বন্ধন-লক্ষণ, উষ্ণতা-লক্ষণ, নড়াচড়া-লক্ষণ, এই চার প্রকার লক্ষণ থাকে। একইভাবে লোম ইত্যাদিতেও।

**ধাতুর ভিত্তিতে** মানে হচ্ছে দেহের বত্রিশটি অংশের মধ্যে “হে ভিক্ষুগণ, ছয়টি ধাতুবিশিষ্ট এই ব্যক্তি” (ম.নি.৩.৩৪৩-৩৪৪) বলে এখানে বর্ণিত ধাতুগুলোতে মোট একশো আটাশ প্রকার ধাতু থাকে, যেগুলোর ভিত্তিতে একজন যোগী দেহের বত্রিশটি অংশকে ধাতু অনুসারে গ্রহণ করে থাকে। যেমন: চুলের মধ্যে যা শক্তভাব তা পৃথিবীধাতু, যা বন্ধনের স্বভাব তা পানিধাতু, যা পরিপাক করে তা তেজধাতু, যা প্রসারিত বা বিস্তৃত করে তা বায়ুধাতু, এই চার প্রকার ধাতু থাকে। একইভাবে লোম ইত্যাদিতেও।

**শূন্যের ভিত্তিতে** মানে হচ্ছে দেহের বত্রিশটি অংশের মধ্যে একশো আটাশ প্রকার শূন্যতা থাকে, যেগুলোর ভিত্তিতে একজন যোগী দেহের বত্রিশটি অংশকে শূন্য হিসেবে বিশেষভাবে দর্শন করে। যেমন: চুলের মধ্যে থাকা পৃথিবীধাতু আর পানিধাতু ইত্যাদির মধ্যে শূন্য (অর্থাৎ আকাশ) থাকে, একইভাবে পানিধাতু ইত্যাদি এবং পৃথিবীধাতু ইত্যাদির মধ্যেও শূন্য থাকে, এই চার ধরনের শূন্যতা থাকে। একইভাবে লোম ইত্যাদিতেও।

**পুঞ্জ ইত্যাদির ভিত্তিতে** মানে হচ্ছে দেহের বত্রিশটি অংশের চুল ইত্যাদির মধ্যে পুঞ্জ ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করার সময় “চুলে কয়টি পুঞ্জ থাকে, কয়টি আয়তন থাকে, কয়টি ধাতু থাকে, কয়টি সত্য থাকে, কয়টি স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*) থাকে” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে এর বিশ্লেষণকে বুঝতে হবে। এভাবে এগুলোকে বিশেষভাবে জানলে তখন তার গোটা দেহটিকে তৃণকাষ্ঠের সমষ্টির মতো মনে হয়। যেমন বলা হয়েছে:

“সত্ত্ব নেই, নর নেই, মানুষ নেই,

ব্যক্তিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই দেহ শূন্য এবং তৃণকাষ্ঠসদৃশ।”

এরপর এগুলোর সম্বন্ধে—

“শূন্যগৃহে প্রবেশ করা শান্তচিত্ত ভিক্ষুর বিষয়গুলোকে

সঠিকভাবে দর্শন করায় অমানুষিক আনন্দ উৎপন্ন হয়।”

(ধ.প.৩৭৩)

এভাবে যেই যেই অমানুষিক আনন্দের কথা বলা হয়েছে, তা তার খুব বেশি দূরতর হয় না। এরপর—

“যখনই সে পুঞ্জগুলোর উদয়-ব্যয়কে অনুধাবন করে,

তখন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অমৃতরূপ প্রীতি ও আনন্দ লাভ করে।

(ধ.প.৩৭৪)

এভাবে অমৃতরূপ বিদর্শনময় যেই প্রীতি ও আনন্দের কথা বলা হয়েছে, তা অনুভব করতে করতে অচিরেই সে আর্যব্যক্তির দ্বারা সেবিত অজর, অমর নির্বাণামৃত সাক্ষাৎ করে।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

দেহের বত্রিশটি অংশের বর্ণনা সমাপ্ত।

# ৪. কুমার-প্রশ্নের বর্ণনা

## পটভূমি

এখন “**এক মানে কী**” এভাবে ইত্যাদি কুমার-প্রশ্নগুলোর অর্থবর্ণনার পালা এসেছে। এখানে আমি সেগুলোর পটভূমি (*অট্ঠুপ্পত্তি*) ও সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা (*নিক্খেপপ্পযোজন*) বলার পরই বর্ণনা করব।

সেগুলোর পটভূমি হচ্ছে সোপাক নামে ভগবানের এক মহাশ্রাবক ছিলেন। জন্মের মাত্র সাত বছরের মধ্যেই তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন। ভগবান প্রশ্নোত্তর দানের মাধ্যমে উপসম্পদা অনুমোদন করার ইচ্ছায় তাঁর মধ্যে নিজের উদ্দিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দেওয়ার সক্ষমতা আছে দেখতে পেয়ে “**এক মানে কী**” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও সেগুলোর উত্তর দিলেন। সেগুলোর উত্তর দিয়ে তিনি ভগবানের মন জয় করে নিলেন। সেটিই ছিল তাঁর উপসম্পদা।

এই হচ্ছে সেগুলোর পটভূমি।

## সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা

কিন্তু যেহেতু শরণ গ্রহণের দ্বারা বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি ও সংঘানুস্মৃতির ভিত্তিতে চিত্তভাবনা, শিক্ষাপদগুলোর দ্বারা শীলভাবনা এবং দেহের বত্রিশটি অংশের দ্বারা কায়ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে, তাই এখন নানা প্রকারে প্রজ্ঞাভাবনার উপায় দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই এই প্রশ্নোত্তরগুলো এখানে আলোচিত হয়েছে। অথবা যেহেতু শীল হচ্ছে সমাধির কাছাকাছি কারণ এবং সমাধি হচ্ছে প্রজ্ঞার কাছাকাছি কারণ, যেমন বলা হয়েছে: “প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্ত ও প্রজ্ঞাকে গড়ে তোলার সময়” (সং.নি.১.২৩, ১৯২), তাই শিক্ষাপদগুলোর দ্বারা শীল এবং দেহের বত্রিশটি অংশের দ্বারা তার চারণভূমি সমাধিকে দেখিয়ে দেওয়ার পর, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নানা বিষয়কে ক্ষয়কারী প্রজ্ঞার প্রভেদকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই এখানে এই প্রশ্নোত্তরগুলো আলোচিত হয়েছে বলে জানতে হবে।

এখানে এই হচ্ছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা।

## প্রশ্নগুলোর বর্ণনা

### ‘এক মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এখন সেগুলোর অর্থবর্ণনা হচ্ছে এই: “**এক মানে কী**” মানে হচ্ছে যেই একটি বিষয়ের প্রতি একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করতে করতে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে থাকে, এবং যেই একটি বিষয়ের প্রতি এই আয়ুষ্মান (অর্থাৎ সোপাক) বিরাগ পোষণ করে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্তসাধন করেছিলেন সেই বিষয়টি সম্বন্ধেই ভগবান প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। “**সকল সত্ত্বই আহারের ওপর নির্ভরশীল**” বলে স্থবির এখানে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত দেশনার মাধ্যমে উত্তর দিলেন। “হে ভিক্ষুগণ, সম্যক স্মৃতি কী রকম? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে বাস করে” (সং.নি.৫.৮) এভাবে ইত্যাদি সূত্রগুলো এই ধরনের উত্তর ও যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে যেই আহারের দ্বারা সকল সত্ত্বই “আহারের ওপর নির্ভরশীল” বলা হয়েছে, সেই আহার অথবা তাদের সেই আহারের ওপর নির্ভরশীলতাকে লক্ষ্য করেই “এক মানে কী”এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন বলে স্থবির ধরে নিয়েছেন বুঝতে হবে। ভগবান সেটিকেই এক বলেছেন, এটিই এখানে অভিপ্রেত, “শাসনে অথবা জগতে অন্য কোনো এক নামে কিছু নেই” সেটি জানাতেই এই কথাটি বলা হয়েছে। তাই তো ভগবান কর্তৃক বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু একটি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে, সঠিকভাবে নিস্পৃহ হয়ে, সঠিকভাবে বিমুক্ত হয়ে, সঠিকভাবে অন্তদর্শী হয়ে, সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এই জন্মেই দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন একটি বিষয়ে? সকল সত্ত্বই আহারের ওপর নির্ভরশীল। হে ভিক্ষুগণ, এই একটি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘একটি প্রশ্ন, একটি বিবৃতি, একটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

“আহারের ওপর নির্ভরশীল” মানে যেমন এখানে “হে ভিক্ষুগণ, শুভ নিমিত্ত আছে। তাতে বেশি বেশি করে অযথাযথভাবে মনোযোগ দিলে এই আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপত্তির কারণ হয়” এভাবে ইত্যাদিতে (সং.নি.৫.২৩২) কারণ-আহারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি কারণ শব্দটিকে আহার শব্দের বদলে গ্রহণ করে কারণের ওপর নির্ভরশীল বিধায় “আহারের ওপর নির্ভরশীল” বলা হয়েছে। কিন্তু চার প্রকার আহার সম্বন্ধে “আহারের ওপর নির্ভরশীল” বলার সময় “অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতারা অহেতুক, অনাহারী, স্পর্শহীন, অনুভূতিহীন” এই উক্তি অনুসারে (ৰিভ.১০১৭) “সকল” শব্দটি অযৌক্তিক হয়ে যায়।

এখানে এমনটি বলা হলেও “কোন ধর্মগুলো কারণযুক্ত? পাঁচটি পুঞ্জ, যেমন: পদার্থপুঞ্জ... চিত্তপুঞ্জ” (ধ.স.১০৮৯) এই উক্তি অনুসারে পুঞ্জগুলোর কারণের ওপর নির্ভরশীলতার কথাটি যৌক্তিক বটে, কিন্তু সত্ত্বদের বেলায় এই কথাটি অযৌক্তিক হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাপারটিকে এভাবে দেখা উচিত নয়। কেন? সত্ত্বদের মধ্যে পুঞ্জগুলোর প্রয়োগ বা ব্যবহার সিদ্ধ বা প্রমাণিত হওয়ার কারণে। এই যে সত্ত্বদের মধ্যে পুঞ্জগুলোর প্রয়োগ বা ব্যবহার সিদ্ধ বা প্রমাণিত বলা হয়েছে, সেটি কেন? পুঞ্জগুলোকে ভিত্তি করেই তারা পরিচিত হওয়ার কারণে। কীভাবে? এটি অনেকটা বাড়ির বেলায় গ্রামের উপচার বা আশপাশ এলাকার মতো। যেমন, বাড়িগুলোকে ভিত্তি করে পরিচিত হওয়ায় গ্রামের একটি, দুটি কিংবা তিনটি বাড়ি পুড়ে গেলে “গ্রামটি পুড়ে গেছে” বলা হয়, এভাবেই বাড়ির বেলায় গ্রামের উপচার বা আশপাশ এলাকা সিদ্ধ বা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি পুঞ্জগুলো কারণ অর্থে আহারের ওপর নির্ভরশীল বিধায় “সত্ত্বগণ আহারের ওপর নির্ভরশীল” এই প্রয়োগ বা ব্যবহারটি যুক্তিসিদ্ধ বলে বুঝতে হবে। পরমার্থের দিক থেকে পুঞ্জগুলো উৎপন্ন হওয়ার সময়, বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়ার সময় এবং মৃত্যুবরণ করার সময় “হে ভিক্ষু, তুমি ক্ষণে ক্ষণে জন্মগ্রহণ করছ, বার্ধক্যগ্রস্ত হচ্ছো এবং মৃত্যুবরণ করছ” এই কথাটি ভগবান বলেছেন বিধায় সেই সত্ত্বদের মধ্যে পুঞ্জের প্রয়োগটি যুক্তিসিদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে বুঝতে হবে। যখন যেই কারণ নামক আহারের দ্বারা সকল সত্ত্ব স্থিত থাকে, সেই আহারটি অথবা তাদের সেই আহারের ওপর নির্ভরশীলতাই হচ্ছে এক, বিষয়টিকে এভাবে বুঝতে হবে। আহার অথবা আহারের ওপর নির্ভরশীলতাটি অনিত্যতার কারণ হিসেবে বিরাগের কারণ হয়। এরপর সে সেই সকল সত্ত্ব নামক সৃষ্টিগুলোর মধ্যে অতিত্যতাকে দর্শন করে সেগুলোর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে, পরমার্থ-বিশুদ্ধি লাভ করে। যেমনটি বলা হয়েছে:

“‘সকল সৃষ্টিই অনিত্য’ এটি

যখন সে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করে,

তখন তার দুঃখের প্রতি বিরাগ জন্মে,

এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধির মার্গ বা পথ।” (ধ.প.২৭৭)

### ‘দুই মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**দুই মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির **দুই** বলার পরপরই “**মন** (*নামং*) **ও পদার্থ** (*রূপং*)” বলে ধর্মকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত দেশনার মাধ্যমে উত্তর দিলেন। এখানে বিষয়বস্তুর অভিমুখে নমিত হয় বিধায় এবং চিত্তের নমিত হওয়ার হেতু হয় বিধায় সকল অরূপ বিষয়কে “মন” (*নামং*) বলা হয়। কিন্তু এখানে বিরাগের হেতু হওয়ায় আসবযুক্ত বিষয়ই অভিপ্রেত। রূপান্তর হয় অর্থে চারটি মৌলিক পদার্থকে (*মহাভূতা*) এবং সেগুলো থেকে উপজাত হয়ে চলমান সকল পদার্থকে “পদার্থ” (*রূপং*) বলা হয়, সেসবই এখানে অভিপ্রেত। এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এখানে “দুই মানে হচ্ছে মন (*নামং*) পদার্থ (*রূপং*)” বলা হয়েছে, অন্য দুটি বিষয়ের অভাবের ভিত্তিতে নয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু দুটি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন দুটি বিষয়ে? মন (*নাম*) ও পদার্থে (*রূপ*)। হে ভিক্ষুগণ, এই দুটি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘দুটি প্রশ্ন, দুটি বিবৃতি, দুটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

এখানে সে শুধু মন ও পদার্থকে দর্শন করার মাধ্যমে আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ করে, অনাত্মানুদর্শনকে মুখ্য করে সেগুলোর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে, পরমার্থ-বিশুদ্ধি লাভ করে। যেমনটি বলা হয়েছে:

“‘সকল সৃষ্টিই অনাত্ম’ এটি

যখন সে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করে,

তখন তার দুঃখের প্রতি বিরাগ জন্মে,

এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধির মার্গ বা পথ।” (ধ.প.২৭৯)

### ‘তিন মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**তিন মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির **তিন** বলার পরপরই পুনরায় যে উত্তর দেবেন তার অর্থের লিঙ্গানুরূপ সংখ্যা নির্দেশ করতেই “**তিন প্রকার অনুভূতি**” বলে উত্তর দিলেন। অথবা “ভগবান কর্তৃক যেই ‘তিন প্রকার অনুভূতি’র কথা বলা হয়েছে, আমি এই তিনটি বিষয়ের কথাই বুঝেছি” এটি নির্দেশ করতেই বললেন, এভাবেই এখানে এর অর্থ বুঝতে হবে। বহুমুখী দেশনা হচ্ছে প্রতিসম্ভিদা-ভেদে দেশনাবিলাসের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য। কিন্তু কারো কারো মতে, “তিন শব্দটি এখানে আগের চেয়ে অধিক পদ বা শব্দ হিসেবেই বলা হয়েছে।” আগের মতো করেই এখানে “তিন প্রকার অনুভূতি” বলা হয়েছে, অন্য তিনটি বিষয়ের অভাবের ভিত্তিতে নয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু তিনটি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন তিনটি বিষয়ে? তিন প্রকার অনুভূতিতে। হে ভিক্ষুগণ, এই তিনটি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘তিনটি প্রশ্ন, তিনটি বিবৃতি, তিনটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

এখানে “যত ধরনের অনুভূতি আছে সবই দুঃখ বলে আমি বলি” (সং.নি.৪.২৫৯) উক্ত সূত্রানুসারে, অথবা—

“যে সুখকে দুঃখ ‍হিসেবে দেখে,

দুঃখকে শল্য বা গোঁজ হিসেবে দেখে,

এবং যা অদুঃখ-অসুখ ও শান্ত তাকে

যে অনিত্য ক্ষণস্থায়ী হিসেবে দেখে।” (ইতিৰু.৫৩)

এভাবে দুঃখ-দুঃখতা, বিপরিণাম-দুঃখতা ও সৃষ্টি-দুঃখতা অনুসারে, অথবা তিন প্রকার অনুভূতির দুঃখভাবকে দর্শনের মাধ্যমে সুখ-ধারণাকে ত্যাগ করে, দুঃখানুদর্শনকে মুখ্য করে সেগুলোর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে ক্রমান্বয়ে সে দুঃখের অন্তসাধন করে, পরমার্থ-বিশুদ্ধি লাভ করে বলে বুঝতে হবে। যেমনটি বলা হয়েছে:

“‘সকল সৃষ্টিই দুঃখ’ এটি

যখন সে প্রজ্ঞা দিয়ে দর্শন করে,

তখন তার দুঃখের প্রতি বিরাগ জন্মে,

এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধির মার্গ বা পথ।” (ধ.প.২৭৮)

### ‘চার মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**চার মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। এখানে এই প্রশ্নের উত্তরে কোথাও কোথাও পূর্বোক্ত নিয়মে চার প্রকার আহারই অভিপ্রেত। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু চারটি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন চারটি বিষয়ে? চার প্রকার আহারে। হে ভিক্ষুগণ, এই চারটি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘চারটি প্রশ্ন, চারটি বিবৃতি, চারটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

আবার কোথাও কোথাও যেগুলোতে সুভাবিতচিত্ত হয়ে সে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে, সেই চার প্রকার স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা (*সতিপট্ঠান*)। কজঙ্গলনিবাসী ভিক্ষুণী যেমনটি বলেছেন:

“বন্ধুরা, একজন ভিক্ষু চারটি বিষয়ে সঠিকভাবে সুভাবিতচিত্ত হয়ে, সঠিকভাবে অন্তদর্শী হয়ে, সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এই জন্মেই দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন চারটি? চার প্রকার স্মৃতিপ্রতিষ্ঠায়। বন্ধুরা, একজন ভিক্ষু এই চারটি বিষয়ে সঠিকভাবে সুভাবিতচিত্ত হয়ে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘চারটি প্রশ্ন, চারটি বিবৃতি, চারটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৮)

কিন্তু এখানে যেই চারটি বিষয়কে বোঝার কারণে বা উপলব্ধি করার কারণে ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হয়, যেহেতু সেই চার আর্যসত্যই অভিপ্রেত, অথবা যেহেতু এই পর্যায়ে ব্যাখ্যা করলেই সুব্যাখ্যাত হয়, তাই স্থবির **চার** বলার পরপরই “**চার আর্যসত্য**” বলে উত্তর দিলেন। এখানে **চার** হচ্ছে গণনার সীমা। **আর্যসত্য** মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সত্য, অসত্য ও মিথ্যা নয় অর্থে। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, এই চার আর্যসত্য হচ্ছে সত্য, অসত্য নয় এবং অন্য কিছুও নয়, তাই এগুলোকে আর্যসত্য বলা হয়।” (সং.নি.১০৯৭)

অথবা যেহেতু এগুলোকে দেবতাসহ সত্ত্বদের দ্বারা সান্নিধ্যে যাওয়ার যোগ্য হিসেবে এবং কাছে যাওয়ার যোগ্য হিসেবে বলা হয়েছে, প্রচেষ্টাযোগ্য বিষয় নামক উপায়ে নড়াচড়ার ভিত্তিতে, অথবা অনুপায়ে নড়াচড়া না করার ভিত্তিতে, অথবা সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় আর্যধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতে আর্য হিসেবে স্বীকৃত বুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যরা এগুলোকে বোঝেন, উপলব্ধি করেন, তাই “আর্যসত্য” বলা হয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, এগুলো হচ্ছে চার আর্যসত্য... হে ভিক্ষুগণ, এগুলোই হচ্ছে চার আর্যসত্য, আর্যগণ এগুলোকে ভেদ করে বোঝেন, তাই এগুলোকে আর্যসত্য বলা হয়।”

তা ছাড়া, আর্য ভগবানের সত্য বলেও আর্যসত্য। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, দেবতাসহ... দেব-মানুষদের মাঝে তথাগত হচ্ছেন আর্য, তাই আর্যসত্য বলা হয়।” (সং.নি.৫.১০৯৮)

অথবা এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার মাধ্যমে আর্যভাব প্রাপ্ত হন বলেও আর্যসত্য। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, এই চারটি আর্যসত্যকে যথাযথভাবে বুঝেছেন বিধায় তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ বলা হয়।” (সং.নি.৫.১০৯৩)

এই হচ্ছে এই শব্দগুলোর অর্থ। কিন্তু এই চার আর্যসত্যকে বোঝার কারণে বা উপলব্ধি করার কারণে ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, সেই দুঃখ আর্যসত্য উপলব্ধ হয়েছে, বোঝা হয়েছে,... দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য উপলব্ধ হয়েছে, বোঝা হয়েছে, তাই ভবতৃষ্ণা পুরোপুরি ছিন্ন হয়েছে, ভবতৃষ্ণা ক্ষয় হয়েছে, এখন আর পুনর্জন্ম নেই।” (সং.নি.৫.১০৯১)

### ‘পাঁচ মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**পাঁচ মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির **পাঁচ** বলার পরপরই “**পাঁচটি আঁকড়ে ধরার পুঞ্জ**” বলে উত্তর দিলেন। এখানে **পাঁচটি** হচ্ছে গণনার সীমা। আঁকড়ে ধরাজনিত, অথবা আঁকড়ে ধরার জনক পুঞ্জই হচ্ছে আঁকড়ে ধরার পুঞ্জ। যেসব পদার্থ, অনুভূতি, সংজ্ঞা, সৃষ্টি ও চিত্ত আসবযুক্ত, আঁকড়ে ধরার উপযোগী, এগুলো তারই নামান্তর। আগের মতো করেই এখানে “পাঁচটি আঁকড়ে ধরার পুঞ্জ” বলা হয়েছে, অন্য পাঁচটি বিষয়ের অভাবের ভিত্তিতে নয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু পাঁচটি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন পাঁচটি বিষয়ে? পাঁচটি আঁকড়ে ধরার পুঞ্জে। হে ভিক্ষুগণ, এই পাঁচটি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘পাঁচটি প্রশ্ন, পাঁচটি বিবৃতি, পাঁচটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

এখানে সে পাঁচটি পুঞ্জকে উদয়-ব্যয়ের বশে গভীরভাবে অনুধাবন করতে করতে বিদর্শনামৃত লাভ করে, ক্রমান্বয়ে নির্বাণামৃত সাক্ষাৎ করে। যেমনটি বলা হয়েছে:

“যখনই সে পুঞ্জগুলোর উদয়-ব্যয়কে অনুধাবন করে,

তখন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অমৃতরূপ প্রীতি ও আনন্দ লাভ করে।

(ধ.প.৩৭৪)

### ‘ছয় মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**ছয় মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির **ছয়** বলার পরপরই “**ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তন**” বলে উত্তর দিলেন। এখানে **ছয়টি** হচ্ছে গণনার সীমা। অভ্যন্তরে নিযুক্ত হয়, অথবা নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন হয় এই অর্থে **অভ্যন্তরীণ**। প্রবর্তনের কারণে, বা উৎপত্তি-স্থানের আওতা হওয়ার কারণে, অথবা প্রবর্তিতকে সংসারদুঃখের দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণে “আয়তন” বলা হয়, এটি চোখ-কান-নাক-জিহ্বা-কায়-মনেরই নামান্তর। আগের মতো করেই এখানে “ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তন” বলা হয়েছে, অন্য ছয়টি বিষয়ের অভাবের ভিত্তিতে নয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু ছয়টি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন ছয়টি বিষয়ে? ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তনে। হে ভিক্ষুগণ, এই ছয়টি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘ছয়টি প্রশ্ন, ছয়টি বিবৃতি, ছয়টি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

এখানে এই ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তন, “হে ভিক্ষুগণ, শূন্য গ্রাম হচ্ছে এই ছয়টি অভ্যন্তরীণ আয়তনের অন্য নাম” (সং.নি.৪.২৩৮) এই উক্তির ভিত্তিতে সে শূন্য হিসেবে, এবং বুদবুদ, মরীচিকা ইত্যাদির মতো ক্ষণস্থায়ী হিসেবে, তুচ্ছ হিসেবে ও প্রতারণা হিসেবে দর্শন করে সেগুলোর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে, ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে মৃত্যুরাজের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“একজন ব্যক্তি যেভাবে বুদবুদকে দেখে,

এবং যেভাবে মরীচিকাকে দেখে,

ঠিক সেভাবে জগৎকে দেখলে তখন

মৃত্যুরাজ আর তাকে দেখতে পায় না।” (ধ.প.১৭০)

### ‘সাত মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**সাত মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। যদিও মহাপ্রশ্নের উত্তরে সাতটি চিত্তের স্থিতির কথা বলা হয়েছে, তবুও স্থবির এখানে একজন ভিক্ষু যেই বিষয়গুলোতে সুভাবিতচিত্ত হয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে, সেগুলো নির্দেশ করতেই “**সাতটি বোধির অঙ্গ** (*বোজ্ঝঙ্গা*)” বলে উত্তর দিলেন। এখানে এই উত্তরটিও ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে গৃহপতিগণ, কজঙ্গলনিবাসী ভিক্ষুণী পণ্ডিত, হে গৃহপতিগণ, কজঙ্গলনিবাসী ভিক্ষুণী মহাপ্রজ্ঞাবান, হে গৃহপতিগণ, তোমরা যদি আমার কাছে এসেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে, তখন আমিও একই উত্তর দিতাম, কজঙ্গলনিবাসী ভিক্ষুণী যেভাবে উত্তর দিয়েছে।” (অ.নি.১০.২৮)

তিনি উত্তর দিয়েছেন এভাবে:

“বন্ধুরা, একজন ভিক্ষু সাতটি বিষয়ে সঠিকভাবে সুভাবিতচিত্ত হয়ে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন সাতটি বিষয়ে? সাতটি বোধির অঙ্গে। বন্ধুরা, একজন ভিক্ষু এই সাতটি বিষয়ে সঠিকভাবে সুভাবিতচিত্ত হয়ে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘সাতটি প্রশ্ন, সাতটি বিবৃতি, সাতটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৮)

এভাবেই এই উত্তরটি ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত বলে বুঝতে হবে।

এখানে **সাতটি** হচ্ছে ঊন বা অধিক সংখ্যাকে বারণ করার গণনার সীমা। **বোধির অঙ্গ** (*বোজ্ঝঙ্গ*) হচ্ছে স্মৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলোরই নামান্তর। এখানে এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এই: লৌকিক ও লোকোত্তর-মার্গচিত্তক্ষণে উৎপন্ন হওয়ার সময় চিত্তের জড়তা, চঞ্চলতা, প্রতিষ্ঠা, সঞ্চয়, কামসুখ, কৃচ্ছ্রসাধন, উচ্ছেদ, শাশ্বত, প্রবৃত্তি, অনেক ধরনের উপদ্রবের প্রতিপক্ষভুক্ত স্মৃতি, বিষয়-বিচার, উদ্যম, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা নামক এই বিষয়গুলোকে সমন্বয় করার মাধ্যমে একজন আর্যশ্রাবক বোঝেন বা উপলব্ধি করেন বিধায় **বোধি**, অর্থাৎ তিনি কলুষতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন, বা চার আর্যসত্যকে উপলব্ধি করেন, অথবা নির্বাণকে সাক্ষাৎ করেন বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, “সাতটি বোধির অঙ্গকে গড়ে তুলে তিনি অনুত্তর সম্যক সম্বোধি উপলব্ধি করেছেন।” অথবা উক্ত প্রকারে এই বিষয়গুলোকে সমন্বয় করে একজন আর্যশ্রাবকও বোঝেন বা উপলব্ধি করেন বিধায় **বোধি**। এভাবে বিষয়গুলোর সমন্বয় নামক বোধির অঙ্গভুক্ত হয় বিধায় **বোধির অঙ্গ** ধ্যানাঙ্গ বা মার্গাঙ্গগুলোর ন্যায়, অথবা সেগুলোর বোধি নামক সাধারণভাবে প্রচলিত আর্যশ্রাবকের অঙ্গভুক্ত হয় বিধায় **বোধির অঙ্গ** সৈন্যের অঙ্গ বা রথের অঙ্গ ইত্যাদির ন্যায়।

তা ছাড়া, “**বোধির অঙ্গ** বলতে কোন অর্থে বোধির অঙ্গ? বোধির দিকে নিয়ে যায় অর্থে বোধির অঙ্গ, বোঝে অর্থে বোধির অঙ্গ, উপলব্ধি করে অর্থে বোধির অঙ্গ, জাগ্রত করে অর্থে বোধির অঙ্গ, প্রকৃষ্টরূপে বোঝে অর্থে বোধির অঙ্গ” (পটি.ম.২.১৭) এভাবে প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মেও বোধির অঙ্গগুলোর বোধির অঙ্গের অর্থকে বুঝতে হবে। এভাবে এই সাতটি বোধির অঙ্গকে গড়ে তুলতে পারলে, বহুলভাবে অভ্যাস করতে পারলে সে অচিরেই একান্ত বিতৃষ্ণা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হয়ে থাকে, এর ফলে সে এই জন্মেই দুঃখের অন্তসাধন করতে পারে বলা হয়েছে। তাই তো ভগবান বলেছেন:

“হে ভিক্ষুগণ, এই সাতটি বোধির অঙ্গকে গড়ে তুললে, বহুলভাবে অভ্যাস করলে সেগুলো একান্ত বিতৃষ্ণা, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়।” (সং.নি.৫.২০১)

### ‘আট মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**আট মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। যদিও মহাপ্রশ্নের উত্তরে আটটি লোকধর্মের কথা বলা হয়েছে, তবুও স্থবির এখানে একজন ভিক্ষু যেই বিষয়গুলোতে সুভাবিতচিত্ত হয়ে দুঃখের অন্তসাধন করে, সেগুলো নির্দেশ করতেই “**আটটি আর্য মার্গাঙ্গ**” না বলে, যেহেতু অষ্টাঙ্গবিহীন কোনো মার্গ বা পথ নেই, অষ্টাঙ্গই শুধু মার্গ, তাই তার পূর্ণতা সাধন করতেই দেশনাবিলাসের দ্বারা “**আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ**” বলে উত্তর দিলেন। এখানে এই উত্তরটি এবং দেশনার এই পদ্ধতিটিও ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে গৃহপতিগণ, কজঙ্গলনিবাসী ভিক্ষুণী পণ্ডিত,... তখন আমিও একই উত্তর দিতাম, কজঙ্গলনিবাসী ভিক্ষুণী যেভাবে উত্তর দিয়েছে।” (অ.নি.১০.২৮)

তিনি উত্তর দিয়েছেন এভাবে:

“বন্ধুরা, একজন ভিক্ষু আটটি বিষয়ে সঠিকভাবে সুভাবিতচিত্ত হয়ে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘আটটি প্রশ্ন, আটটি বিবৃতি, আটটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৮)

এভাবেই এই উত্তরটি এবং দেশনার এই পদ্ধতিটি ভগবান কর্তৃক অনুমোদিত বলে বুঝতে হবে।

এখানে **আর্য** বলতে নির্বাণ-প্রত্যাশীদের দ্বারা গমন করা উচিত বলে, তা ছাড়া কলুষতা হতে দূরে নিয়ে যায় বলে, আর্যভাবে উপনীত করায় বলে এবং আর্যফল লাভ করায় বলেও আর্য বুঝতে হবে। এর মধ্যে আটটি অঙ্গ আছে বলে **অষ্টাঙ্গিক**। এটিকে চতুরঙ্গবিশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর ন্যায় এবং পঞ্চাঙ্গিক তূর্যের ন্যায় অঙ্গগুলো পৃথক না হওয়ার স্বভাবের ভিত্তিতে শুধুই অঙ্গ হিসেবে বুঝতে হবে। এর দ্বারা নির্বাণকে খুঁজে নেয়, অথবা নিজেই খুঁজে নেয়, অথবা কলুষতাগুলোকে মারতে মারতে অগ্রসর হয় বিধায় মার্গ।

এভাবে আটটি অঙ্গ ভেদে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে গড়ে তোলার মাধ্যমে একজন ভিক্ষু অবিদ্যাকে ভেঙে চুরমার করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে, নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, এবং এর দ্বারা এই জন্মেই দুঃখের অন্তসাধন করে বলা হয়। তাই তো বলা হয়েছে:

“যেমন, হে ভিক্ষুগণ, ধান বা যবের শুঁয়াকে ওপর দিকে মুখ করে রাখা হলে সেগুলো হাত দিয়ে ধরলে বা পায়ে মাড়ালে হাত-পা ছিঁড়ে যাবে, তা থেকে রক্ত ঝরবে, এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব। তার কারণ কী? হে ভিক্ষুগণ, ধান বা যবের শুঁয়াকে ওপর দিকে মুখ করে রাখার কারণে। ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নিজের চিত্তকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মাধ্যমে অবিদ্যাকে ভেঙে চুরমার করবে, বিদ্যা উৎপন্ন করবে, নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে, এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব।” (অ.নি.১.৪২)

### ‘নয় মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**নয় মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির **নয়** বলার পরপরই “**নয়টি সত্ত্বাবাস**” বলে উত্তর দিলেন। এখানে **নয়টি** হচ্ছে গণনার সীমা। **সত্ত্ব** মানে হচ্ছে জীবিতেন্দ্রিয়-নির্ভর পুঞ্জগুলোর কারণে সত্ত্ব হিসেবে পরিচিত প্রাণীরা। **আবাস** মানে হচ্ছে এগুলোতে বাস করে বা বসবাস করে অর্থে আবাস, সত্ত্বদের আবাস অর্থে সত্ত্বাবাস। এটি হচ্ছে দেশনার ধারা, অর্থগতভাবে এটি কিন্তু নয় শ্রেণির সত্ত্বদেরই নামান্তর। যেমনটি বলা হয়েছে:

“বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা নানাত্ব-কায় ও নানাত্ব-সংজ্ঞী, যেমন: মানুষেরা, কিছু কিছু দেবতা এবং কিছু কিছু বিনিপাতিক, এটি হচ্ছে প্রথম সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা নানাত্ব-কায় কিন্তু একত্ব-সংজ্ঞী, যেমন: প্রথম ধ্যানের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী ব্রহ্মকায়িক দেবতারা (অর্থাৎ ব্রহ্মপরিষদ, ব্রহ্মপুরোহিত ও মহাব্রহ্মা নামক প্রথম ধ্যানভূমির দেবতারা), এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা একত্ব-কায় কিন্তু নানাত্ব-সংজ্ঞী, যেমন: আভাস্বর দেবতারা, এটি হচ্ছে তৃতীয় সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা একত্ব-কায় ও একত্ব-সংজ্ঞী, যেমন: শুভাকীর্ণ দেবতারা, এটি হচ্ছে চতুর্থ সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা অসংজ্ঞী ও অনুভূতিহীন, যেমন: অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবতারা, এটি হচ্ছে পঞ্চম সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা রূপসংজ্ঞাকে পুরোপুরি অতিক্রম করে... আকাশ-অনন্ত-আয়তনে জন্মগ্রহণকারী, এটি হচ্ছে ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা... বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তনে জন্মগ্রহণকারী, এটি হচ্ছে সপ্তম সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা... আকিঞ্চন-আয়তনে জন্মগ্রহণকারী, এটি হচ্ছে অষ্টম সত্ত্বাবাস। বন্ধুগণ, এমন সত্ত্বগণ আছে যারা... নৈবসংজ্ঞা-নাঅসংজ্ঞা-আয়তনে জন্মগ্রহণকারী, এটি হচ্ছে নবম সত্ত্বাবাস।” (দী.নি.৩.৩৪১)

আগের মতো করেই এখানে “নয়টি সত্ত্বাবাস” বলা হয়েছে, অন্য নয়টি বিষয়ের অভাবের ভিত্তিতে নয়। যেমনটি বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নয়টি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন নয়টি বিষয়ে? নয়টি সত্ত্বাবাসে। হে ভিক্ষুগণ, এই নয়টি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘নয়টি প্রশ্ন, নয়টি বিবৃতি, নয়টি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

এখানে “নয়টি বিষয় পরিজ্ঞেয় (অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে জানা উচিত)। কোন নয়টি? নয়টি সত্ত্বাবাস” (দী.নি.৩.৩৫৯) এই উক্তির ভিত্তিতে সে জানার পরিপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা (*ঞাত-পরিঞ্ঞায*) নয়টি সত্ত্বাবাসকে ধ্রুব-শুভ-সুখ হিসেবে দেখাটাকে পরিত্যাগ করে, অনুসন্ধানের পরিপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা (*তীরণ-পরিঞ্ঞায*) শুদ্ধ সৃষ্টিপুঞ্জ হিসেবে দেখার মাধ্যমে বিরাগ পোষণ করে, অনিত্যানুদর্শনের দ্বারা বিতৃষ্ণ হয়ে, দুঃখানুদর্শনের দ্বারা বিমুক্ত হয়ে, অনাত্মানুদর্শনের দ্বারা সঠিকভাবে অন্তদর্শী হয়ে, পরিত্যাগের পরিপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা (*পহান-পরিঞ্ঞায*) সঠিকভাবে উপলব্ধি করে, এই জন্মেই দুঃখের অন্তসাধন করে। তাই তো বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু নয়টি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন নয়টি বিষয়ে? নয়টি সত্ত্বাবাসে।” (অ.নি.১০.২৭)

### ‘দশ মানে কী’ প্রশ্নের বর্ণনা

এভাবে এই প্রশ্নের উত্তরেও খুশি হয়ে শাস্তা আগের মতো করেই “**দশ মানে কী?**” বলে আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। এখানে যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে অন্যত্র দশ প্রকার অকুশল কর্মপথের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু দশটি বিষয়ে সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। কোন দশটি বিষয়ে? দশ প্রকার অকুশল কর্মপথে। হে ভিক্ষুগণ, এই দশটি বিষয়ে একজন ভিক্ষু সঠিকভাবে বিরাগ পোষণ করে,... দুঃখের অন্তসাধন করে। ‘দশটি প্রশ্ন, দশটি বিবৃতি, দশটি উত্তর’ এভাবে যা বলা হয়েছে তা এই কারণেই বলা হয়েছে।” (অ.নি.১০.২৭)

কিন্তু এখানে এই আয়ুষ্মান নিজের কথা না টেনে অর্হতের কথা বলার ইচ্ছায়, অথবা যেহেতু এই পর্যায়ে ব্যাখ্যা করলে সুব্যাখ্যাতই হয়, তাই যেই দশটি অঙ্গ সমন্বিত ব্যক্তিকে অর্হৎ বলা হয়, সেগুলোর অর্জনকে তুলে ধরতেই “**দশ অঙ্গ সমন্বিত ব্যক্তিকে ‘অর্হৎ’ বলা হয়**” বলে ব্যক্তিমূলক দেশনার দ্বারা উত্তর দিলেন। এখানে যেই দশটি অঙ্গ সমন্বিত ব্যক্তিকে অর্হৎ বলা হয়, সেই দশটি অঙ্গকে লক্ষ্য করেই “দশ মানে কী” এভাবে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন বলে স্থবির ধরে নিয়েছেন বুঝতে হবে। সেই দশটি অঙ্গ হচ্ছে:

“ভন্তে, ‘অশৈক্ষ্য অশৈক্ষ্য’ বলা হয়, কিন্তু কীভাবে একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হন? এখানে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য সম্যক দৃষ্টি সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক সংকল্প সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক বাক্য সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক কর্ম সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক জীবিকা সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক প্রচেষ্টা সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক স্মৃতি সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক সমাধি সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক জ্ঞান সমন্বিত হন, অশৈক্ষ্য সম্যক বিমুক্তি সমন্বিত হন। এভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হন।” (অ.নি.১০.১১১)

এভাবে ইত্যাদি সূত্রে বর্ণিত নিয়মে বুঝতে হবে।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

কুমার-প্রশ্নের বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# ৫. মঙ্গল সূত্রের বর্ণনা

## সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা

এখন কুমার-প্রশ্নের পর উল্লেখিত মঙ্গল সূত্রের অর্থবর্ণনার পালা উপস্থিত হয়েছে। এখানে আমি তার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা বলার পরই অর্থবর্ণনা করব। যেমন: এই সূত্রটি ভগবান কর্তৃক এই ধারাবাহিকতায় বলা না হলেও, এই যে শরণ গ্রহণের দ্বারা শাসনে প্রবেশের রাস্তা, শিক্ষাপদ, দেহের বত্রিশটি অংশ ও কুমার-প্রশ্নের দ্বারা শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে, সবই পরম মঙ্গলের অন্তর্গত, কিন্তু মঙ্গলপ্রত্যাশী ব্যক্তি যদি এখানে আরো কিছু যোগ করা উচিত মনে করেন, তা হলে তাঁকে এই সূত্র অনুসারেই বুঝতে হবে, এটি তুলে ধরতেই বলা হয়েছে।

এখানে এই হচ্ছে এর সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা।

## প্রথম মহাসঙ্গীতির কথা

এভাবে আলোচিত সূত্রটির অর্থবর্ণনার জন্য এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণী—

“যার দ্বারা, যখন, যেই কারণে বলা হয়েছে,

এই বিধি অনুসারে এটি বলার পর

এরূপ ইত্যাদি পাঠের অর্থ ও এর উৎপত্তি-কথা

নানা প্রকারে বর্ণনা করার সময়—

যেখানে যেই মঙ্গল বলার কথা

সেখানে সেটি ব্যাখ্যা করার পর

মঙ্গলের বিষয়গুলো খোলাসা করা হবে।”

এখানে “**যার দ্বারা, যখন, যেই কারণে বলা হয়েছে, এই বিধি অনুসারে এটি বলার পর**” এই অর্ধেক গাথাটি “আমি এরূপ শুনেছি। একসময় ভগবান... সেই দেবতা ভগবানকে গাথাযোগে বলল” এই উক্তি সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। এটি বস্তুত শোনার ভিত্তিতেই বলা হয়েছে, যেহেতু সেই ভগবান হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ, আচার্যবিহীন, তাই এটি কিছুতেই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের উক্তি নয়। তা হলে তো বলা উচিত—“এই কথাটি কার দ্বারা বলা হয়েছে, কখন এবং কেন বলা হয়েছে?” উত্তরে বলা যায়, আয়ুষ্মান আনন্দের দ্বারা বলা হয়েছে, তাও আবার প্রথম মহাসঙ্গীতির সময়ে।

এই প্রথম মহাসঙ্গীতিকে সকল সূত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জনের জন্য একদম শুরু থেকেই এভাবে বুঝতে হবে। ধর্মচক্র প্রবর্তন হতে শুরু করে একেবারে সুভদ্র পরিব্রাজককে দমন করা পর্যন্ত, বুদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করে কুশীনারার পার্শ্ববর্তী মল্লদের শালবনে জোড়া শালগাছের মাঝখানে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে ভোরের দিকে পুঞ্জবিহীন নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হলে লোকনাথ ভগবানের পরিনির্বাণে সমাগত সাত লক্ষ ভিক্ষুদের মধ্যে সংঘস্থবির আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভগবানের পরিনির্বাণের সাত দিন পর বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের “হয়েছে বন্ধুগণ, তোমরা শোক করো না, বিলাপ করো না, আমরা বরং সেই মহাশ্রমণ হতে মুক্তি পেয়েছি, তিনি ‘তোমাদের এটি করা ঠিক, এটি করা ঠিক নয়’ বলে বলে আমাদের বড্ড জ্বালাতেন, এখন আমরা যা ইচ্ছা হয় তা-ই করতে পারব, যা ইচ্ছা নয় তা করব না” (চূল়ৰ.৪৩৭; দী.নি.২.২৩২) উক্ত কথা স্মরণ করে “এমনটি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে পাপী ভিক্ষুরা ‘শাস্তার শাসন অতীত হয়ে গেছে’ ভেবে ঘোঁট পাকাবার সুযোগ পেয়ে অচিরেই সদ্ধর্মকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে। যতদিন ধর্মবিনয় টিকে থাকবে ততদিন শাস্তার শাসন অতীত হয়ে যাবে না।” যেমনটি ভগবান বলেছেন:

“হে আনন্দ, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে যে ধর্ম ও বিনয় দেশনা করেছি, প্রজ্ঞাপ্ত করেছি, আমার চলে যাওয়ার পর তা-ই হবে তোমাদের শাস্তা।” (দী.নি.২.২১৬)

“আমি বরং ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তির ব্যবস্থা করি, যাতে এই শাসন দীর্ঘজীবী ও চিরস্থায়ী হয়।”

ভগবান আমাকে—

“কিন্তু হে কাশ্যপ, তুমি কি আমার এই পরিত্যক্ত রুক্ষ শণের সুতো দিয়ে তৈরি পাংশুকুল চীবরই ধারণ করবে?” বলে চীবরে সাধারণ পরিভোগের দ্বারা, এবং—

“হে ভিক্ষুগণ, আমার যখনই ইচ্ছা হয়, আমি কাম হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করে বাস করি, হে ভিক্ষুগণ, কাশ্যপেরও যখনই ইচ্ছা হয়, সে কাম হতে পৃথক হয়ে... প্রথম ধ্যানে প্রবেশ করে বাস করে।”

এভাবে ইত্যাদি প্রকারে নয় প্রকার আনুক্রমিক বিহার, ষড়ভিজ্ঞা প্রভৃতি সাধারণ মানুষের অতীত উচ্চতর ধর্মগুলোতে নিজের সমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে অনুগৃহীত করেছেন, তাঁর সেই ঋণ আমি কীভাবে শোধ করব? “ভগবান আমাকে রাজার মতো স্বীয় বর্ম ও রাজত্বভার প্রদানের মাধ্যমে নিজের কুলবংশ প্রতিষ্ঠাকারী পুত্রকে ‘আমার এই পুত্র সদ্ধর্মবংশের প্রতিষ্ঠাকারী হবে’ ভেবে এই অসাধারণ অনুগ্রহের দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন নয় কি?” এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ধর্মবিনয় আবৃত্তির জন্য ভিক্ষুদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে দিলেন। যেমন বলা হয়েছে:

“এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, বন্ধুগণ, একসময় আমি পাবা হতে কুশীনারার উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ ধরে হাঁটা ধরেছিলাম পাঁচশো ভিক্ষুর বিশাল ভিক্ষুসংঘ সহকারে।” (দী.নি.২.২৩১; চূল়ৰ.৪৩৭) এভাবে এখানে সমগ্র **সুভদ্র অধ্যায়টি** বিস্তারিত করতে হবে।

এরপর তিনি বললেন:

“আসুন, বন্ধুগণ, অধর্ম উজ্জ্বল ও ধর্ম নিষ্প্রভ হওয়ার আগেই, অবিনয় উজ্জ্বল ও বিনয় নিষ্প্রভ হওয়ার আগেই, অধর্মবাদীরা শক্তিশালী ও ধর্মবাদীরা দুর্বল হওয়ার আগেই, অবিনয়বাদীরা শক্তিশালী ও বিনয়বাদীরা দুর্বল হওয়ার আগেই, আমরা ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তি করি।” (চূল়ৰ.৪৩৭)

ভিক্ষুরা বললেন, “তা হলে, ভন্তে, স্থবির ভিক্ষুদের মনোনীত করুন।” তখন মহাকাশ্যপ স্থবির সমগ্র নবাঙ্গ শাস্তাশাসনে পরিয়ত্তিধর, সাধারণ পৃথগ্জন, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, শুষ্কবিদর্শক, ক্ষীণাসব অনেক শত ও অনেক হাজার ভিক্ষুদের বাদ দিয়ে, ত্রিপিটক ও সমগ্র পরিয়ত্তি প্রভৃতি ধারণকারী, প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত, মহাপ্রভাবশালী, অধিকাংশই ভগবান কর্তৃক অগ্রপদে বসানো ত্রিবিদ্যা ইত্যাদি লাভী ক্ষীণাসব ভিক্ষু, এ রকম মোট চারশো নিরানব্বই জন ভিক্ষুকে গ্রহণ করলেন। যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ চারশো নিরানব্বই জন অর্হৎ ভিক্ষুকে মনোনীত করলেন।” (চূল়ৰ.৪৩৭)

কিন্তু স্থবির কেন একজন কম নিলেন? আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। কারণ তখন আয়ুষ্মান আনন্দকে নিয়ে, কিংবা তাঁকে ছাড়া কিছুতেই ধর্মসঙ্গীতি করা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন তখনো একজন শৈক্ষ্য সকরণীয় ভিক্ষু, তাই তাঁকে নিয়ে ধর্মসঙ্গীতি করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তিনি যেহেতু দশবল কর্তৃক দেশিত সূত্র, গেয়্য ইত্যাদি ধর্মগুলো ভগবানের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা করে ধারণ করেছেন, তাই তাঁকে ছাড়াও ধর্মসঙ্গীতি করা সম্ভব ছিল না। তিনি যদি শৈক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও ধর্মসঙ্গীতির মহাউপকারী হয়ে থাকেন তা হলে তো স্থবির কর্তৃক তাঁকে আগেই মনোনীত করা উচিত ছিল, কিন্তু কেন তাঁকে মনোনীত করলেন না? পরনিন্দা এড়ানোর জন্য। স্থবির আয়ুষ্মান আনন্দের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি তাঁর মাথার চুলে পাক ধরা সত্ত্বেও “এখনো এই কুমার নিজের মাত্রা জানল না” বলে তাঁকে কুমার সম্বোধন করে উপদেশ দিতেন। এই আয়ুষ্মান ছিলেন শাক্যকুলে জন্মগ্রহণকারী, তথাগতের ভাই, আপন কাকার ছেলে। এ ক্ষেত্রে ভিক্ষুরা ইচ্ছার বশবর্তী হওয়ার মতো মনে করে “স্থবির বহু অশৈক্ষ্য প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বাদ দিয়ে শৈক্ষ্য প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত আনন্দকেই মনোনীত করলেন” বলে নিন্দা করতে পারেন। সে-ধরনের পরনিন্দা এড়ানোর জন্যই “আনন্দকে ছাড়া সঙ্গীতি করা কিছুতেই সম্ভব নয়, তাই ভিক্ষুদের অনুমতি নিয়েই তাকে গ্রহণ করব” ভেবে মনোনীত করলেন না।

এরপর ভিক্ষুরা নিজেরাই আনন্দ স্থবিরকে মনোনীত করার জন্য স্থবিরকে অনুরোধ করলেন। যেমন বলা হয়েছে:

“ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে বললেন, ‘ভন্তে, এই আয়ুষ্মান আনন্দ যদিও এখনো শৈক্ষ্য, কিন্তু তিনি ইচ্ছা, বিদ্বেষ, মোহ ও ভয়ের বশে বিপথে যাওয়ার অযোগ্য, তিনি নিজে ভগবানের কাছে বহু ধর্ম ও বিনয় শিক্ষা করেছেন, তাই স্থবির আয়ুষ্মান আনন্দকেও মনোনীত করুন।’ এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকেও মনোনীত করলেন।” (চূল়ৰ.৪৩৭)

এভাবে ভিক্ষুদের অনুমতির ভিত্তিতে মনোনীত সেই আয়ুষ্মান আনন্দসহ মোট পাঁচশো স্থবির হলেন।

এরপর স্থবির ভিক্ষুরা চিন্তা করলেন, “আমরা কোথায় ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তি করব?” তখন স্থবির ভিক্ষুদের মনে পড়ল—“রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সুলভ, বাসস্থানও অনেক আছে, তা হলে আমরা রাজগৃহে বর্ষাবাস যাপন করে ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তি করি না কেন! অন্য কোনো ভিক্ষুই রাজগৃহে বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করতে পারবে না।” কিন্তু কেন তাঁদের এমনটি মনে হয়েছিল? কারণ এটি আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কাজ, বিরোধী কেউ হয়তো সংঘের মধ্যে ঢুকে ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে। এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্মবাক্যের দ্বারা ঘোষণা করলেন। তা **সঙ্গীতি স্কন্ধে** (চূল়ৰ.৪৩৭) বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে।

এরপর তথাগতের পরিনির্বাণের পর এক সপ্তাহ সাধুক্রীড়া দিবস ও এক সপ্তাহ ধাতুপূজা দিবস অতিবাহিত হলে “অর্ধমাস কেটে গেছে, এখন গ্রীষ্মঋতুর দেড় মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে, বর্ষা শুরুর দিন ঘনিয়ে এসেছে” ভেবে মহাকাশ্যপ স্থবির “বন্ধুরা, চলো আমরা রাজগৃহে যাই” বলে অর্ধেক ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে এক রাস্তা দিয়ে গেলেন। অনুরুদ্ধ স্থবিরও বাকি অর্ধেক ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে অন্য এক রাস্তা দিয়ে গেলেন। কিন্তু আনন্দ স্থবির ভগবানের পাত্র-চীবর নিয়ে, ভিক্ষুসংঘ পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রাবস্তীতে গিয়ে রাজগৃহে যাওয়ার ইচ্ছায় শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আনন্দ স্থবির যেখানেই গেলেন সেখানকার লোকজন মহাবিলাপ করল এই বলে—“ও ভন্তে আনন্দ, আপনি শাস্তাকে কোথায় রেখে এসেছেন!” ক্রমান্বয়ে স্থবির শ্রাবস্তীতে এসে পৌঁছালে ভগবানের পরিনির্বাণের সময়ের মতো সেখানকার লোকজনও মহাবিলাপ করল।

সেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ দীর্ঘক্ষণ ধরে অনিত্য ইত্যাদি সম্পর্কীত ধর্মকথা বলে সেই বিশাল জনতাকে বোঝানোর পর, জেতবনে প্রবেশ করে দশবল কর্তৃক বসবাস করা গন্ধকুটির দরজা খুলে, সেখান থেকে খাট ও চেয়ারগুলো বের করে ভালো করে ঝেড়ে-মুছে, গন্ধকুটি ঝাড়ু দিয়ে, শুকনো মালা ও ময়লা-আবর্জনা বাইরে ফেলে দিয়ে, পুনরায় খাট ও চেয়ারগুলো যথাস্থানে রেখে, ভগবানের জীবদ্দশায় যেসব করণীয় ব্রত পালন করা হতো সবই পালন করলেন। এরপর স্থবির ভগবানের পরিনির্বাণের পর থেকে বেশি বেশি দাঁড়িয়ে থাকায় ও বসে থাকায় মাত্রাতিরিক্ত ধাতু বেড়ে যাওয়া শরীরকে সতেজ ও চাঙ্গা করতে পরদিন দুধের জোলাপ পান করে বিহারের মধ্যেই বসে থাকলেন, যেটিকে উদ্দেশ্য করে তিনি শুভ যুবকের পাঠানো যুবককে বললেন:

“হে যুবক, এখন অসময়, আজ আমি ওষুধ সেবন করেছি, আমি বরং কাল ও সময় বুঝে আগামীকাল যেতে পারি।” (দী.নি.১.৪৪৭)

পরদিন তিনি চেতক স্থবিরকে পশ্চাদ্গামী শ্রমণরূপে নিয়ে, সেখানে গিয়ে শুভ যুবকের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে দীর্ঘনিকায়ের **শুভ সূত্র** নামে দশম সূত্রটি ভাষণ করলেন।

এরপর স্থবির জেতবন বিহারে জরাজীর্ণ আবাসগুলোর মেরামতের কাজ করিয়ে, বর্ষা শুরুর দিন ঘনিয়ে আসলে রাজগৃহে চলে গেলেন। একইভাবে মহাকাশ্যপ স্থবির ও অনুরুদ্ধ স্থবিরও সমগ্র ভিক্ষুসংঘকে নিয়ে রাজগৃহে চলে গেলেন।

সেই সময় রাজগৃহে আঠারোটি মহাবিহার ছিল। সেগুলো সবই পরিত্যক্ত, জরাজীর্ণ ও নোংড়া হয়ে পড়েছিল। ভগবান পরিনির্বাপিত হলে ভিক্ষুরা সবাই নিজ নিজ পাত্র-চীবর নিয়ে বিহার ও পরিবেণ (ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ) ফেলে চলে গিয়েছিল। তাই স্থবির ভগবানের উপদেশকে পূজা করার জন্য এবং তীর্থিয়দের বদনাম থেকে বাঁচার জন্য “প্রথম মাসের মধ্যে জরাজীর্ণ আবাসগুলোকে মেরামতের ব্যবস্থা করব” চিন্তা করলেন। তীর্থিয়রা হয়তো এই বলে বদনাম করতে পারে—“শ্রমণ গৌতমের শিষ্যরা শুধু শাস্তার জীবদ্দশায় বিহারগুলোকে ঠিকমতো দেখাশোনা করেছিল, অথচ পরিনির্বাণের পর সব ফেলে রেখে চলে গেল।” তাদের সেই বদনাম হতে বাঁচার জন্যই চিন্তা করলেন বলা হয়েছে। তাই তো বলা হয়েছে:

“এরপর স্থবির ভিক্ষুগণ চিন্তা করলেন, বন্ধুগণ, ভগবান কর্তৃক জরাজীর্ণ আবাসগুলোর মেরামত প্রশংসিত, তাই আসুন বন্ধুগণ, আমরা সবাই প্রথম মাসে জরাজীর্ণ আবাসগুলোকে মেরামতের ব্যবস্থা করি, এবং তারপর মাঝখানের মাসটিতে সবাই মিলে ধর্ম ও বিনয় আবৃত্তি করব।” (চূল়ৰ.৪৩৮)

তাঁরা পরদিন গিয়ে রাজদ্বারে দাঁড়ালেন। রাজা অজাতশত্রু নিজে এসে বন্দনা করে “ভন্তে, আমি কী করতে পারি? কোনো প্রয়োজন আছে কি?” বলে জানতে চাইলেন। স্থবিরগণ আঠারোটি মহাবিহারকে মেরামতের জন্য কারিগরসহ কাজের লোক প্রয়োজন সে-কথা জানালেন। “সাধু ভন্তে” বলে রাজা কারিগরসহ কাজের লোক দিলেন। স্থবিরগণ প্রথম মাসের মধ্যেই সবকটি বিহার মেরামত করালেন।

এরপর তাঁরা রাজাকে জানালেন, “মহারাজ, বিহার মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে, এখন আমরা ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করব।” “সাধু ভন্তে, আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করুন, আজ্ঞাচক্র আমার, আর ধর্মচক্র আপনাদের হোক। আদেশ করুন, ভন্তে, আমি এখন কী করব?” “ধর্ম আবৃত্তিকারী ভিক্ষুগণের একসঙ্গে বসার জায়গা বানাতে হবে, মহারাজ।” “কোথায় বানাব, ভন্তে?” “বেভার পর্বতের পাশে সপ্তপর্ণি গুহায় ঢোকার মুখে বানালে ভালো হয়, মহারাজ।” “সাধু ভন্তে” বলে রাজা অজাতশত্রু বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত মণ্ডপের মতো বিশাল এক মণ্ডপ তৈরি করালেন। সেটির দেয়াল, খুঁটি ও সিঁড়িগুলো সুবিভক্ত এবং নানা ধরনের মালা ও লতা দিয়ে বিচিত্রভাবে সাজানো। সারা মণ্ডপ জুড়ে রঙবেরঙের ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওপরে সুন্দর শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, বিচিত্র সব রত্ন ও মণি দিয়ে সাজানো মেঝের মতোই সেটি নানান ফুলের নৈবেদ্য দিয়ে বিচিত্রভাবে সাজানো হয়েছে, মঞ্চের কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, সেটিকে একেবারে ব্রহ্মবিমানের মতো করে সাজানো হয়েছে। সেই মহামণ্ডপে পাঁচশো ভিক্ষুর জন্য পাঁচশো মহামূল্যবান অনুমোদিত (কপ্পিয়) বসার গদি পেতে দিয়ে, দক্ষিণদিককে পেছনে দিয়ে উত্তরদিকে মুখ করে স্থবিরদের আসন প্রস্তুত করিয়ে, মণ্ডপের মাঝখানে পূর্বদিকে মুখ করে ভগবান বুদ্ধের আসনের উপযোগী ধর্মাসন প্রস্তুত করিয়ে, তাতে দন্তখচিত নানা রঙের পাখা রেখে দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে জানালেন, “ভন্তে, সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।”

ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, “বন্ধু আনন্দ, আগামীকাল সংঘ-সম্মেলন, তুমি এখনো শৈক্ষ্য ও সকরণীয়, এমতাবস্থায় তোমার পক্ষে সম্মেলনে যাওয়া ঠিক হবে না, তুমি অপ্রমত্ত হও।” এরপর আয়ুষ্মান আনন্দ “আগামীকালই সংঘ-সম্মেলন, শৈক্ষ্য অবস্থায় সম্মেলনে যাওয়া আমার পক্ষে মোটেই ঠিক হবে না” ভেবে অনেক গভীর রাত পর্যন্ত কায়গতস্মৃতিতে কাটিয়ে, ভোরের দিকে চঙ্ক্রমণ ত্যাগ করে বিহারে প্রবেশ করে “একটু শোব” ভেবে দেহকে শিথিল করে দিলেন। দুই পা মাটি থেকে তোলা হয়েছে এবং মাথাটি বালিশে ছোঁয়া হয়নি, এর মধ্যেই তিনি কোনো কিছুকে আঁকড়ে না ধরে আসব হতে চিত্তকে বিমুক্ত করলেন। এই আয়ুষ্মান চঙ্ক্রমণ করে করে বাইরে কাটিয়ে বিশেষ কিছুই উৎপন্ন করতে না পেরে চিন্তা করলেন, “ভগবান কি আমাকে এটি বলেননি যে ‘আনন্দ, তুমি কৃতপুণ্য, সাধনায় মন দাও, শিগগিরই তুমি অনাসব হতে পারবে?’ (দী.নি.২.২০৭) বুদ্ধগণের কথার বরখেলাপ হয় না, কিন্তু আমি বড্ড বেশি উদ্যম বাড়িয়ে দিয়েছি, তাতে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, আমি বরং বীর্যসমতা সাধনে নিয়োজিত হই” ভেবে চঙ্ক্রমণ ত্যাগ করে পা ধোয়ার স্থানে দাঁড়িয়ে পা ধুয়ে, বিহারে প্রবেশ করে খাটে বসে “একটু জিরিয়ে নিই” ভেবে দেহকে খাটের ওপর ছেড়ে দিলেন। দুই পা মাটি থেকে তোলা হয়েছে এবং মাথাটি বালিশে ছোঁয়া হয়নি, এর মধ্যেই তিনি কোনো কিছুকে আঁকড়ে না ধরে আসব হতে চিত্তকে বিমুক্ত করলেন। স্থবিরের এই অর্হত্ত্বলাভ চার দৈহিক ভঙ্গিমার কোনোটির মধ্যেই পড়ে না। তাই “এই শাসনে না-বসা অবস্থায়, না-শোয়া অবস্থায়, না-দাঁড়ানো অবস্থায়, না-হাঁটার অবস্থায় কোন ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন?” এভাবে বললে “আনন্দ স্থবির” বলে উত্তর দেওয়া উচিত।

পরদিন স্থবির ভিক্ষুগণ ভোজনপর্ব সেরে, পাত্র-চীবর যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে ধর্মসভায় সমবেত হলেন। কিন্তু আনন্দ স্থবির নিজের অর্হত্ত্বপ্রাপ্তির কথা জ্ঞাপন করার ইচ্ছায় ভিক্ষুদের সঙ্গে ধর্মসভায় গেলেন না। ভিক্ষুগণ জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নিজ নিজ আসনে বসার সময় আনন্দ স্থবিরের আসন খালি রেখে বসলেন। তখন কোনো কোনো ভিক্ষু “এই আসনটি কার” বলে জিজ্ঞেস করলে তাদের “এটি আনন্দ স্থবিরের” বলা হলো। “কিন্তু আনন্দ স্থবির কোথায় গেলেন?” সেই সময় স্থবির চিন্তা করলেন, “এখনই আমার যাওয়ার উপযুক্ত সময়।” এরপর তিনি নিজের শক্তিমত্তা দেখিয়ে পৃথিবীতে ডুব দিয়ে একেবারে নিজের আসনেই আবির্ভূত হলেন। আবার কারো কারো মতে, তিনি আকাশপথে এসে আসনে বসলেন।

এভাবে সেই আয়ুষ্মান নিজ আসনে বসার পর মহাকাশ্যপ স্থবির ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “বন্ধুগণ, আমরা প্রথমে কী আবৃত্তি করব, ধর্ম নাকি বিনয়?” ভিক্ষুগণ বললেন, “ভন্তে মহাকাশ্যপ, **বিনয় হচ্ছে বুদ্ধশাসনের আয়ু, বিনয় টিকে থাকলে শাসন টিকে থাকবে**, তাই প্রথমে আমরা বিনয় আবৃত্তি করব।” “কাকে পুরোধা করে বিনয় আবৃত্তি করা উচিত?” “আয়ুষ্মান উপালিকে।” “তা হলে আনন্দ কি পারবে না?” “পারবে না তা নয় ভন্তে, কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ বেঁচে থাকতে বিনয়শিক্ষার ক্ষেত্রে আয়ুষ্মান উপালিকেই অগ্রপদে বসিয়েছেন এই বলে—“হে ভিক্ষুগণ, আমার শিষ্য বিনয়ধর ভিক্ষুদের মধ্যে উপালিই শ্রেষ্ঠ।” (অ.নি.১.২২৮) তাই উপালি স্থবিরকে প্রশ্ন করেই আমরা বিনয় আবৃত্তি করব। এরপর স্থবির বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য নিজেই নিজেকে মনোনীত করলেন। উপালি স্থবিরও উত্তর দেওয়ার জন্য মনোনীত হলেন। এখানে এই হচ্ছে পালি:

এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন এভাবে:

“বন্ধু সংঘ, আমার কথা শুনুন, যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয় তা হলে আমি উপালিকে বিনয় বিষয়ক প্রশ্ন করতে পারি।”

আয়ুষ্মান উপালিও সংঘকে জ্ঞাপন করলেন এভাবে:

“ভন্তে সংঘ, আমার কথা শুনুন, যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয় তা হলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত বিনয় বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।”

এভাবে নিজেই নিজেকে মনোনীত করে আয়ুষ্মান উপালি আসন হতে উঠে, চীবর একাংশ করে, ভিক্ষুদের বন্দনা জানিয়ে, দন্তখচিত পাখা হাতে নিয়ে ধর্মাসনে বসলেন। এরপর মহাকাশ্যপ স্থবির উপালি স্থবিরকে প্রথম পারাজিকা হতে শুরু করে সমগ্র বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন এবং উপালি স্থবির উত্তর দিলেন। পাঁচশো ভিক্ষু সবাই প্রথম পারাজিকা শিক্ষাপদটি উৎপত্তিসহ একসঙ্গে শিক্ষা করলেন। এভাবে বাকি সকল শিক্ষাপদকেও বিনয়ের অর্থকথাসহ গ্রহণ করতে হবে। এই নিয়মে উভয় বিভঙ্গসহ (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, অর্থাৎ পারাজিকা ও পাচিত্তিয় বই দুটিসহ) এবং খন্ধক (মহাবর্গ ও চূলবর্গ) ও পরিবারসহ সমগ্র বিনয়পিটক আবৃত্তি করে, উপালি স্থবির দন্তখচিত পাখাটিকে একপাশে রেখে, ধর্মাসন হতে নেমে, বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের বন্দনা করে, নিজের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

বিনয় আবৃত্তির পর ধর্ম আবৃত্তি করার ইচ্ছায় আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন, “ধর্ম আবৃত্তি করার সময় কাকে পুরোধা করে ধর্ম আবৃত্তি করা উচিত?” ভিক্ষুগণ বললেন, “আনন্দ স্থবিরকে পুরোধা করে।”

এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সংঘকে জ্ঞাপন করলেন এভাবে:

“বন্ধু সংঘ, আমার কথা শুনুন, যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয় তা হলে আমি আনন্দকে ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করতে পারি।”

আয়ুষ্মান আনন্দও সংঘকে জ্ঞাপন করলেন এভাবে:

“ভন্তে সংঘ, আমার কথা শুনুন, যদি সংঘের উপযুক্ত সময় হয় তা হলে আমি আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।”

এরপর আয়ুষ্মান আনন্দ আসন হতে উঠে, চীবর একাংশ করে, স্থবির ভিক্ষুদের বন্দনা জানিয়ে, দন্তখচিত পাখা হাতে নিয়ে ধর্মাসনে বসলেন। এরপর মহাকাশ্যপ স্থবির আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, “বন্ধু আনন্দ, ব্রহ্মজাল সূত্র কোথায় ভাষিত হয়েছে?” “ভন্তে, রাজগৃহ ও নালন্দার মাঝখানে অবস্থিত অম্বলট্‌ঠিকার রাজবাড়িতে।” “কাকে উপলক্ষ করে?” “পরিব্রাজক সুপ্রিয় ও যুবক ব্রহ্মদত্তকে উপলক্ষ করে।” এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে ব্রহ্মজাল সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। “বন্ধু আনন্দ, শ্রামণ্যফল সূত্র কোথায় ভাষিত হয়েছে?” “ভন্তে, রাজগৃহে জীবকের আমবাগানে।” “কার সঙ্গে?” “বেদেহিপুত্র অজাতশত্রুর সঙ্গে।” এরপর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দকে শ্রামণ্যফল সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। এইভাবে তিনি পাঁচটি নিকায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এই **প্রথম মহাসঙ্গীতি** পাঁচশো স্থবির কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে:

“পাঁচশো স্থবিরের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে,

পাঁচশো স্থবিরের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কারণে

এটিকে ‘স্থবিরদের দ্বারা কৃত’ বলা হয়।”

এই প্রথম মহাসঙ্গীতি চলাকালে সমগ্র দীর্ঘনিকায়, মধ্যমনিকায় ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, ক্রমান্বয়ে খুদ্দকনিকায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ “বন্ধু আনন্দ, মঙ্গল সূত্রটি কোথায় ভাষিত হয়েছে?” এভাবে ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন, আনন্দ স্থবিরও উত্তর দিলেন এবং শেষে মহাকাশ্যপ স্থবির “উৎপত্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, ব্যক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন” এভাবে প্রশ্ন করলে আনন্দ স্থবির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বলে, যেভাবে ভাষিত হয়েছে, যার দ্বারা শ্রুত হয়েছে, যখন শ্রুত হয়েছে, যার দ্বারা ভাষিত হয়েছে, যেখানে ভাষিত হয়েছে এবং যাকে উদ্দেশ্য করে ভাষিত হয়েছে, সবই বলার ইচ্ছায় “এভাবে ভাষিত হয়েছে, আমার দ্বারা শ্রুত হয়েছে, আমি একসময় শুনেছি, ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, শ্রাবস্তীতে ভাষিত হয়েছে, এক দেবতাকে উদ্দেশ্য করে ভাষিত হয়েছে” এভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরতেই আয়ুষ্মান আনন্দ বলেছেন, “আমি এরূপ শুনেছি। একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে।... সেই দেবতা ভগবানকে গাথাযোগে বলল।” এভাবেই এটি আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক বলা হয়েছে, তাও আবার প্রথম মহাসঙ্গীতির সময় বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে “কেন বলা হয়েছে?” এর উত্তরে বলা যায়, যেহেতু এই আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ স্থবির কর্তৃক উৎপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছেন, তাই তিনি এর উৎপত্তি হতে শুরু করে বিস্তারিত বলেছেন। অথবা যেহেতু আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিজ্ঞ স্থবিরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ধর্মাসনে বসে থাকতে দেখে একশ্রেণির দেবতাদের মনে হয়েছিল—“এই আয়ুষ্মান বেদেহমুনি স্বাভাবিকভাবেই শাক্যকুলের বংশপরম্পরা ভগবানের উত্তরাধিকারী, ভগবানও তাঁকে পাঁচবার অগ্রপদে বসিয়েছেন, তিনি চারটি আশ্চর্য-অদ্ভুত ধর্মের অধিকারী, চারি পরিষদের প্রিয় ও মনোজ্ঞ, এখন মনে হচ্ছে যেন ভগবানের ধর্মরাজ্যের উত্তরাধিকার পেয়ে বুদ্ধই জন্মগ্রহণ করেছেন।” তাই আয়ুষ্মান আনন্দ সেই দেবতাদের মনের কথা জেনে নিজের অবিদ্যমান গুণগুলোর কথা অস্বীকার করতে এবং নিজের শিষ্যভাবের কথা তুলে ধরতে বললেন, “আমি এরূপ শুনেছি।... সেই দেবতা ভগবানকে গাথাযোগে বলল।” এর মধ্যে পাঁচশো অর্হৎ ও বহু হাজার দেবতা “সাধু সাধু” বলে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিনন্দন জানালেন, এতে বিশাল ভূমিকম্প হলো, নানা ধরনের পুষ্প বর্ষণের আকারে আকাশ থেকে ঝরে পড়ল এবং আরো অন্য বহু আশ্চর্য দৃশ্য দৃশ্যমান হলো। এতে করে বহু দেবতার মনে সংবেগ উৎপন্ন হলো—“আহা, আমরা যা ভগবানের মুখ থেকে শুনেছি, এখন তা-ই অন্যের মুখ থেকে শুনতে পেলাম!” এভাবে এই সূত্রটি আয়ুষ্মান আনন্দ কর্তৃক প্রথম মহাসঙ্গীতি চলাকালে বলার সময় এই কারণেই বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এই পর্যন্ত “**যার দ্বারা, যখন, যেই কারণে বলা হয়েছে, এই বিধি অনুসারে এটি বলার পর**” এই অর্ধেক গাথার অর্থ প্রকাশ করা হলো।

## এরূপ ইত্যাদি পাঠের বর্ণনা

১. এখন “**এরূপ ইত্যাদি পাঠের অর্থ ও এর উৎপত্তি-কথা নানা প্রকারে বর্ণনা করার সময়**” এভাবে ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত বিবরণীর (অর্থাৎ মাতিকার) সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করার লক্ষ্যেই বলা হয়েছে: “**এরূপ**”এই শব্দটিকে (পালি ভাষায়) উপমা, উপদেশ, আনন্দ প্রকাশ, নিন্দা, সম্মতি জ্ঞাপন, আকার, দৃষ্টান্ত, নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অর্থে দেখা উচিত। যেমন: “ঠিক তদ্রূপ জন্মগ্রহণ করা মানুষের দ্বারাও বহু কুশলকর্ম করা উচিত” এভাবে ইত্যাদিতে (ধ.প.৫৩) উপমার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দেখা যায়। “এভাবে তোমাদের যাওয়া উচিত, এভাবে তোমাদের ফিরে আসা উচিত” ইত্যাদিতে (অ.নি.৪.১২২) উপদেশ প্রদানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। “ঠিক তাই ভগবান, ঠিক তাই সুগত” এভাবে ইত্যাদিতে (অ.নি.৩.৬৬) আনন্দ প্রকাশে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। “কিন্তু এই বৃষলী (অর্থাৎ হীনজাতির নারী) এভাবে এভাবে ছোটখাটো বিষয়েও সেই ন্যাড়া-মাথা শ্রমণের গুণকীর্তন করছে” এভাবে ইত্যাদিতে (সং.নি.১.১৮৭) নিন্দা প্রকাশে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। “‘হ্যাঁ ভন্তে’ বলে সেই ভিক্ষুরা ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিল” এভাবে ইত্যাদিতে (ম.নি.১.১) সম্মতি জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। “এভাবেই আমি, ভন্তে, ভগবান কর্তৃক দেশিত ধর্মকে জানি” এভাবে ইত্যাদিতে (ম.নি.১.৩৯৮) আকার বা লক্ষণ প্রকাশে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। “এসো, হে যুবক, তুমি শ্রমণ আনন্দের কাছে গমন করো, গিয়ে আমার কথায় শ্রমণ আনন্দকে তাঁর নিরোগতা, সুস্থতা, লঘুভাব, শক্তি ও সুখবিহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। ‘তোদেয়্যপুত্র যুবক শুভ মাননীয় আনন্দের কাছে তাঁর নিরোগতা, সুস্থতা, লঘুভাব, শক্তি ও সুখবিহার সম্পর্কে জানতে চাইছেন,’ এভাবে বলো, খুবই ভালো হয় যদি অনুকম্পা করে মাননীয় আনন্দ তোদেয়্যপুত্র যুবক শুভের বাড়িতে গমন করেন” এভাবে ইত্যাদিতে (দী.নি.১.৪৪৫) দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। “হে কালামগণ, তো তোমরা কী মনে করো, এই বিষয়গুলো কি কুশল নাকি অকুশল? অকুশল ভন্তে। সদোষ নাকি নির্দোষ? সদোষ ভন্তে। বিজ্ঞ-নিন্দিত নাকি বিজ্ঞ-প্রশংসিত? বিজ্ঞ-নিন্দিত ভন্তে। এগুলো গ্রহণ করলে তা তোমাদের অহিত ও দুঃখের দিকেই নিয়ে যাবে নাকি নয়? তোমাদের কী মনে হয়? ভন্তে, এগুলো গ্রহণ করলে তা আমাদের অহিত ও দুঃখের দিকেই নিয়ে যাবে, আমাদের এমনটিই মনে হয়।” এভাবে ইত্যাদিতে (অ.নি.৩.৬৬) নিশ্চিতকরণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু এখানে এটিকে আকার, দৃষ্টান্ত ও নিশ্চিতকরণ অর্থে দেখা উচিত।

এখানে আকার অর্থে ব্যবহৃত “**এরূপ**” শব্দটির দ্বারা এই অর্থই বুঝানো হয়েছে: নানান ব্যাখ্যা, নিপুণ ও অনেক ধরনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত, অর্থ ও ব্যঞ্জনসম্পন্ন, বিবিধ অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত, ধর্ম, অর্থ, দেশনা ও অনুধাবন গম্ভীরতাযুক্ত, সকল সত্ত্বদের নিজ নিজ ভাষা অনুযায়ী কর্ণগোচর হওয়া সেই ভগবানের বাণীকে সর্বপ্রকারে কে বুঝতে সমর্থ? কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শোনার ইচ্ছা উৎপন্ন করেও আমি এরূপ শুনেছি, তাও আমি এক প্রকারে শুনেছি।

দৃষ্টান্ত অর্থে “আমি কোনো স্বয়ম্ভূ নই, আমার দ্বারা এটি সাক্ষাৎকৃতও নয়” এভাবে নিজেকে বাঁচাতেই “আমি এরূপ শুনেছি, আমার দ্বারা এরূপ শ্রুত হয়েছে” বলেছেন। এখন এরপরের সকল সূত্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

নিশ্চিতকরণ অর্থে “হে ভিক্ষুগণ, আমার শিষ্য বহুশ্রুত বা শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুদের মধ্যে আনন্দই শ্রেষ্ঠ, হে ভিক্ষুগণ, আমার শিষ্য গতিমান, স্মৃতিমান, ধৃতিমান ও সেবক ভিক্ষুদের মধ্যেও আনন্দই শ্রেষ্ঠ” (অ.নি.১.২১৯-২২৩) এভাবে ভগবান যেভাবে প্রশংসা করেছেন ঠিক সে-রকম নিজের ধারণশক্তিকে তুলে ধরে সত্ত্বদের মনে শোনার ইচ্ছা জাগিয়ে দিলেন এই বলে—“আমি এরূপ শুনেছি, তাও অর্থ কিংবা ব্যঞ্জনের দিক থেকে কমও নয় আবার বেশিও নয় এমনভাবে, এটিকে অন্যভাবে দেখা উচিত নয়।”

“**আমি এরূপ শুনেছি**” এই তিনটি শব্দের মধ্যে **এরূপ** শব্দটি হচ্ছে কর্ণবিজ্ঞানের (অর্থাৎ কানভিত্তিক চিত্তের) কাজের দৃষ্টান্ত। **আমি** শব্দটি উক্ত বিজ্ঞান বা চিত্তের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত। **শুনেছি** শব্দটি না-শোনা ভাবকে প্রত্যাখ্যানের ভিত্তিতে কমও নয় আবার বেশিও নয় এমন অবিপরীতভাবে গ্রহণ করারই দৃষ্টান্ত। একইভাবে **এরূপ** শব্দটি শ্রবণ ইত্যাদি চিত্তগুলোর নানা প্রকারে আলম্বন বা বিষয়ে উৎপন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত। **আমি** শব্দটি নিজেরই দৃষ্টান্ত। **শুনেছি** শব্দটি ধর্মেরই দৃষ্টান্ত।

একইভাবে **এরূপ** শব্দটি নির্দেশযোগ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত। **আমি** শব্দটি ব্যক্তির দৃষ্টান্ত। **শুনেছি** শব্দটি ব্যক্তির কাজের দৃষ্টান্ত।

একইভাবে **এরূপ** শব্দটি বীথিচিত্তগুলোর আকার-পরিচয়ের ভিত্তিতে নানা প্রকার বর্ণনা। **আমি** শব্দটি কর্তারই বর্ণনা। **শুনেছি** শব্দটি বিষয়ের বর্ণনা।

একইভাবে **এরূপ** শব্দটি ব্যক্তির কাজের বর্ণনা। **আমি** শব্দটি বিজ্ঞান বা চিত্তের কাজের বর্ণনা। **শুনেছি** শব্দটি উভয় কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির বর্ণনা।

একইভাবে **এরূপ** শব্দটি ভাব বা অবস্থার বর্ণনা। **আমি** শব্দটি ব্যক্তির বর্ণনা। **শুনেছি** শব্দটি তার কাজের বর্ণনা।

এখানে **এরূপ** ও **আমি** শব্দ দুটি সত্যিকার পরমার্থের ভিত্তিতে অবিদ্যমান প্রজ্ঞপ্তি বা ধারণা। একইভাবে **এরূপ** ও **আমি** শব্দ দুটি সেই সেই উপলক্ষে বক্তব্যের ভিত্তিতে উপজাত প্রজ্ঞপ্তি বা ধারণা। **শুনেছি** শব্দটি দৃষ্টি ইত্যাদিকে তুলনা করে বলা বক্তব্যের ভিত্তিতে তুলনার প্রজ্ঞপ্তি বা ধারণা।

এখানে **এরূপ** শব্দটির দ্বারা অসম্মোহকে বুঝানো হয়েছে, **শুনেছি** শব্দটির দ্বারা শোনা বিষয়ে সন্দেহমুক্তিকে বুঝানো হয়েছে। একইভাবে **এরূপ** শব্দটির দ্বারা যথাযথ মনোযোগকে বুঝানো হয়েছে, অযথাযথ মনোযোগ ও নানা প্রকার অনুধাবনের অভাবের ভিত্তিতে। **শুনেছি** শব্দটির দ্বারা অবিক্ষেপ বা একাগ্রতাকে বুঝানো হয়েছে, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির শ্রবণের অভাবের ভিত্তিতে। একইভাবে কোনো কথা ভালো করে বলা হলেও বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি “আমি শুনতে পাইনি, আবার বলুন” বলে থাকে। এখানে যথাযথ মনোযোগের দ্বারা “নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা” ও “পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা” এই দুটি বিষয় সাধিত হয়, আর অবিক্ষেপ বা একাগ্রতার দ্বারা “সদ্ধর্ম শ্রবণ” ও “সৎপুরুষের সাহায্য” সাধিত হয়। **এরূপ** শব্দটির দ্বারা অত্যন্ত ভদ্রভাবে নিজের পেছনের দুটি চাকার সম্পত্তিকে বুঝানো হয়েছে, আর **শুনেছি** শব্দটির দ্বারা শ্রবণে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে সামনের দুটি চাকার সম্পত্তিকে বুঝানো হয়েছে। একইভাবে ইচ্ছাশুদ্ধি ও প্রয়োগশুদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে, সেই ইচ্ছাশুদ্ধির দ্বারা অধিগম বা অর্জনের দক্ষতাকে এবং প্রয়োগশুদ্ধির দ্বারা আগম বা শাস্ত্র সম্বন্ধে দক্ষতাকে বুঝানো হয়েছে।

**এরূপ** এই নানা প্রকার অনুধাবন প্রকাশক শব্দটির দ্বারা নিজের অর্থ ও প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। **শুনেছি** এই শ্রবণীয়-ভেদে অনুধাবন প্রকাশক শব্দটির দ্বারা ধর্ম ও নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা-সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। **এরূপ** এই যথাযথ মনোযোগ নির্দেশক শব্দটি বলার সময় “আমার দ্বারা এই বিষয়গুলো মনে মনে বারংবার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, প্রজ্ঞা দিয়ে ভালোমতো প্রত্যক্ষ করা হয়েছে” বুঝানো হয়েছে। **শুনেছি** এই শ্রবণের যোগ নির্দেশক শব্দটি বলার সময় “আমার দ্বারা বহু বিষয় শ্রুত হয়েছে, ধারণ করা হয়েছে এবং মৌখিকভাবে আবৃত্তি করা হয়েছে” বুঝানো হয়েছে। এই উভয় শব্দের দ্বারা অর্থ ও ব্যঞ্জনের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরে শ্রবণে শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে দেওয়া হয়।

“**আমি এরূপ শুনেছি**”এই পুরো বাক্যটির দ্বারা আয়ুষ্মান আনন্দ তথাগত কর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে নিজের বলে গ্রহণ না করে অসৎপুরুষ-ভূমিকে অতিক্রম করেন এবং শ্রাবকত্বকে স্বীকার করে নিয়ে সৎপুরুষ-ভূমিতে প্রবেশ করেন। একইভাবে তিনি অসদ্ধর্ম হতে চিত্তকে তুলে আনেন এবং চিত্তকে সদ্ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেন। “আমি কেবল এরূপ শুনেছি, এগুলো সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধেরই বাক্য” এটি তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি আত্মরক্ষা করেন, শাস্তাকে উদ্ধৃত করেন, বুদ্ধবাক্য সমর্পণ করেন এবং ধর্মনেতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তা ছাড়া “আমি এরূপ শুনেছি” বলে তিনি নিজের দ্বারা উৎপাদিত এই কথাটি অস্বীকার করার মাধ্যমে এবং পূর্বে শুনেছেন এই কথাটি খুলে বলার মাধ্যমে “আমি এটি নিজে সেই ভগবানের মুখ থেকে শুনেই গ্রহণ করেছি, যিনি চার প্রকার আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী, দশবলধারী, বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, সিংহনাদকারী, সকল সত্ত্বদের মধ্যে উত্তম, ধর্মেশ্বর, ধর্মরাজ, ধর্মাধিপতি, ধর্মদ্বীপ, ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী, শ্রেষ্ঠ সদ্ধর্মচক্র প্রবর্তনকারী ও সম্যকসম্বুদ্ধ। তাই এর অর্থে কিংবা ধর্মে, পদে কিংবা ব্যঞ্জনে কোনো ধরনের সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করা উচিত নয়” বলে এই ধর্মের প্রতি সকল দেবমনুষ্যদের অশ্রদ্ধাভাব ধ্বংস করে দেন এবং শ্রদ্ধাসম্পদ উৎপন্ন করে দেন বলে বুঝতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে:

“তিনি অশ্রদ্ধাভাবকে দূর করে দেন,

শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেন,

‘আমি এরূপ শুনেছি’ এভাবেই

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য বলেছেন।”

**এক** হচ্ছে গণনার সীমা নির্দেশক শব্দ। **সময়** হচ্ছে সীমিত সময় নির্দেশক শব্দ। কিন্তু **একসময়** বলে বস্তুত অনির্দিষ্ট সময়কেই তুলে ধরা হয়েছে। এখানে **সময়** শব্দটি—

“সমবায়ে, ক্ষণে, কালে, সমূহে, হেতুতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে,

লাভে, পরিত্যাগে ও অনুধাবনে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।”

যেমন, **সময়** শব্দটি “আমি বরং কাল ও সময় বুঝে আগামীকাল যেতে পারি” এভাবে ইত্যাদিতে (দী.নি.১.৪৪৭) সমবায় বা সমষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “হে ভিক্ষুগণ, ব্রহ্মচর্য পালনের একটিই মাত্র ক্ষণ ও সময়” এভাবে ইত্যাদিতে (অ.নি.৮.২৯) ক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “গরমের সময়, দাবদাহের সময়” এভাবে ইত্যাদিতে (পাচি.৩৫৮) কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “এই বনভূমিতে বহু সত্ত্ব সমবেত হয়েছেন” এভাবে ইত্যাদিতে (দী.নি.২.৩৩২; সং.নি.১.৩৭) সমূহ বা গণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “হে ভদ্দালি, তুমি বোধহয় এর কারণ বুঝতে পারোনি, ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করছেন, তিনিও আমায় জানবেন যে, ‘ভদ্দালি নামে এক ভিক্ষু শাস্তাশাসনে শিক্ষা পরিপূরণকারী নয়,’ হে ভদ্দালি, তখন তুমি এর কারণও বুঝতে পারোনি” এভাবে ইত্যাদিতে (ম.নি.২.১৩৫) হেতু বা কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “সেই সময় শ্রমণমুণ্ডিকাপুত্র উগ্গাহমান পরিব্রাজক মতবাদ-প্রকাশক, গাবগাছের বাকলবিশিষ্ট, একশালাবিশিষ্ট মল্লিকার উদ্যানে বাস করছিল” এভাবে ইত্যাদিতে (ম.নি.২.২৬০) দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

“যা ইহকালে কল্যাণ এবং যা পরকালেও কল্যাণ,

কল্যাণ লাভ করায় ধীর ব্যক্তিকে ‘পণ্ডিত’ বলা হয়।”

(সং.নি.১.১২৯)

এভাবে ইত্যাদিতে লাভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “মানকে সম্যকরূপে পরিত্যাগ করেই তিনি দুঃখের অন্তসাধন করেন” এভাবে ইত্যাদিতে (ম.নি.১.২৮) পরিত্যাগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। “দুঃখের পীড়ন অর্থ, সৃষ্ট অর্থ, সন্তাপ অর্থ, বিপরিণাম অর্থ, অনুধাবন অর্থ” এভাবে ইত্যাদিতে (পটি.ম.২.১১) অনুধাবন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে এটি কাল বা সময় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই **একসময়** বলতে বছর, ঋতু, মাস, অর্ধমাস, রাত, দিন, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, প্রথম প্রহর, মধ্যপ্রহর, শেষ প্রহর, মুহূর্ত ইত্যাদি কাল হিসেবে গণ্য সময়ের মধ্যে “একসময়” বুঝানো হয়েছে।

অথবা, গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠের সময়, জন্মের সময়, সংবেগের সময়, গৃহত্যাগের সময়, দুষ্কর চর্যার সময়, মারবিজয়ের সময়, অভিসম্বোধির সময়, এই জীবনে সুখে অবস্থানের সময়, দেশনার সময়, পরিনির্বাণের সময়, এভাবে ইত্যাদি প্রকারে দেবমনুষ্যদের মধ্যে ভগবানের এই যে প্রকাশ, কাল হিসেবে গণ্য হওয়া সময়। সেই সমস্ত সময়ের মধ্যে দেশনার সময় নামক “একসময়”-এর কথাই বলা হয়েছে। জ্ঞান ও করুণার কাজের সময়ের মধ্যে যা করুণার কাজের সময়, আত্মহিত ও পরহিতমূলক আচরণের সময়ের মধ্যে যা পরহিতমূলক আচরণের সময়, সমবেত হলে দুটি করণীয় সময়ের মধ্যে যা ধর্মকথার সময়, দেশনা ও আচরণের সময়ের মধ্যে যা দেশনার সময়, সেই সমস্ত সময়ের মধ্যে যেকোনো সময়কে লক্ষ্য করেই “একসময়” বলা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু কেন অভিধর্মে যেভাবে “যেই সময়ে কামাবচর”, এবং অন্যান্য সূত্রে “যেই সময়ে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু কাম হতে পৃথক হয়ে” বলে অধিকরণ-কারকের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, আর বিনয়ে যেভাবে “সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান” বলে তৃতীয় বিভক্তি বা করণ-কারকের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে সেভাবে না করে “একসময়” বলে দ্বিতীয়া বিভক্তি বা কর্মকারকের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে? সেখানে যেই অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে ঠিক সেই অর্থে বর্ণনা করা হয়নি বলে। এটি অভিধর্মে ও অন্যান্য সূত্রে সপ্তমী বিভক্তি বা অধিকরণ-কারক অর্থে এবং ভাবের দ্বারা ভাব-লক্ষণ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর বিনয়ে এটি হেতু ও কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করার যে-সমস্ত সময় এমনকি সারিপুত্র ইত্যাদির স্থবিরদের দ্বারাও দুর্জ্ঞেয় ছিল, ঠিক সেই সময়ে হেতু ও কারণ দেখা দিলে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করতে গিয়ে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করার হেতু ও কারণ দেখে নিয়ে ভগবান বিভিন্ন স্থানে বাস করেছেন, তাই সেই অর্থকে তুলে ধরতেই বিনয়ে এটি তৃতীয়া বিভক্তি বা করণ-কারকের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এখানে এই ধরনের অন্যান্য সূত্রে পরম সংযোগ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যেই সময়ে ভগবান এই সূত্র কিংবা অন্য কোনো সূত্র দেশনা করেছেন এটিই পরম ভেবে সেই সময়ে করুণার সঙ্গে বসবাস করেছেন। তাই সেই অর্থকে তুলে ধরতেই এখানে এটি দ্বিতীয়া বিভক্তি বা কর্মকারকের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে বলে জানা উচিত। এখানে বলা হয়েছে:

“সেই সেই অর্থকে দেখে অধিকরণ ও করণের দ্বারা অন্যত্র,

আর এখানে কর্ম-কারকের দ্বারা সময়ের কথা বলা হয়েছে।”

**ভগবান** হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণধর ও উত্তম সত্ত্বকে সম্মান ও গৌরবেরই নামান্তর। যেমন বলা হয়েছে:

“ভগবান শব্দটি শ্রেষ্ঠ, ভগবান শব্দটি উত্তম,

এটি সম্মান ও গৌরবযুক্ত, তাই ভগবান বলা হয়।”

নাম চার ধরনের হয়, যেমন: অবস্থাভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক, অর্জনভিত্তিক ও অকারণে উৎপন্ন। অকারণে উৎপন্ন বলতে “মন যা চায় তা-ই বা ইচ্ছামতো” বলা হয়েছে। এখানে বাছুর, বয়স্ক বাছুর, বলদ ইত্যাদি হচ্ছে **অবস্থাভিত্তিক নাম**। দণ্ডধারী, ছাতাধারী, শিখী বা ময়ূর, শুঁড়ধারী বা হাতি ইত্যাদি হচ্ছে **লিঙ্গভিত্তিক** বা **চিহ্নভিত্তিক** **নাম**। ত্রিবিদ্যাধর, ষড়ভিজ্ঞ ইত্যাদি হচ্ছে **অর্জনভিত্তিক** **নাম**। আর সৌভাগ্যবর্ধক, ধনবর্ধক ইত্যাদি শব্দার্থের দিকে না তাকিয়ে যেই নাম এমনিতেই বসিয়ে দেওয়া হয় তা-ই হচ্ছে **অকারণে উৎপন্ন নাম**। কিন্তু এই ভগবান নামটি হচ্ছে গুণ অর্জনভিত্তিক, সেটি মহামায়ার দেওয়া নাম নয়, মহারাজ শুদ্ধোদনের দেওয়া নাম নয়, আশি হাজার জ্ঞাতিদের দেওয়া নাম নয়, অথবা সক্ক, সন্তোষিত প্রভৃতি বিশেষ কোনো দেবপুত্রের দেওয়া নাম নয়। আয়ুষ্মান সারিপুত্র স্থবির যেমনটি বলেছেন, “এই ভগবান নামটি মায়ের দেওয়া নয়,... ভগবান হচ্ছে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ ও উপলব্ধির প্রকাশ।” (মহানি.৮৪)

যেসব গুণ অর্জনের কারণে এই নাম, সেসব গুণ প্রকাশের জন্য এই গাথাটি বলা হয়েছে:

“অধিকারী, বিভাজনকারী, ভাগী, বিভক্তকারী,

ভেঙে ফেলেছেন বলে তিনি সম্মাননীয় ও ভাগ্যবান।

বহু উপায়ে তিনি নিজেকে সুভাবিত করেছেন,

তিনি ভবের অন্তে চলে গেছেন বিধায় **ভগবান** বলা হয়।”

‘নির্দেশ’ ইত্যাদি গ্রন্থে (মহানি.৮৪; চূল়নি. অজিতমাণৰপুচ্ছানিদ্দেস ২) বর্ণিত নিয়মেই এর অর্থকে দেখা উচিত।

কিন্তু এটিকে আরেকভাবে বলা যায়—

“ভাগ্যবান, যোগ্য ভগ্নকারী, ভাগ্যযুক্ত, বিভক্তকারী,

অভ্যস্ত, ভবগুলোতে গমন পরিত্যক্ত, তিনিই ভগবান।”

এখানে “বর্ণাগম হওয়া, বর্ণ লোপ পাওয়া” এভাবে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে, অথবা শব্দের অর্থ অনুসারে ছোপ ছোপ দাগওয়ালা পেট ইত্যাদি প্রক্ষেপের বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে, যেহেতু তাঁর লৌকিক ও লোকোত্তর সুখদায়ী দান, শীল ইত্যাদি পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভাগ্য আছে, তাই তাঁকে ভাগ্যবান বলা উচিত হলেও **ভগবান** বলা হয় বলে জানতে হবে।

কিন্ত যেহেতু তিনি লোভ, বিদ্বেষ, মোহ, বিপরীত মনোযোগ, পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা, ক্রোধ ও শত্রুতা, অন্যকে নিচে নামানো ও আক্রোশ, ঈর্ষা ও কৃপণতা, মায়া ও শঠতা, একগুঁয়েমি ও হঠকারিতা, মান ও অহংকার, মত্ততা ও প্রমত্ততা, তৃষ্ণা ও অবিদ্যা; তিন প্রকার অকুশল মূল, তিন প্রকার দুশ্চরিত্রতা, এভাবে তিন প্রকার করে কলুষতা, মল, বিষম সংজ্ঞা, বিতর্ক ও প্রপঞ্চ, প্লাবন, সংযোগ, অগতি, তৃষ্ণা, আঁকড়ে ধরা (*উপাদান*), পাঁচ প্রকার চিত্তের খিল, বন্ধন, আবরণ, অভিনন্দন; ছয় প্রকার বিবাদের মূল, ছয় প্রকার তৃষ্ণাপুঞ্জ, সপ্ত অনুশয় (সুপ্ত প্রবণতা) আট প্রকার মিথ্যাত্ব, নয় প্রকার তৃষ্ণামূল, দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ, বাষট্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি, একশো আট প্রকার তৃষ্ণা, এভাবে সব মিলিয়ে শত হাজার কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও ক্লেশকে, অথবা সংক্ষেপে পঞ্চমার অর্থাৎ ক্লেশমার, স্কন্ধমার, অভিসংস্কারমার, দেবপুত্রমার ও মৃত্যুমারকে ভেঙে ফেলেছেন। তাই এই সমস্ত বিপদগুলোকে ভগ্ন করার মাধ্যমে তাঁকে ভগ্নকারী (*ভগ্গৰা*) বলা উচিত হলেও **ভগবান** বলা হয়। এখানে আরো বলা হয়েছে:

“ভগ্ন-লোভ, ভগ্ন-বিদ্বেষ, ভগ্ন-মোহ, অনাসব,

ভগ্ন তাঁর পাপধর্মগুলো, তাই তাঁকে ভগবান বলা হয়।”

ভাগ্যবান হওয়ার নিদর্শন হিসেবে তাঁর শত পুণ্যলক্ষণধারী রূপকায়-সম্পত্তিকে দেখানো হয়। ভগ্ন-বিদ্বেষ হওয়ার নিদর্শন হিসেবে তাঁর ধর্মকায়-সম্পত্তিকে দেখানো হয়। একইভাবে তাঁর লৌকিকভাবে খুব সম্মানিতভাব, গৃহী ও প্রব্রজিতদের তাঁর ওপর নির্ভরতা, তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের দৈহিক ও মানসিক দুঃখ অপনোদন করে দিতে তাঁর সামর্থ্য, আমিষদান এবং ধর্মদানের উপকারিতা, লৌকিক ও লোকোত্তরসুখে সংযুক্ত করে দিতে তাঁর সামর্থ্যকেও দেখানো হয়।

আবার, যেহেতু জগতে আধিপত্য, ধর্ম, যশ, শোভা, কাম্য বিষয় (কাম), প্রযত্ন এই ছয়টি বিষয়ে ভাগ্য শব্দটি প্রচলিত। নিজ চিত্তের ওপরে তাঁর আছে পরম আধিপত্য, অথবা সূক্ষ্মতা (নিজের দেহকে একদম ক্ষুদ্র করা), লঘুতা (নিজেকে হালকা করে আকাশে গমন) ইত্যাদি লৌকিক হিসেবে বিবেচিত ক্ষমতাতে সকল দিক দিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ আধিপত্য। তেমনই হচ্ছে লোকোত্তর ধর্মে। আর তাঁর আছে ত্রিলোক জুড়ে পরিব্যাপ্ত, যথাযথ সত্যগুণের দ্বারা অধিগত, অত্যন্ত পরিশুদ্ধ যশ। তাঁর রূপকায় দর্শনে উৎসুক জনতার চোখকে পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা। তাঁর যা যা ঈপ্সিত, প্রার্থিত, নিজের বা অপরের কল্যাণের জন্য, তা সেভাবেই সিদ্ধ হয়, সফল হয়। এভাবে ঈপ্সিত বিষয় উৎপাদনই হচ্ছে তাঁর কাম্য বিষয়। তাঁর সারা জগতে সম্মানিতভাব প্রাপ্তির কারণ হিসেবে সম্যক প্রচেষ্টা নামে পরিচিত প্রযত্নও আছে। এভাবে এসব দিক দিয়ে ভাগ্য দ্বারা সংযুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর ভাগ্য (ভগ) আছে এই অর্থে **ভগবান** বলা হয়।

কিন্তু, যেহেতু তিনি কুশল ইত্যাদি ভেদে সকল বিষয়কে; অথবা স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয়, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ইত্যাদি কুশল বিষয়গুলোকে; অথবা পীড়ন, আবির্ভাব, সন্তাপ ও পরিবর্তনশীলতা অর্থে দুঃখ আর্যসত্য; পুঞ্জীভূত হওয়া, উৎস, সংযোগ ও বাধা বা উপদ্রব অর্থে সমুদয় বা উৎপত্তি; নিঃসরণ, পৃথক হওয়া, অসৃষ্ট ও অমৃত্যু অর্থে নিরোধ; মুক্তিদায়ী, হেতু, দর্শন ও আধিপত্য অর্থে মার্গ বা পথে বিভক্তকারী, অর্থাৎ তিনি এগুলোকে বিভক্ত করেছেন, উন্মোচন করেছেন, দেখিয়ে দিয়েছেন বলে বলা হয়, সে-কারণে তাঁকে বিভক্তকারী (ৰি*ভত্তৰা*) বলা উচিত হলেও **ভগবান** বলা হয়।

আবার, যেহেতু তিনি দিব্যবিহার (*দিব্বৰিহার*), ব্রহ্মবিহার (*ব্রহ্মৰিহার*), আর্যবিহার (*অরিযৰিহার*), কায়বিবেক (দৈহিক নিঃসঙ্গতা), চিত্তবিবেক (ধ্যান বা সমাধি) ও উপধিবিবেক (নির্বাণ), শূন্যতা বিমোক্ষ, অনাকাঙ্ক্ষা (*অপ্পণিহিত*) বিমোক্ষ, অনিমিত্ত (*অনিমিত্ত*) বিমোক্ষ এবং অন্যান্য লৌকিক ও লোকোত্তর উচ্চতর মানসিক ধর্মগুলো (*উত্তরিমনুস্সধম্ম*) ভজনা করেছেন, সেবন করেছেন, বারবার অভ্যাস করেছেন, সে-কারণে অভ্যস্ত (*ভত্তৰা*) বলা উচিত হলেও **ভগবান** বলা হয়।

আবার, যেহেতু এই ত্রিভবে তৃষ্ণা নামে খ্যাত “গমন” তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত (*ৰন্ত*) হয়েছে, সে-কারণে তাঁকে “ভবগুলোতে গমন পরিত্যক্ত (*ভৰেসু ৰন্তগমনো*)” বলা উচিত। তবে জগতে যেমন “গোপনাঙ্গের (*মেহনস্স*) স্থানের (*খস্স*) মালা (*মালা*)” বলা উচিত হলেও সেটাকে কোমরবন্ধনী (*মেখলা*) বলা হয়, ঠিক সেভাবে এখানে “ভবগুলোতে গমন পরিত্যক্ত (*ভৰেসু ৰন্তগমনো*)” বলা উচিত হলেও ভৰ শব্দটি থেকে ভ এবং গমন শব্দটি থেকে গ নিয়ে, ৰন্ত শব্দটি থেকে ৰ দীর্ঘ আকারে গ্রহণ করে **ভগৰা** (ভগবান) বলা হয়।

এখানে এতক্ষণ পর্যন্ত “**আমি এরূপ শুনেছি**” এই বাক্যের দ্বারা যেভাবে ধর্ম শ্রুত হয়েছে এবং যেভাবে ধর্ম শিক্ষা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে দেশনা করার সময় প্রত্যক্ষ করেই ভগবানের ধর্মকায়কে প্রকাশ করা হয়েছে, তাই “শাস্তার এই শাসন অতীত হয়ে গেছে তা নয়, এটিই তোমাদের শাস্তা” এই বলে যারা ভগবানকে দেখতে না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তাদের প্রবোধ দেওয়া হয়।

**একসময় ভগবান** এই বাক্যের দ্বারা সেই সময়ে ভগবানের অবিদ্যমান-ভাবকে তুলে ধরতে রূপকায়ের পরিনির্বাণকেই তুলে ধরা হয়েছে। তাই “এই ধরনের আর্যধর্মের দেশনাকারী দশবলধারী বজ্রসংঘাতকায়ধারী সেই ভগবানও পরিনির্বাপিত হয়েছেন, তখন কেনই-বা অন্য কেউ বেঁচে থাকার আশা পোষণ করবে!” এই বলে জীবনমদে মত্ত থাকা ব্যক্তির মনে সংবেগ জাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সদ্ধর্মের প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়া হয়।

**এরূপ** শব্দটি বলার সময় দেশনাসম্পত্তিকে নির্দেশ করা হয়, **আমি শুনেছি** শব্দদুটি বলার সময় শ্রাবকসম্পত্তিকে, **একসময়** শব্দটি বলার সময় কালসম্পত্তিকে এবং **ভগবান** শব্দটি বলার সময় দেশকসম্পত্তিকে নির্দেশ করা হয়।

**শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন** এখানে **শ্রাবস্তী** মানে হচ্ছে সৰত্থ নামে এক ঋষির নিবাসস্থানভুক্ত নগর, যেমন কাকন্দী, মাকন্দী, একইভাবে স্ত্রীলিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রাবস্তী বলা হয়, এটি হচ্ছে শব্দচিন্তাবিদদের মত। তবে অর্থকথাচার্যদের মত হচ্ছে, “মানুষদের যা কিছু উপভোগ্য-পরিভোগ্য সবই এখানে আছে” এই অর্থে শ্রাবস্তী (*সাৰত্থী*)। সেই স্থানে মালগাড়ি এসে পড়লে “কী পণ্যদ্রব্য আছে?” জিজ্ঞেস করলে তারা “সবই আছে” (*সব্বমত্থি*) বলত, তাই সেই কথার ভিত্তিতেই “শ্রাবস্তী”।

“সর্বদা সর্ব উপকরণ শ্রাবস্তীতে জড়ো করা হয়,

তাই সবই আছে বিধায় শ্রাবস্তী বলা হয়।”

“কোশলদের রম্য পুরী দর্শনীয় ও মনোরম,

দশ প্রকার শব্দ সদা বিদ্যমান, অন্ন-পানীয় সমৃদ্ধ।”

“এই শ্রাবস্তী পুরী বর্ধিত ও বিপুলতাপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ, স্ফীত

ও মনোরম এবং দেবতাদের আলকমন্দার মতো উত্তম।”

(ম.নি.অট্ঠ.১.১৪)

সেই **শ্রাবস্তীতে**। এটি কাছাকাছি অর্থে অধিকরণ-কারকের শব্দ।

**বাস করছিলেন** এটি সাধারণভাবে দৈহিক ভঙ্গিমা, দিব্য, ব্রহ্ম ও আর্যবিহারের মধ্যে যেকোনো এক বিহার বা বাস সমন্বিত হয়ে বাস করাকেই তুলে ধরে। কিন্তু এখানে এটি দাঁড়ানো, গমন, বসা, শোয়া-ভেদে ইত্যাদি দৈহিক ভঙ্গিমার মধ্যে যেকোনো এক দৈহিক ভঙ্গিমার সংযোগকেই তুলে ধরে। তাই দাঁড়িয়ে থাকলে কিংবা গমন করলেও, বসে থাকলে কিংবা শুয়ে থাকলেও ভগবান বাস করছিলেন বলে বুঝতে হবে। তিনি একটি দৈহিক ভঙ্গিমাকে ধরে, অন্য কোনো দৈহিক ভঙ্গিমাকে ছিন্ন করে, কোথাও পড়ে না গিয়ে দেহটিকে নিয়ে যান, অগ্রসর করান। তাই **বাস করছিলেন** বলা হয়েছে।

**জেতবনে** মানে এখানে নিজের বিপক্ষ জনকে জয় করে বলে জেত, অথবা রাজা কর্তৃক নিজের বিপক্ষ জনকে জয় করে জাত হয়েছে বলে জেত, অথবা মঙ্গলের আশায় তার এমন নাম রাখা হয়েছে বলে জেত। বনায়ন করা হয় বলে বন, অর্থাৎ আত্মসম্পদের দ্বারা সত্ত্বদের ভক্তি করে, বা নিজের মধ্যে স্নেহ উৎপন্ন করে দেয়, এই হচ্ছে এর অর্থ। অথবা এরূপে অনুরোধ করে থাকে বলে বন, নানাবিধ ফুল, সুগন্ধ, সুবাসিত, মত্ত, কোকিল ইত্যাদি পাখিদের কলকাকলির দ্বারা, এবং মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় দুলে ওঠা গাছগাছালি, ঝোপঝাড়, ফুল-ফল-পাতার দ্বারা “এসো, আমায় পরিভোগ করো” বলে প্রাণীদের আর্জি জানানোর মতো, এই হচ্ছে এর অর্থ। জেতের বনই হচ্ছে জেতবন। সেটি জেত নামে এক রাজকুমারের দ্বারা রোপিত, বর্ধিত ও প্রতিপালিত, সে-ই ছিল তার মালিক, তাই **জেতবন** বলা হয়। সেই **জেতবনে**।

**অনাথপিণ্ডিকের বিহারে** মানে এখানে মাতাপিতার রেখে দেওয়া নাম অনুসারে সুদত্ত নামে সেই গৃহপতি, সর্ব মনস্কামপূর্ণ হয়ে, কৃপণতা-মলহীন হয়ে, করুণা ইত্যাদি গুণ সমন্বিত হয়ে প্রতিদিন অনাথদের পিণ্ড দান করতেন, তাই তাঁকে **অনাথপিণ্ডিক** নামে ডাকা হতো। এখানে প্রাণীরা, বিশেষ করে প্রব্রজিতরা মনের সুখে বাস করেন বলে বিহার (*আরামো*), এটির ফুল-ফল-পাতা ইত্যাদির সৌন্দর্যের কারণে এবং এটি অতি দূরেও নয়, অতি কাছেও নয়, ইত্যাদি পাঁচ প্রকার বাসস্থানের অঙ্গসম্পত্তির কারণে বিভিন্ন জায়গা হতে এসে এখানে রমিত হন, আনন্দিত হন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাহীন হয়ে বাস করেন, এই হচ্ছে এর অর্থ। অথবা উক্ত প্রকার সম্পত্তির দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেলেও এটি নিজের অভ্যন্তরে এসে রমিত করায় বলে বিহার বা আরাম। এটিকে অনাথপিণ্ডিক গৃহপতি রাজকুমার জেতের কাছ থেকে আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কিনে নিয়ে, আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করিয়ে এবং আরো আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিহার দানের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করে, এভাবে মোট চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন, তাই “অনাথপিণ্ডিকের বিহার” বলা হয়। সেই **অনাথপিণ্ডিকের বিহারে**।

এখানে “জেতবন” শব্দটি পূর্বেকার মালিককে ঘোষণা করে, “অনাথপিণ্ডিকের বিহারে” শব্দবন্ধটি পরবর্তী মালিককে ঘোষণা করে। এগুলোকে ঘোষণা করার কোনো প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে বলা যায়, আলোচনার ভিত্তিতে “কোথায় ভাষিত হয়েছে?” এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য পুণ্যকামীদের তাদের মতো পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করা। এখানে দ্বারপ্রকোষ্ঠ ও প্রাসাদ নির্মাণে জমি বিক্রি হতে প্রাপ্ত আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং অনেক কোটি মুদ্রার মূল্যমানের গাছগুলো হচ্ছে জেত রাজকুমারের দান, আর চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণমুদ্র হচ্ছে অনাথপিণ্ডিকের দান। তাদের নাম ঘোষণার মাধ্যমে “এভাবেই পুণ্যকামীরা পুণ্য করেন” এটি তুলে ধরে আয়ুষ্মান আনন্দ অন্যান্য পুণ্যকামীদের তাদের মতোই পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করান। এভাবে এখানে পুণ্যকামীদের তাদের মতো পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করাটাই হচ্ছে প্রয়োজন বলে বুঝতে হবে।

এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, “তখন যদি ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করে থাকেন তা হলে ‘জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে’ বলা উচিত নয়, আর তিনি যদি তখন সেখানেই বাস করে থাকেন তা হলে ‘শ্রাবস্তীতে’ বলা উচিত নয়। কারণ একই সময়ে দুটি জায়গায় বাস করা সম্ভব নয়।” উত্তরে বলা যায়, “কাছাকাছি অর্থে অধিকরণ-কারকের শব্দ” এমন একটি কথা কি বলা হয়নি? যেমন গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদির কাছাকাছি কোনো জায়গায় গরুর পাল চরে বেড়ালে তখন “গঙ্গায় চরে বেড়াচ্ছে, যমুনায় চরে বেড়াচ্ছে” বলা হয়, ঠিক তেমনি এখানেও শ্রাবস্তীর কাছেই অনাথপিণ্ডিকের জেতবন বিহারটি, সেখানে বাস করছেন বিধায় “শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের বিহারে” বলে বুঝতে হবে। বিচরণগ্রাম ইত্যাদির দৃষ্টান্ত অর্থে শ্রাবস্তী শব্দটি, আর প্রব্রজিতের অনুকূল বাসস্থানের দৃষ্টান্ত অর্থে বাকি শব্দগুলো।

এখানে শ্রাবস্তী নামটি ঘোষণার দ্বারা ভগবানের গৃহীদের প্রতি অনুগ্রহ করাটাকে তুলে ধরা হয়েছে, জেতবন ইত্যাদি শব্দগুলো ঘোষণার দ্বারা প্রব্রজিতদের প্রতি অনুগ্রহ করাটাকে তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে আগের শব্দটির দ্বারা কারণকে গ্রহণের ভিত্তিতে কৃচ্ছ্রসাধনকে বর্জন এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা বস্তুকামকে পরিত্যাগের ভিত্তিতে কামসুখে মগ্ন হয়ে থাকাকে বর্জনের উপায় তুলে ধরা হয়েছে। আগের শব্দটির দ্বারা ধর্মদেশনায় নিয়োজিত করাকে এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা বিবেক বা নিঃসঙ্গতার ইচ্ছাকে তুলে ধরা হয়েছে। আগের শব্দটির দ্বারা করুণা পোষণ করাকে এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা প্রজ্ঞা হতে ছিটকে না পড়াকে তুলে ধরা হয়েছে। আগের শব্দটির দ্বারা সত্ত্বদের হিতসুখ সাধনের ইচ্ছাকে এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা পরের হিতসুখ সাধনে উৎসাহকে তুলে ধরা হয়েছে। আগের শব্দটির দ্বারা ধার্মিক সুখকে পরিত্যাগ না করার ফলে সুখে অবস্থান করাকে এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা সাধারণ মানুষের অতীত উচ্চতর বিষয়গুলোতে আত্মনিয়োগ করার ফলে সুখে অবস্থান করাকে তুলে ধরা হয়েছে। আগের শব্দটির দ্বারা মানুষদের ব্যাপকভাবে উপকার করাকে এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা দেবতাদের ব্যাপকভাবে উপকার করাকে তুলে ধরা হয়েছে। আগের শব্দটির দ্বারা জগতে জন্ম নেওয়া ব্যক্তির জগতে সুসংবদ্ধভাবকে এবং পরের শব্দগুলোর দ্বারা লোকজনের সঙ্গে নির্লিপ্ত থাকাকে তুলে ধরা হয়েছে, এভাবে ইত্যাদি।

এখানে **জনৈক** শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে বলা হয়েছে। তার নাম-গোত্র সম্পর্কে কিছুই সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না, তাই “জনৈক” বলা হয়েছে। দেব অর্থেই দেবতা, এটি স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এখানে দেবতা শব্দটি পুরুষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ সেই দেবপুত্র, অথবা একেবারে সাধারণ নাম হিসেবেই “দেবতা” বলা হয়েছে।

**আলোকিত করে** মানে আভা ছড়িয়ে, অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের মতো পুরোটা আলোকিত করে, উজ্জ্বল করে, এই হচ্ছে এর অর্থ।

**ভগবান যেখানে আছেন সেখানে উপস্থিত হলো** এই কথাটিকে, যে-কারণে ভগবানের কাছে দেবতা ও মানুষদের উপস্থিত হওয়া উচিত, সেই কারণে উপস্থিত হলো, এই অর্থেও দেখা যেতে পারে। কী কারণে ভগবানের কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত? নানা প্রকার গুণ ও বিশেষ কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে, সুস্বাদু ফল খাওয়ার জন্য নিত্য ফলবান বিশাল গাছের কাছে পাখিদের যাওয়ার মতো। **উপস্থিত হলো** মানে গমন করল বলা হয়েছে। **উপস্থিত হয়ে** মানে এভাবে যাওয়ার পর ভগবানের কাছাকাছি কোনো স্থানে গিয়ে বলা হয়েছে। **ভগবানকে অভিবাদন করে** মানে হচ্ছে ভগবানকে বন্দনা করে, প্রণাম করে, নমস্কার করে।

**একপাশে** মানে একান্তে বা একস্থানে বলা হয়েছে। **দাঁড়াল** এই কথার মাধ্যমে বসা ইত্যাদিকে প্রত্যাখ্যান করা হলো, অর্থাৎ জায়গা করে নিল, দাঁড়িয়ে পড়ল, এই হচ্ছে এর অর্থ।

কিন্তু ঠিক কীভাবে দাঁড়ানোয় ‘একপাশে দাঁড়াল’ বলা হয়েছে?

“পেছনে কিংবা সামনে নয়, দূরে কিংবা কাছেও নয়,

পাশে কিংবা বায়ুর প্রতিকূলে নয়, উঁচু কিংবা নিচু স্থানেও নয়,

এই ছয়টি দোষ বর্জন করে ‘একপাশে দাঁড়াল’ বলা হয়েছে।”

কেন সে এভাবে দাঁড়াল? বসল না কেন? কারণ সে খুব শিগগিরই ফিরে যেতে ইচ্ছুক। দেবতারা কোনো বিশেষ কারণে শুচিশুদ্ধ ব্যক্তির মতো মলপূর্ণ স্থান মনুষ্যলোকে এসে থাকে। সাধারণত শত যোজন দূর থেকেই মনুষ্যলোকের দুর্গন্ধ তারা পায়, মনুষ্যলোক তাদের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর জায়গা, তাই তারা এখানে অভিরমিত হয় না। যে কাজের জন্য এসেছে সেই কাজ সেরে শিগগিরই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় সে বসল না। মানুষ সাধারণত হাঁটাহাটি ইত্যাদিজনিত দৈহিক ক্লান্তি দূর করার জন্যই বসে থাকে, দেবতাদের মধ্যে সে-রকম দৈহিক ক্লান্তি নেই, তাই সে বসল না। যে মহাশ্রাবকরা ভগবানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রতি মান্যতা দেখিয়েও সে বসল না। তা ছাড়া ভগবানের প্রতি গৌরবের বশেও সে বসল না। যেসব দেবতা বসতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এমনিতেই বসার আসন উৎপন্ন হয়, তার সে-রকম কোনো ইচ্ছা না থাকায় সে একপাশে দাঁড়াল।

**একপাশে দাঁড়িয়ে সেই দেবতা** মানে হচ্ছে এভাবে এই সমস্ত কারণে একপাশে দাঁড়ানো সেই দেবতা। **ভগবানকে গাথাযোগে বলল** মানে ভগবানকে গাথাযোগে অর্থাৎ অক্ষর-পদযুক্ত বাক্যের দ্বারা বলল, এই হচ্ছে এর অর্থ। কীভাবে? **সকলের স্বস্তি কামনা করে বহু দেবতা ও মানুষ... উত্তম মঙ্গল সম্পর্কে বলুন**।

## মঙ্গল-প্রশ্নের উৎপত্তি-কথা

এখানে যেহেতু “**এরূপ ইত্যাদি পাঠের অর্থ ও এর উৎপত্তি-কথা নানা প্রকারে বর্ণনা করার সময়**” এভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণী (*মাতিকা*) তুলে ধরা হয়েছে, এখন সেই উৎপত্তি-কথা বলবার সময় এসেছে, তাই প্রথমে মঙ্গল-প্রশ্নের উৎপত্তি-কথা বলে, পরে এই গাথাপদগুলোর অর্থ বর্ণনা করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মঙ্গল-প্রশ্নের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে?

জম্বুদ্বীপে নাকি বিভিন্ন নগরদ্বারে, সম্মেলন-ঘরে, সভা-সমাবেশে ইত্যাদিতে বহু মানুষ জড়ো হয়ে টাকা-পয়সা ও সোনাদানা দিয়ে সীতাহরণ ইত্যাদি নানা ধরনের বাহ্যিক কথা বলাত, একেক বিষয়ক কথা চার মাস পর শেষ হতো। একদিন সেখানে মঙ্গল বিষয়ক কথা উত্থাপিত হলো, যেমন: “মঙ্গল কী? কী দেখলে মঙ্গল হয়? কী শুনলে মঙ্গল হয়? কী অনুভব করলে মঙ্গল হয়? মঙ্গল সম্বন্ধে কে জানে?”

তখন দৃষ্টমাঙ্গলিক বা দেখায় মঙ্গল হয় এমন মতবাদে বিশ্বাসী এক লোক বলল, “আমি মঙ্গল সম্বন্ধে জানি। জগতে দেখলেই মঙ্গল হয়। দেখা মানে হচ্ছে মঙ্গলময় হিসেবে গণ্য এমন দৃশ্য দেখা। যেমন, এখানে কেউ কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে চাতক পাখি দেখে, বাঁশের লাঠি, বা গর্ভবতী নারী, বা বালক, বা সুসজ্জিত জলপূর্ণ ঘট, বা টাটকা মাছ, বা উন্নত জাতের ঘোড়া, বা উন্নত জাতের ঘোড়ায় টানা রথ, অথবা ষাঁড়, অথবা গাভি, অথবা ঋষিকে দেখে, অথবা এই জাতীয় মঙ্গলময় অন্য কোনো দৃশ্য দেখে, একেই বলা হয় দেখায় মঙ্গল।” তার কথা কেউ কেউ গ্রহণ করল, কেউ কেউ গ্রহণ করল না। যারা গ্রহণ করল না তারা তার সঙ্গে তর্ক করল।

এরপর শ্রুতমাঙ্গলিক বা শোনায় মঙ্গল হয় এমন মতবাদে বিশ্বাসী এক লোক বলল, “হে মাননীয়গণ, চোখ তো শুচি ও অশুচি দুটোই দেখে, একইভাবে সুন্দর ও অসুন্দর, মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ সবই দেখে। যদি দেখলেই মঙ্গল হতো তা হলে তো সবেতেই মঙ্গল হতো, তাই দেখায় মঙ্গল হয় না। আমার মতে শুনলেই মঙ্গল হয়, শোনা মানে হচ্ছে মঙ্গলময় হিসেবে গণ্য এমন শব্দ শোনা। যেমন, এখানে কেউ কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধি, বর্ধমান, পূর্ণ, শুভ, সুমন, শ্রী বা শ্রীবর্ধন এসব শব্দ শোনে, অথবা আজ সুনক্ষত্র, সুমুহূর্ত, সুদিন, সুমঙ্গল এসব শব্দ শোনে, অথবা এই জাতীয় মঙ্গলময় অন্য কোনো শব্দ শোনে, একেই বলা হয় শোনায় মঙ্গল।” তার কথাও কেউ কেউ গ্রহণ করল, কেউ কেউ গ্রহণ করল না। যারা গ্রহণ করল না তারা তার সঙ্গে তর্ক করল।

এরপর অনুভব-মাঙ্গলিক বা অনুভবে মঙ্গল হয় এমন মতবাদে বিশ্বাসী এক লোক বলল, “হে মাননীয়গণ, কান তো সাধু-অসাধু, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ উভয় শব্দই শোনে। যদি শুনলেই মঙ্গল হতো তা হলে তো সবেতেই মঙ্গল হতো, তাই শোনায় মঙ্গল হয় না। আমার মতে অনুভবেই মঙ্গল হয়, অনুভব মানে হচ্ছে মঙ্গলময় হিসেবে গণ্য এমন গন্ধ, রস ও স্পর্শ অনুভব করা। যেমন, এখানে কেউ কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে পদ্মফুলের গন্ধ ইত্যাদি ফুলের গন্ধ শোঁকে, অথবা সুন্দর দন্তকাষ্ঠ দিয়ে দাঁত মাজে, অথবা মাটি স্পর্শ করে, অথবা হরিৎবর্ণের শস্য, অথবা ভেজা গোবর, অথবা কচ্ছপ, অথবা তিলের স্তূপ, অথবা ফুল, অথবা ফল স্পর্শ করে, অথবা সুন্দর মাটি দিয়ে ভালো করে ঘর লেপে, অথবা সুন্দর কাপড় পরিধান করে, সুন্দর শাল গায়ে জড়ায়, অথবা এই জাতীয় মঙ্গলময় অন্য কোনো গন্ধ শোঁকে, অথবা রস আস্বাদন করে, অথবা স্পর্শ অনুভব করে, একেই বলা হয় অনুভবে মঙ্গল। তার কথাও কেউ কেউ গ্রহণ করল, কেউ কেউ গ্রহণ করল না।

সেখানে দৃষ্টমাঙ্গলিক ব্যক্তি শ্রুতমাঙ্গলিক ও অনুভব-মাঙ্গলিক ব্যক্তিকে কিছুতেই বোঝাতে পারল না। মোদ্দা কথা তাদের কেউই কাউকে বোঝাতে পারল না। উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে যারা দৃষ্টমাঙ্গলিক ব্যক্তির কথা গ্রহণ করল তারা “দেখায় মঙ্গল হয়” বলে বিশ্বাস করল। আর যারা শ্রুতমাঙ্গলিক ও অনুভব-মাঙ্গলিক ব্যক্তির কথা গ্রহণ করল তারা “শোনায় মঙ্গল হয়, অনুভবে মঙ্গল হয়” বলে বিশ্বাস করল। এভাবেই মঙ্গল বিষয়ক কথা সমগ্র জম্বুদ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর সমগ্র জম্বুদ্বীপের মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে দলে দলে জড়ো হয়ে মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করল। সেই মানুষদের আরক্ষা-দেবতারা সেই কথা শুনে একইভাবে মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করল। ভূমিবাসী দেবতারা হচ্ছে সেই আরক্ষা-দেবতাদের বন্ধু। তাই তাদের কাছ থেকে শুনে ভূমিবাসী দেবতারাও একইভাবে মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করল। সেই ভূমিবাসী দেবতাদের বন্ধু হচ্ছে আকাশবাসী দেবতারা, আকাশবাসী দেবতাদের বন্ধু হচ্ছে চতুর্মহারাজিক দেবতারা। এভাবে পর্যায়ক্রমে সুদর্শী দেবতাদের বন্ধু হচ্ছে অকনিষ্ঠ দেবতারা, তারাও সুদর্শী দেবতাদের কাছ থেকে শুনে একইভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করল। এভাবে দশ হাজার চক্রবালের সর্বত্রই মঙ্গলচিন্তা দেখা দিয়েছিল। “এটি মঙ্গল, এটি মঙ্গল” এভাবে বিচার করে দেখতে গিয়েও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারায় মঙ্গল সম্বন্ধে বিতর্ক বারো বছর ধরে চলল। একমাত্র যাঁরা আর্যশ্রাবক তাঁরা ছাড়া বাদবাকি মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মা সবাই দেখায় মঙ্গল, শোনায় মঙ্গল ও অনুভবে মঙ্গল এই তিন প্রকার মঙ্গলের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তারা সবাই কোনোমতেই “এটিই মঙ্গল” বলে একমত হতে পারল না, তাই জগতে মঙ্গল-কোলাহল উৎপন্ন হলো।

**কোলাহল পাঁচ প্রকার**; যথা: কল্প-কোলাহল, চক্রবর্তী-কোলাহল, বুদ্ধ-কোলাহল, মঙ্গল-কোলাহল ও মোনেয়্য-কোলাহল। এখানে কামজগতের দেবতারা চুলের বাঁধন খুলে, আলুথালু অগোছালো চুল নিয়ে, হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে, লাল কাপড় পরে ভয়ংকর বেশ ধারণ করে “আজ থেকে লক্ষ বছর পরে কল্পের উত্থান হবে। এই জগৎ ধ্বংস হবে, মহাসমুদ্র শুকিয়ে যাবে, এই মহাপৃথিবী ও পর্বতরাজ সিনেরু জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, ধ্বংস হবে, এভাবে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জগৎ ধ্বংস হবে। ওহে, আপনারা মৈত্রী-ভাবনা করুন, করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা ভাবনা করুন; ওহে, আপনারা মায়ের সেবা-সম্মান করুন, বাবার সেবা-সম্মান করুন, বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা-সম্মান করুন; আপনারা সচেতন হোন, প্রমত্ত হয়ে থাকবেন না” এই বলে লোকজনের মাঝে বিচরণ করে জানিয়ে দেয়। এটিই হচ্ছে **কল্প-কোলাহল**।

কামজগতের দেবতারাই “আজ থেকে শত বছর পরে জগতে চক্রবর্তী রাজাউৎপন্ন হবেন” এই বলে লোকজনের মাঝে বিচরণ করে জানিয়ে দেয়। এটিই হচ্ছে **চক্রবর্তী-কোলাহল**।

সুদ্ধাবাস দেবতারা ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত হয়ে, মাথায় ব্রহ্মাপাগড়ি পরে, খুশি ও আনন্দিত মনে বুদ্ধগুণের কথা বলতে বলতে “আজ থেকে হাজার বছর পরে জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন” এই বলে লোকজনের মাঝে বিচরণ করে জানিয়ে দেয়। এটিই হচ্ছে **বুদ্ধ-কোলাহল**।

সুদ্ধাবাস দেবতারাই মানুষদের মনের কথা জেনে “আজ থেকে বারো বছর পরে সম্যকসম্বুদ্ধ মঙ্গল সম্বন্ধে দেশনা করবেন” এই বলে লোকজনের মাঝে বিচরণ করে জানিয়ে দেয়। এটিই হচ্ছে **মঙ্গল-কোলাহল**।

সুদ্ধাবাস দেবতারাই “আজ থেকে সাত বছর পরে জনৈক ভিক্ষু ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মোনেয়্য-প্রতিপদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন” এই বলে লোকজনের মাঝে বিচরণ করে জানিয়ে দেয়। এটিই হচ্ছে **মোনেয়্য-কোলাহল**। এই পাঁচ প্রকার কোলাহলের মধ্যে দেখায় মঙ্গল ইত্যাদির ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত দেবতা ও মানুষদের মাঝে এই মঙ্গল-কোলাহল উৎপন্ন হয়েছিল।

এরপর দেবতা ও মানুষদের মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলের হদিস না পেয়ে বারো বছর পরে তাবতিংস স্বর্গের দেবতারা সমবেত হয়ে এভাবে চিন্তা করল, “হে বন্ধুগণ, গৃহস্বামী যেমন বাড়ির লোকজনের কর্তা, গ্রামপ্রধান যেমন গ্রামবাসীদের মধ্যে কর্তা, রাজা যেমন সকল মানুষের মধ্যে কর্তা, একইভাবে আমাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র সক্কই পুণ্য-তেজ-ঐশ্বর্য-প্রজ্ঞায় অগ্র ও শ্রেষ্ঠ এবং দুটি দেবলোকের অধিপতি। আমরা বরং দেবরাজ ইন্দ্র সক্ককেই এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে দেখি।” তারা সবাই সক্কের কাছে গেল। দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক তখন উপযুক্ত কাপড় ও নানান অলংকার পরে, অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেজে, আড়াই কোটি অপ্সরা পরিবৃত হয়ে পারিজাত বৃক্ষের গোড়ায় শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকম্বলের আসনে বসে ছিলেন। তারা সক্ককে অভিবাদন জানিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে বলল, “প্রভু, আপনি তো জানেন বর্তমানে মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, কেউ কেউ দেখায় মঙ্গল বলছে, কেউ কেউ শোনায় মঙ্গল বলছে, আবার কেউ কেউ অনুভবে মঙ্গল বলছে। এ ব্যাপারে আমরা কিংবা অন্যরা কেউই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম না, আপনি যদি এর সঠিক ব্যাখ্যা দেন তা হলে খুবই ভালো হয়।” দেবরাজ ইন্দ্র স্বভাবতই প্রজ্ঞাবান হন, তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এই মঙ্গল সম্বন্ধে কথাবার্তা প্রথম কোথায় উত্থাপিত হয়েছিল?” “প্রভু, আমরা তো চতুর্মহারাজিক দেবতাদের কাছ থেকেই শুনেছি” তারা উত্তর দিল। এরপর চতুর্মহারাজিক দেবতারা আকাশবাসী দেবতাদের কাছ থেকে, আকাশবাসী দেবতারা ভূমিবাসী দেবতাদের কাছ থেকে, ভূমিবাসী দেবতারা মানুষদের আরক্ষা-দেবতাদের কাছ থেকে, মানুষদের আরক্ষা-দেবতারা বলল, “মনুষ্যলোকেই প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল।”

এরপর দেবরাজ ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, “সম্যকসম্বুদ্ধ কোথায় বাস করছেন?” “প্রভু, মনুষ্যলোকে” তারা উত্তর দিল। “কেউ গিয়ে সেই ভগবানকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ কি?” তিনি প্রশ্ন করলেন। “না প্রভু, কেউ জিজ্ঞেস করেনি।” “তোমরা কি আগুন ছেড়ে জোনাকিকে বেশি উজ্জ্বল মনে করছ না? তোমরা কী করে জগতের নিখিল মঙ্গলের দেশক ভগবানকে ছেড়ে আমায় জিজ্ঞেস করার কথা ভাবলে? বন্ধুগণ, এসো, আমরা সেই ভগবানকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব। তাঁর কাছ থেকে আমরা নিশ্চয় সদুত্তর পাবো।” এই বলে তিনি এক দেবপুত্রকে আদেশ করলেন, “তুমি ভগবানের কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো।” সেই দেবপুত্র তাৎক্ষণিকভাবে দিব্য অলংকারে অলংকৃত হয়ে, বিদ্যুতের ন্যায় দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত করতে করতে দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, জেতবন মহাবিহারে এসে ভগবানকে অভিবাদন জানিয়ে, একপাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই গাথায় বলল, “**সকলের স্বস্তি কামনা করে বহু দেবতা ও মানুষ।**”

এই হচ্ছে মঙ্গল-প্রশ্নের উৎপত্তি-কথা।

## ‘বহু দেবতা’ গাথাটির বর্ণনা

২. এখন গাথাপদগুলোর অর্থবর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে **বহু** হচ্ছে অনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশক একটি শব্দ। এর দ্বারা বহুশত, বহু হাজার, বহু লক্ষ বলা হয়েছে। খেলায় মশগুল থাকে এই অর্থে **দেবতা**, অর্থাৎ পঞ্চ কাম্য বিষয় নিয়ে খেলা করে, অথবা স্বীয় শ্রী-সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়, এই হচ্ছে এর অর্থ। তা ছাড়া, দেবতা তিন প্রকার, যথা: সম্মুতি দেবতা, উৎপত্তি দেবতা ও বিশুদ্ধি দেবতা। যেমন বলা হয়েছে:

“দেবতা বলতে তিন প্রকার দেবতা, যেমন: সম্মুতি দেবতা, উৎপত্তি দেবতা ও বিশুদ্ধি দেবতা। এখানে সম্মুতি দেবতা হচ্ছে রাজা, রানি ও রাজকুমারেরা। উৎপত্তি দেবতা হচ্ছে চতুর্মহারাজিক দেবতা থেকে শুরু করে তদূর্ধ্ব দেবলোকের দেবতারা। আর অর্হৎদের বলা হয় বিশুদ্ধি দেবতা।” (চূল়নি. ধোতকমাণৰপুচ্ছানিদ্দেস ৩২, পারাযনানুগীতিগাথা-নিদ্দেস ১১৯)

তন্মধ্যে এখানে উৎপত্তি দেবতাই অভিপ্রেত। মনুর বংশধর এই অর্থে **মানুষ**। তবে প্রাচীনেরা বলেন যে, “মনের পূর্ণতা সাধনের দ্বারাই মানুষ। মানুষ চার প্রকার; যথা: জম্বুদ্বীপবাসী মানুষ, অপরগোয়ানবাসী মানুষ, উত্তরকুরুনিবাসী মানুষ ও পূর্ববিদেহনিবাসী মানুষ। এখানে জম্বুদ্বীপবাসী মানুষই অভিপ্রেত। এগুলোর দ্বারা সত্ত্বদের মঙ্গল হয় এই অর্থে **মঙ্গল**, অর্থাৎ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি এনে দেয়, এই হচ্ছে এর অর্থ। **কামনা করে** মানে হচ্ছে ইচ্ছা করে, প্রার্থনা করে, আকাঙ্ক্ষা করে। **স্বস্তি** মানে হচ্ছে সুখ, কল্যাণ, অর্থাৎ সকলের ইহ-পারলৌকিক শোভন, সুন্দর, কল্যাণ বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকার কথাই বলা হয়েছে। **বলুন** মানে হচ্ছে দেশনা করুন, প্রকাশ করুন, বর্ণনা করুন, বিবৃত করুন, বিভক্ত করুন, খোলাসা করে বলুন। **মঙ্গল** মানে হচ্ছে উন্নতির কারণ, শ্রীবৃদ্ধির কারণ ও সর্ববিধ সম্পত্তি লাভের কারণ। **উত্তম** মানে হচ্ছে বিশিষ্ট, প্রবর, সকলের জন্যই হিতসুখ বয়ে আনে এমন। এই হচ্ছে এই গাথার আনুক্রমিক পদের বর্ণনা।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে এই: দশ হাজার চক্রবালের দেবতারা মঙ্গল বিষয়ক প্রশ্ন শোনার ইচ্ছায় এই একটি চক্রবালে জড়ো হয়ে, একচুল পরিমাণ জায়গার মধ্যে দশজন, বিশজন, ত্রিশজন, চল্লিশজন, পঞ্চাশজন, ষাটজন, এমনকি আশিজন দেবতা সূক্ষ্ম দেহ নির্মাণ করে, দেবতা-মার-ব্রহ্মাদের চাইতে শ্রী ও তেজে অধিকতর উজ্জ্বল, সজ্জিত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে উপবিষ্ট ভগবানকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, এবং সেই সময়ে সেখানে অনাগত সমগ্র জম্বুদ্বীপবাসী মানুষদের মনের চিন্তার কথা অবগত হয়ে, সকল দেবতা ও মানুষদের সন্দেহশল্য উৎপাটন করার লক্ষ্যে সেই দেবপুত্র বলল, “হে ভগবান, স্বস্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়, অর্থাৎ নিজের স্বস্তি লাভের ইচ্ছায় বহু দেবতা ও মানুষ মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, এবার আপনি অনুগ্রহ করে উত্তম মঙ্গল সম্বন্ধে বলুন, অথবা সেই দেবতাদের অনুমতি নিয়ে এবং মানুষদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এবার আপনি আমাদের সকলের পক্ষে যা একান্ত হিতসুখ বয়ে আনে সেই উত্তম মঙ্গল সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে বলুন।”

## ‘মেলামেশা না করা’ গাথাটির বর্ণনা

৩. এভাবে দেবপুত্রের এই কথা শুনে ভগবান “**মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা**” এই গাথাটি বললেন। এখানে **মেলামেশা না করা** মানে হচ্ছে সংসর্গ না করা, সাহচর্য না করা। **মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে** এই কথাটিতে বেঁচে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় এই অর্থে মূর্খ, অর্থাৎ মূর্খরা শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকে, প্রজ্ঞাময় জীবনযাপন করে না, এমন মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে, এই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। জ্ঞানময় জীবনযাপন করে এই অর্থে পণ্ডিত, অর্থাৎ ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের দিকে জ্ঞানের গতিতে গমন করে, এই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। সেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে। **মেলামেশা করা** মানে হচ্ছে সংসর্গ করা, সাহচর্য করা, অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, ঘনিষ্ঠভাবে মেশা। **পূজা করা** মানে হচ্ছে সম্মান করা, গৌরব করা, মান্য করা, বন্দনা করা। **পূজনীয়** মানে হচ্ছে পূজার যোগ্য। **এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল** মানে হচ্ছে এই যে মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা, সেগুলোর সবকটিকে একত্র করেই বললেন, এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল। তুমি যে “উত্তম মঙ্গল সম্পর্কে বলুন” বলেছ, এখানে আপাতত এগুলোকেই উত্তম মঙ্গল হিসেবে গ্রহণ করো বলা হয়েছে। এই হচ্ছে এই গাথার পদবর্ণনা।

তবে এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: দেবপুত্রের এই কথা শুনে ভগবান এই গাথাটি বললেন। এখানে যেহেতু কথা চার প্রকার রয়েছে, যেমন: জিজ্ঞাসিত কথা, অজিজ্ঞাসিত কথা, প্রাসঙ্গিক কথা ও অপ্রাসঙ্গিক কথা। এখানে “হে গৌতম, সেই মহাপ্রাজ্ঞকে জিজ্ঞেস করছি, কী করলে একজন শিষ্য সাধু হয়?” (সু.নি.৩৭৯) এবং “হে প্রভু, কীভাবে আপনি প্লাবন অতিক্রম করেছেন?” (সং.নি.১.১) এভাবে ইত্যাদিতে প্রশ্নের ভিত্তিতে বলা কথাই হচ্ছে জিজ্ঞাসিত কথা। “অন্যরা যাকে সুখ বলে, আর্যরা তাকে দুঃখ বলে” এভাবে ইত্যাদিতে (সু.নি.৭৬৮) প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় বলা কথাই হচ্ছে অজিজ্ঞাসিত কথা। বুদ্ধগণের সব কথাই “হে ভিক্ষুগণ, এখন আমি কারণযুক্ত ধর্মই দেশনা করব” (অ.নি.৩.১২৬; কথা.৮০৬) এই কথার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক কথা। এই বুদ্ধশাসনে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে কোনো কথা নেই। দেবপুত্র জিজ্ঞেস করায় এবং ভগবান এর উত্তর দেওয়ায় উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে জিজ্ঞাসিত কথা। জিজ্ঞাসিত কথা হলেও মার্গ-অমার্গ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি যেমন মার্গ বা পথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে প্রথমে বর্জনীয় পথের কথা বলে, পরে অনুসরণযোগ্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেয় এভাবে—“অমুক স্থানে পথটি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, সেখানে পৌঁছে বামদিকের পথে না গিয়ে ডানদিকের পথ ধরে হেঁটে যাবে।” এভাবে মেলামেশার যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথমে মেলামেশার অযোগ্য ব্যক্তির কথা বলে, পরে মেলামেশার যোগ্য ব্যক্তির কথা বলে দেন। ভগবানও মার্গ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো। যেমন বলা হয়েছে:

“হে তিস্স, মার্গাভিজ্ঞ বা মার্গ সম্পর্কে দক্ষ ব্যক্তি হচ্ছে তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধেরই নামান্তর। তিনি ইহলোক সম্পর্কে দক্ষ, পরলোক সম্পর্কে দক্ষ, মৃত্যুরাজ্য সম্পর্কে দক্ষ, অমৃত্যুরাজ্য সম্পর্কে দক্ষ, মাররাজ্য সম্পর্কে দক্ষ, অমাররাজ্য সম্পর্কে দক্ষ।”

তাই তিনি প্রথমে মেলামেশার অযোগ্য ব্যক্তির কথা বলার পর, মেলামেশার যোগ্য ব্যক্তির কথা বলতেই বললেন, “মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা।” বর্জনীয় পথের মতোই প্রথমে মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়, সংসর্গ করা উচিত নয়, তারপর অনুসরণযোগ্য সঠিক পথের মতোই পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত, সংসর্গ করা উচিত।

কিন্তু ভগবান কেন মঙ্গল সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমে মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করার কথা বলেছেন? উত্তরে বলা যায়, যেহেতু দেবতা ও মানুষেরা মূর্খসংসর্গের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই মঙ্গলদৃষ্টিই গ্রহণ করেছিল, তাও আবার অমঙ্গল, তাই তাদের সেই ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ধ্বংসকারী অকল্যাণমিত্র-সংসর্গকে নিন্দা করে এবং উভয় লোকের জন্যই কল্যাণকর এমন কল্যাণমিত্র-সংসর্গকে প্রশংসা করে ভগবান প্রথমে মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করার কথা বলেছেন।

এখানে **মূর্খ** বলতে যে-সকল সত্ত্ব প্রাণিহত্যা ইত্যাদি অকুশল কর্মপথ সম্পাদন করে। তাদের তিন প্রকারে চেনা যায়। যেমন সূত্রে বলা হয়েছে: “হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তির এই তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে।” (অ.নি.৩.৩; ম.নি.৩.২৪৬) তা ছাড়া, পূরণকাশ্যপ ইত্যাদি ছয়জন অন্যধর্মের শিক্ষক, দেবদত্ত, কোকালিক, কটমোদক তিস্স, খণ্ডদেবীর পুত্র, সমুদ্রদত্ত, চিঞ্চা মানবিকা ইত্যাদি, অতীতকালে দীর্ঘবিদের ভাই, এই ধরনের অন্যান্য সত্ত্বগণকে মূর্খ হিসেবে বুঝতে হবে।

তারা জ্বলন্ত অঙ্গারকে ধরে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ন্যায় নিজেকে এবং নিজের অনুগত ব্যক্তিদের বিনষ্ট করে, যেমন দীর্ঘবিদের ভাই চার বুদ্ধান্তর কাল ধরে ষাট যোজন সমান দেহ ধারণ করে, ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পতিত হয়ে মহানিরয়ে দগ্ধ হচ্ছে, যেমন তার কথা শুনে পাঁচশো কুলপুত্র তারই সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে নিরয়ে দগ্ধ হচ্ছে। তাই বলা হয়েছে:

“যেমন, হে ভিক্ষুগণ, নলখাগড়া কিংবা তৃণ দিয়ে বানানো বাড়ি থেকে বের হওয়া আগুনের ফুলকি ভেতরে-বাইরে ভালোমতো লেপা, দরজা-জানালাবদ্ধ, মজবুত করে তৈরি করা, দরজা-জানালাযুক্ত, চূড়াযুক্ত বাড়িকেও দগ্ধ করতে পারে, ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, যা কিছু ভয় উৎপন্ন হয় সবই মূর্খ হতেই উৎপন্ন হয়, পণ্ডিত হতে নয়। যা কিছু বিপদ উৎপন্ন হয়... যা কিছু ঝুঁকি উৎপন্ন হয়... পণ্ডিত হতে নয়। এভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, মূর্খ ব্যক্তি ভয়যুক্ত, আর পণ্ডিত ব্যক্তি ভয়হীন। মূর্খ ব্যক্তি বিপদযুক্ত, আর পণ্ডিত ব্যক্তি বিপদহীন। মূর্খ ব্যক্তি ঝুঁকিযুক্ত, আর পণ্ডিত ব্যক্তি ঝুঁকিহীন।” (অ.নি.৩.১)

তা ছাড়া, মূর্খ ব্যক্তি হচ্ছে পচা মাছের মতো, আর তার সংসর্গকারী ব্যক্তি হচ্ছে পচা মাছ রাখার জন্য পাতা দিয়ে বানানো থলির মতো। তারা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে বর্জনীয় ও ঘৃণ্য হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে:

“যে ব্যক্তি সুগন্ধি ঘাস দিয়ে পচা মাছকে ঢেকে রাখে,

তখন সেই সুগন্ধি ঘাস হতেও দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে,

মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে সংসর্গের ব্যাপারটিও ঠিক একই।” (ইতিৰু.৭৬; জা.১.১৫.১৮৩; ২.২২.১২৫৭)

দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক যখন বর দিচ্ছিল তখন অকীর্তি পণ্ডিত তাকে এরূপ বলল:

“মূর্খ ব্যক্তিকে দর্শন করো না, তার কথা শোনো না,

মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে সংবাস করো না,

মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে কোনো আলাপ করো না,

এমনকি আলাপের আগ্রহও দেখিয়ো না।”

“কেন তুমি মূর্খ ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করোনি?

হে কাশ্যপ, এর কারণ তুমি আমায় বলো।

হে কাশ্যপ, কেন তুমি মূর্খ ব্যক্তির দর্শন ইচ্ছা করো না?”

“মূর্খ ব্যক্তি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়,

ভ্রান্ত পথে নিয়োজিত করায়,

মূর্খ ব্যক্তিকে ভালো পথে নেওয়া যায় না,

দুঃশীলতাকেই সে শ্রেয় হিসেবে গ্রহণ করে,

ভালো করে বললেও রাগ করে।

সংযমতা কী সে তা জানে না,

কাজেই তার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো।” (জা.১.১৩.৯০-৯২)

এভাবে ভগবান সর্বতোভাবে মূর্খসংসর্গকে নিন্দা করার সময় মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করাকে “মঙ্গল” বলার পর, এখন পণ্ডিত-সংসর্গকে প্রশংসা করতেই “পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা মঙ্গল” বললেন। এখানে **পণ্ডিত** মানে হচ্ছে যারা প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকা ইত্যাদি দশ কুশল কর্মপথ সম্পাদন করে এমন সত্ত্বগণ, তাদের তিন প্রকারে চেনা যায়। যেমন বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তির এই তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে।” (অ.নি.৩.৩; ম.নি.৩.২৫৩) তা ছাড়া বুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ, আশিজন মহাশ্রাবক, তথাগতের অন্যান্য শিষ্যরা এবং সুনেত্ত, মহাগোবিন্দ, বিধুর, সরভঙ্গ, মহোসধ, সুতসোম, নিমিরাজ, অয়োঘর কুমার, অকীর্তি পণ্ডিত ইত্যাদি ব্যক্তিদেরও পণ্ডিত হিসেবে জানতে হবে।

তাঁরা ভয়ে গাছের মতো, অন্ধকারে প্রদীপের মতো, ক্ষুধা-জলতেষ্টা ইত্যাদি দুঃখ অতিক্রমে অন্ন-পানীয় ইত্যাদি লাভ করার মতো, নিজের অনুগতদের সকল ভয়-বিপদ-ঝুঁকি দূর করে দিতে সক্ষম হন। একইভাবে তথাগতের কারণে অসংখ্য অপরিমেয় দেবতা ও মানুষ আসবক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুগতিলোকে উৎপন্ন হয়েছে। সারিপুত্র স্থবিরের প্রতি চিত্তকে প্রসন্ন করে এবং চার প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী দান দিয়ে স্থবিরকে সেবাপূজা করে আশি হাজার পরিবার স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছে। একইভাবে মহামোগ্গল্লান, মহাকাশ্যপ ইত্যাদি সকল মহাশ্রাবকদের প্রতিও এবং সুনেত্ত নামক শিক্ষকের শিষ্যদের কেউ কেউ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছিল, কেউ কেউ পরিনির্মিত বশবর্তী দেবতাদের মাঝে উৎপন্ন হয়েছিল... কেউ কেউ ধনী গৃহী পরিবারগুলোর মাঝে উৎপন্ন হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ভয় নেই, পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো বিপদ নেই, পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ঝুঁকি নেই।” (অ.নি.৩.১)

তা ছাড়া, পণ্ডিত ব্যক্তি হচ্ছে তগর ফুলের মালা ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যের মতো, আর পণ্ডিত-সংসর্গকারী ব্যক্তি হচ্ছে তগর ফুলের মালা ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে মুড়ে রাখা জিনিসের মতো, সে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে সম্মাননীয় হয় ও প্রশংসনীয় হয়। তাই বলা হয়েছে:

“যে ব্যক্তি পাতা দিয়ে তগর ফুলকে ঢেকে রাখে,

তখন সেই পাতা হতেও সুরভি বেরোতে থাকে,

ধীর ব্যক্তির সঙ্গে সংসর্গের ব্যাপারটিও ঠিক একই।” (ইতিৰু.৭৬; জা.১.১৫.১৮৪; ২.২২.১২৫৮)

দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক যখন বর দিচ্ছিল তখন অকীর্তি পণ্ডিত তাকে এরূপ বলল:

“ধীর ব্যক্তিকে দর্শন করো, তার কথা শোনো,

ধীর ব্যক্তির সঙ্গে সংবাস করো,

ধীর ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করো,

এমনকি আলাপের আগ্রহ দেখিয়ো।”

“কেন তুমি ধীর ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করোনি?

হে কাশ্যপ, এর কারণ তুমি আমায় বলো।

হে কাশ্যপ, কেন তুমি ধীর ব্যক্তির দর্শন ইচ্ছা করো?”

“মেধাবী ব্যক্তি সঠিক পথে নিয়ে যায়,

ভ্রান্ত পথে নিয়োজিত করায় না,

মেধাবী ব্যক্তিকে ভালো পথে নেওয়া সহজ,

সুশীলতাকেই সে শ্রেয় হিসেবে গ্রহণ করে,

ভালো করে বললে রাগ করে না।

সংযমতা কী তা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে,

কাজেই তার সঙ্গে দেখা হওয়াই ভালো।” (জা.১.১৩.৯৪-৯৬)

এভাবে ভগবান সর্বতোভাবে পণ্ডিত-সংসর্গকে প্রশংসা করার সময় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করাকে “মঙ্গল” বলার পর, এখন সেই মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করাকে প্রশংসা করতেই “**পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা, এটিই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল**” বললেন। এখানে **পূজনীয় ব্যক্তি** হচ্ছেন সর্বদোষ-বিরহিত ও সর্বগুণে গুণান্বিত বুদ্ধ ভগবান এবং তারপরে পচ্চেক-বুদ্ধ ও আর্যশ্রাবকরা। তাঁদের অল্পমাত্র পূজা করলেও তা দীর্ঘকাল ধরে হিতসুখ বয়ে আনে, সুমন মালাকার, মল্লিকা দেবী ইত্যাদি ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এখানে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরব। ভগবান নাকি একদিন সকালবেলা পরিধেয় চীবর পরিধান করে, পাত্র-চীবর গ্রহণ করে রাজগৃহে পিণ্ডচারণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। তখন সুমন মালাকার মগধের রাজা সেনিয় বিম্বিসারের উদ্দেশ্যে ফুল নিয়ে যাওয়ার সময় বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ সমন্বিত, আশি প্রকার অনুব্যঞ্জন প্রতিমণ্ডিত, বুদ্ধশ্রীতে উজ্জ্বল, নগরদ্বারে উপস্থিত ভগবানকে দেখতে পেল। দেখার পর সে ভাবল, “রাজা ফুলগুলো নিয়ে আমায় একশো কিংবা এক হাজার টাকা দেবেন, সেগুলো এই জন্মে আমায় সুখ দিতে পারবে বটে, তবে আমি যদি সেগুলো দিয়ে ভগবানকে পূজা করি তা হলে সেটি আমায় অসংখ্য-অপ্রমেয় সুফল দেবে এবং সেটি আমার জন্য দীর্ঘকাল হিতসুখ বয়ে আনবে।” এই ভেবে প্রসন্নচিত্ত হয়ে একমুঠো ফুল নিয়ে ভগবানের সামনে ছুঁড়ে মারল। ফুলগুলো আকাশপথে গিয়ে ভগবানের মাথার ওপর মালার শামিয়ানা হয়ে স্থিত হলো। মালাকার সেই দৃশ্য দেখে আরো বেশি প্রসন্নচিত্ত হয়ে আবার আরেক মুঠো ফুল ছুঁড়ে মারল, সেগুলোও একইভাবে গিয়ে মালার পর্দা হয়ে স্থিত হলো। এভাবে সে মোট আট মুঠো ফুল ছুঁড়ে মারল, সেগুলো গিয়ে একটি পুষ্পাগার হয়ে স্থিত হলো। ভগবান তখন বাড়ির ভেতরে থাকার মতোই হলেন। তখন সেখানে বিশাল জনতা জমায়েত হলো। ভগবান মালাকারের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন। “বুদ্ধগণ বিনা কারণে হাসেন না” এই ভেবে আনন্দ স্থবির হাসার কারণ জিজ্ঞেস করল। ভগবান উত্তরে বললেন, “হে আনন্দ, এই মালাকার এই পূজার প্রভাবে লক্ষ কল্প ধরে দেবতা ও মানুষদের মাঝে জন্মপরিভ্রমণ করে, পরিশেষে সুমনিশ্বর নামে পচ্চেক-বুদ্ধ হবে।” কথা শেষে ধর্মদেশনার উদ্দেশ্যে তিনি এই গাথাটি বললেন:

“সেই কর্মই করা ভালো যা করে অনুতাপ করতে হয় না,

এবং যার ফল খুশিমনে ও আনন্দে ভোগ করা যায়।” (ধ.প.৬৮)

গাথা শেষে চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হলো। এভাবে তাদের সেই সামান্যমাত্র পূজাও দীর্ঘকাল হিতসুখ বয়ে আনে বলে জানতে হবে। তাও আবার আমিষপূজা, আচরণগত পূজার (*পটিপত্তিপূজা*) কথা আর কী-ই বা বলব! যেসব কুলপুত্র ত্রিশরণ গ্রহণ করে, শীল গ্রহণ করে, উপোসথশীল গ্রহণ করে এবং চারি পরিশুদ্ধি শীল ইত্যাদি নিজের গুণ দিয়ে ভগবানকে পূজা করে, তাদের পূজার ফল কে বর্ণনা করবে? তারাই তথাগতকে পরম পূজায় পূজা করে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে:

“হে আনন্দ, যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা ধর্মানুসারে আচরণ করে বাস করে এবং সমীচীন পথে প্রবেশ করে সঠিকভাবে ধর্মচর্চা করে, সে তথাগতকে পরম পূজার দ্বারা সম্মান করে, গৌরব করে, মান্য করে, পূজা করে, শ্রদ্ধা জানায়।”

এভাবে পচ্চেক-বুদ্ধ ও আর্যশ্রাবকদের পূজা করলেও তা দীর্ঘকাল হিতসুখ বয়ে আনে বলে বুঝতে হবে।

তা ছাড়া, গৃহীদের ক্ষেত্রে ছোটভাইয়ের কাছে বড়ভাই ও বড়বোনও পূজনীয়, পুত্রের কাছে মা-বাবা, গৃহবধূর কাছে স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি, এখানে এভাবেই পূজনীয় ব্যক্তিদের বুঝতে হবে। এদের পূজা করলেও তা কুশলধর্ম হয় এবং তাতে করে আয়ু ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণ হয় বিধায় মঙ্গল বলা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে:

“যারা মাকে সেবা-সম্মান করবে, বাবাকে সেবা-সম্মান করবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে সেবা-সম্মান করবে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা-সম্মান করবে এবং এই সমস্ত কুশলধর্ম গ্রহণ করে সেগুলো পালন করবে, তারা সেসব কুশলধর্ম গ্রহণ করার ফলে দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হবে, সুন্দর দেহের অধিকারী হবে” ইত্যাদি।

এভাবে এই গাথায় মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা, এই তিনটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা না করলে তা মূর্খসংসর্গের ফলে উৎপন্ন ভয় ইত্যাদি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার মাধ্যমে ইহ-পর উভয় লোকের হিতের কারণ হয় বিধায় “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করলে ও পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করলে তা পূর্বোক্ত ফলবিভূতি বর্ণনায় বর্ণিত নিয়মে নির্বাণ ও সুগতির কারণ হয় বিধায় “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। এরপর থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে না ধরে, যেখানে যেটি মঙ্গল শুধু সেটিই বর্ণনা করব এবং কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে সেটি ব্যাখ্যা করব।

“মেলামেশা না করা” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করা’ গাথাটির বর্ণনা

৪. এভাবে ভগবান “উত্তম মঙ্গল সম্পর্কে বলুন” বলে একটি মঙ্গলের কথা শুনতে চাইলেও অল্প চাইলে বহু দেয় এমন মহান ব্যক্তির মতো একটি গাথায় তিনটি মঙ্গলের কথা বলার পর, দেবতারাও আরো শুনতে চায় এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক মঙ্গলও আছে বিধায় যাদের যেটি উপযুক্ত বিভিন্ন সত্ত্বদের সেই সেই মঙ্গলে নিয়োজিত করার ইচ্ছায় “**ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করা**” ইত্যাদি গাথার মাধ্যমে পুনরায় অনেক প্রকার মঙ্গলের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

এখানে প্রথম গাথায় বর্ণিত **ধর্মানুকূল** মানে হচ্ছে ধর্মপালনের উপযোগী। **দেশে** মানে হচ্ছে গ্রামে, গঞ্জে, নগরে ও জনপদে, অর্থাৎ যেসব স্থান সত্ত্বগণের বাসস্থান। **পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা** মানে হচ্ছে অতীত জন্মের কুশলসম্পত্তি জমা থাকা। **নিজেকে** বলতে চিত্তকে বলা হয়, অথবা নিজের পুরো ব্যক্তিত্বকে। **সম্যক পথে পরিচালিত করা** মানে নিজেকে সঠিক পথে নিয়োজিত করা, স্থাপন করা বলা হয়েছে। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এখানে এই হচ্ছে পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **ধর্মানুকূল দেশ** মানে হচ্ছে যেখানে (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-উপাসক-উপাসিকা এই) চারি পরিষদ বাস করে, দান ইত্যাদি পুণ্যকর্মের বিষয়গুলো চালু আছে, নবাঙ্গ শাস্তাশাসন (বৌদ্ধধর্ম) দীপ্তি ছড়াচ্ছে। এখানে বসবাস করলে তা সত্ত্বগণের পুণ্যকর্ম করার পক্ষে সুবিধা হয় বিধায় এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়। সিংহলদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কায় প্রবেশ করা কেবট্ট ইত্যাদি ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্য একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: ধর্মানুকূল দেশ হচ্ছে ভগবানের বোধিমণ্ডপের স্থান, ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান, বারো যোজন জায়গা জুড়ে বিস্তৃত বিশাল পরিষদের মাঝে সকল অন্যধর্মালম্বীদের মতবাদকে খণ্ডন করে যুগ্ম অলৌকিক দৃশ্য প্রদর্শনের স্থান গুল্মবৃক্ষের গোড়া, দেবলোকে আরোহণের স্থান, অথবা অন্য যেকোনো শ্রাবস্তী, রাজগৃহাদি বুদ্ধ ইত্যাদি ব্যক্তিদের বাসস্থান। এখানে বসবাস করলে তা সত্ত্বগণের ছয় প্রকার অনুত্তর বিষয় লাভের পক্ষে সুবিধা হয় বিধায় এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: পূর্বদিকে কজঙ্গল নামে গঞ্জ, এর বাইরে মহাশাল, তারপর প্রত্যন্ত জনপদ, এদিকে এই হচ্ছে মধ্যদেশ। দক্ষিণ-পূর্বদিকে সল্লবতী নামে নদী, তারপর প্রত্যন্ত জনপদ, এদিকে এই হচ্ছে মধ্যদেশ। দক্ষিণদিকে সেতকণ্ণিক নামে গঞ্জ, তারপর প্রত্যন্ত জনপদ, এদিকে এই হচ্ছে মধ্যদেশ। পশ্চিমদিকে থূণ নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম, তারপর প্রত্যন্ত জনপদ, এদিকে এই হচ্ছে মধ্যদেশ। উত্তরদিকে উসিরদ্ধজ নামে পর্বত, তারপর প্রত্যন্ত জনপদ, এদিকে এই হচ্ছে মধ্যদেশ। (মহাৰ.২৫৯) ‍এই মধ্যদেশটি দৈর্ঘ্যে তিনশো যোজন, প্রস্থে আড়াই শ যোজন এবং এর পরিধি হচ্ছে নয়শো যোজন, এটিই হচ্ছে প্রতিরূপ দেশ বা ধর্মানুকূল দেশ।

এখানে চারি মহাদ্বীপ ও দুই হাজার ছোটো ছোটো দ্বীপে প্রভুত্ব ও অধিপত্যকারী চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হন, এক অসংখ্য ও এক লক্ষ কল্প ধরে পারমী পূরণ করে সারিপুত্র, মোগ্গল্লান ইত্যাদি মহাশ্রাবকরা উৎপন্ন হন, দুই অসংখ্য ও এক লক্ষ কল্প ধরে পারমী পূরণ করে পচ্চেক-বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন, চার, আট কিংবা ষোলো অসংখ্য ও এক লক্ষ কল্প ধরে পারমী পূরণ করে সম্যকসম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হন। এখানে সত্ত্বগণ চক্রবর্তী রাজার উপদেশ মেনে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গে গমন করে, পচ্চেক-বুদ্ধগণের উপদেশ মেনেও একইভাবে স্বর্গগামী হয়। কিন্তু সম্যকসম্বুদ্ধ ও তাঁর শ্রাবকদের উপদেশ মেনে সত্ত্বগণ স্বর্গ ও নির্বাণে গমন করে। তাই এখানে বসবাস করলে তা এই সমস্ত সম্পত্তি লাভের হেতু হয় বিধায় এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

**পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা** মানে হচ্ছে অতীত জন্মে বুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ ও ক্ষীণাসব অর্হৎদের কারণে কুশলসম্পত্তি জমানো থাকা, এটিও একটা মঙ্গল। কেন? কারণ, এটি বুদ্ধ ও বুদ্ধগণকে সামনে থেকে দেখিয়ে, অথবা বুদ্ধ কিংবা বুদ্ধশ্রাবকদের মুখ থেকে শোনা চতুষ্পদী গাথা শেষে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত করায়। যে মানুষের পূর্বকৃত পুণ্য বা কুশলমূল সঞ্চিত থাকে সে সেই কুশলমূলের দ্বারা বিদর্শন উৎপন্ন করে আসবক্ষয় করতে পারে, রাজা মহাকপ্পিনের অগ্রমহিষীর মতো। তাই “পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা মঙ্গল” বলা হয়েছে।

**নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা** মানে হচ্ছে এখানে কেউ কেউ নিজেকে দুঃশীলতা থেকে তুলে এনে শীলে প্রতিষ্ঠিত করে, অশ্রদ্ধাভাব থেকে তুলে এনে শ্রদ্ধাসম্পদে প্রতিষ্ঠিত করে, কৃপণতা থেকে তুলে এনে ত্যাগসম্পদে প্রতিষ্ঠিত করে। একেই বলে “নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা।” এটিও একটা মঙ্গল। কেন? কারণ, এটি ইহ-পারলৌকিক বৈরী পরিত্যাগ এবং অনেক প্রকার সুফল লাভের হেতু হয়।

এভাবে এই গাথায় ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা, এই তিনটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে এবং এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করা” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘শাস্ত্রজ্ঞান’ গাথাটির বর্ণনা

৫. এখন **শাস্ত্রজ্ঞান** ইত্যাদি কথার মধ্যে এখানে **শাস্ত্রজ্ঞান** মানে হচ্ছে পাণ্ডিত্য। **শিল্পবিদ্যা** মানে হচ্ছে যেকোনো হাতের কাজে দক্ষতা। **বিনয়ে** মানে হচ্ছে কায়-বাক্য-মনকে দমনে। **সুশিক্ষিত হওয়া** মানে হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষিত হওয়া। **সুভাষিত কথা বলা** মানে হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ভাষিত কথা বলা। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এখানে এই হচ্ছে পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **শাস্ত্রজ্ঞান** হচ্ছে যা “শ্রুতিধর ও শ্রুতসঞ্চয়ী হয়” (ম.নি.১.৩৩৯; অ.নি.৪.২২) এবং “হে ভিক্ষুগণ, এখানে কোনো কোনো ব্যক্তি বহু কিছু শোনে, যেমন সূত্র, গেয়্য (গদ্য-পদ্য মিশ্রিত রচনা), ব্যাখ্যা (*ৰেয্যাকরণং*)” (অ.নি.৪.৬) এভাবে ইত্যাদি প্রকারে শাস্তাশাসনকে ধরে রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে, তা অকুশল পরিত্যাগ ও কুশল লাভের হেতু হয় বিধায় এবং ক্রমান্বয়ে পরমার্থসত্যকে সাক্ষাৎ করার হেতু হয় বিধায় “মঙ্গল” বলা হয়। তাই তো ভগবান বলেছেন:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন শিক্ষিত আর্যশ্রাবক অকুশল পরিত্যাগ করে, কুশল গড়ে তোলে, সদোষকে পরিত্যাগ করে, নির্দোষকে গড়ে তোলে, নিজেকে শুদ্ধভাবে রক্ষা করে।” (অ.নি.৭.৬৭)

আরো বলা হয়েছে:

“সে অধীত বিষয়গুলোর অর্থকে যাচাই করে দেখে, অর্থ যাচাই করে দেখার সময় বিষয়গুলোকে ভালো করে বুঝতে পারে, ধর্মগুলোকে বুঝতে পারায় তার মধ্যে ইচ্ছা জাগ্রত হয়, ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ায় সে চেষ্টা করে, চেষ্টা করার সময় সে তুলনা করে দেখে, তুলনা করে দেখার সময় সে কঠোর প্রচেষ্টা চালায়, কায়িকভাবে কঠোর প্রচেষ্টা চালানোর সময় সে পরমার্থসত্যকে সাক্ষাৎ করে এবং প্রজ্ঞা দিয়ে ভেদ করে দেখে।” (ম.নি.২.৪৩২)

তা ছাড়া, গৃহীদের যে শাস্ত্রজ্ঞান অনবদ্য বা নির্দোষ এবং উভয় লোকে হিতসুখ বয়ে আনে, সেটিকেও “মঙ্গল” হিসেবে জানতে হবে।

**শিল্পবিদ্যা** হচ্ছে দুই প্রকার, যথা: গৃহীদের শিল্পবিদ্যা ও গৃহত্যাগীদের শিল্পবিদ্যা। এখানে গৃহীদের শিল্পবিদ্যা হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করে না এমন এবং অকুশল-বিবর্জিত মণিকার, স্বর্ণকারের কাজ ইত্যাদি, এগুলো এই জন্মে কল্যাণ বয়ে আনে বিধায় মঙ্গল। গৃহত্যাগীদের শিল্পবিদ্যা হচ্ছে চীবর খোঁজাখুঁজি করা, সেলাই করা ইত্যাদি যেগুলো একজন শ্রমণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি মেরামতের কাজ, এবং যা “এখানে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু সতীর্থ ভিক্ষু-শ্রামণদের পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি যা কিছু নিত্য করণীয় কাজ আছে সেগুলোতে সে দক্ষ হয়” ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং যা “সহায়যুক্ত করায় এমন বিষয়গুলো” (দী.নি.৩.৩৪৫; অ.নি.১০.১৭) বলা হয়েছে, সেগুলো নিজের এবং অন্যদের ইহ-পর উভয় লোকে হিতসুখ বয়ে আনে, তাই এগুলোকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

**বিনয়** হচ্ছে দুই প্রকার; যথা: গৃহীদের বিনয় ও গৃহত্যাগীদের বিনয়। এখানে গৃহীদের বিনয় হচ্ছে দশ অকুশল কর্মপথ হতে বিরতি, কলুষতায় পড়ে না যাওয়ার মাধ্যমে এবং আচারগুণকে দৃঢ় করার মাধ্যমে তাতে সুশিক্ষিত হওয়া, তখন সেটি ইহ-পর উভয় লোকে হিতসুখ বয়ে আনে বিধায় মঙ্গল। গৃহত্যাগীদের বিনয় হচ্ছে সপ্ত আপত্তিস্কন্ধে পড়ে না যাওয়া (অর্থাৎ সাত শ্রেণির অপরাধ না করা), পূর্বানুরূপভাবে তাতে সুশিক্ষিত হওয়া। অথবা চারি পরিশুদ্ধি শীল হচ্ছে গৃহত্যাগীদের বিনয়। সে যেভাবে তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, ঠিক সেভাবে শিক্ষা করে সুশিক্ষিত হওয়া, তখন তা লৌকিক ও লোকোত্তর-সুখ লাভের হেতু হয় বিধায় সেটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

**সুভাষিত কথা** হচ্ছে মিথ্যা কথা ইত্যাদি দোষ-বিবর্জিত কথা। যেমন বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, চার অঙ্গ সমন্বিত কথাই সুভাষিত কথা।” অথবা অনর্থক আজেবাজে কথা নয় এমন কথাই হচ্ছে সুভাষিত কথা। যেমন বলা হয়েছে:

“শান্ত ব্যক্তিরা সুভাষিত বাক্যকেই উত্তম বলেন।

ধর্মকথাই বলে, অধর্ম নয়; এটি দ্বিতীয়।

প্রিয়কথাই বলে, অপ্রিয় নয়; এটি তৃতীয়।

সত্যকথাই বলে, অসত্য নয়; এটি চতুর্থ।”

(সং.নি.১.২১৩; সু.নি.৪৫৩)

এটিও ইহ-পর উভয় লোকে হিতসুখ বয়ে আনে, তাই এটিকেও “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। যেহেতু এটিও বিনয়ের অন্তর্গত, তাই বিনয়কে গ্রহণ করার মাধ্যমে এটিকে আলাদা করে অন্তর্ভুক্ত না করে বিনয় সংগ্রহ করা উচিত। অথবা অনেক পরিশ্রম করে অন্যদের যে ধর্মদেশনা প্রদান করা হয় এখানে সেটিকে “সুভাষিত কথা” হিসেবে বোঝা উচিত কি? ধর্মানুকূল দেশে বসবাস করার মতো এটিও এভাবে সত্ত্বগণের ইহ-পর উভয় লোকে হিতসুখ ও নির্বাণ লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে:

“শান্তিময় নির্বাণ লাভের জন্য এবং

দুঃখের অন্তসাধন করার জন্য

বুদ্ধ যে বাক্য ভাষণ করেন,

সেই বাক্যই হচ্ছে উত্তম বাক্য।” (সং.নি.১.২১৩; সু.নি.৪৫৭)

এভাবে এই গাথায় শাস্ত্রজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, সুভাষিত কথা বলা, এই চারটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে, এবং এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“শাস্ত্রজ্ঞান” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘মাতাপিতার সেবাযত্ন করা’ গাথাটির বর্ণনা

৬. এখন **মাতাপিতার সেবাযত্ন করা** এই গাথার প্রতিটি পদই সহজবোধ্য। (তাই এ ব্যাপারে ব্যাখ্যার দরকার নেই।)

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **মাতা** হচ্ছে জননী, **পিতা** হচ্ছে জনক। **সেবাযত্ন করা** মানে হচ্ছে পা ধুয়ে দেওয়া, গা ডলে দেওয়া, স্নান করানো, বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়া, এভাবে উপকার করা। এখানে যেহেতু মাতাপিতা সন্তানদের বহু উপকারী, কল্যাণকামী ও অনুকম্পাকারী, তারা ছেলে বাইরে খেলা করে ধুলোমাখা শরীরে বাড়িতে এসেছে দেখে ধুলো মুছে দিয়ে, মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ও চুমু খেতে খেতে স্নেহ করে থাকে। এমন মাতাপিতাকে সন্তানেরা শত বছর ধরে মাথায় করে ঘুরে বেড়ালেও তাদের প্রতিদান দিতে সক্ষম হয় না। যেহেতু তারা হচ্ছে সন্তানদের প্রতিপালক, ভরণপোষণকারী, এই জগতে ভালো-মন্দের উপদেশদাতা এবং তারা সন্তানদের ব্রহ্মা ও আদিগুরু হিসেবে গণ্য হয়, তাদের সেবাযত্ন করলে তা এই জীবনে প্রশংসা ও পরজন্মে স্বর্গসুখ বয়ে আনে, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়। ভগবান এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

“মাতাপিতাকে ব্রহ্মা ও আদিগুরু বলা হয়,

মাতাপিতা সন্তানদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়,

তাঁরা সন্তানদের প্রতি অনুকম্পাকারী।”

“তাই পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁদের অন্ন-পানীয়,

কাপড় ও বিছানা দিয়ে নমস্কার ও সম্মান করেন।”

“গা ডলে দিয়ে, স্নান করিয়ে ও পা ধুয়ে দিয়ে

মাতাপিতাকে সেবা-পরিচর্যা করলে

পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাকে এই জীবনেই প্রশংসা করেন,

এবং পরে সে স্বর্গে আনন্দিত হয়।” (অ.নি.৩.৩১; ইতিৰু.১০৬; জা.২.২০.১৮১-১৮৩)

অন্য একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এ-রকম: সেবাযত্ন করা মানে হচ্ছে ভরণপোষণ করা, কাজকর্ম করে দেওয়া, কুলবংশের ধারা রক্ষা করা ইত্যাদি পাঁচ প্রকার; সেটি পাপকাজে নিষেধ করা ইত্যাদি পাঁচ প্রকারে এই জন্মের হিতের কারণ হয় বিধায় সেটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। তাই তো ভগবান বলেছেন:

“হে গৃহপতিপুত্র, পাঁচ প্রকারে পূর্বদিকরূপী মাতাপিতাকে পুত্রের সেবা করা উচিত, যেমন: ‘আমি তাদের ভরণপোষণ করব, আমি তাদের যাবতীয় কাজকর্ম করে দেব, আমি তাদের কুলবংশের ধারা রক্ষা করব, আমি উত্তরাধিকারের যত্ন করব, অথবা মৃত কালগত জ্ঞাতিদের উদ্দেশে দান করব।’ হে গৃহপতিপুত্র, পুত্রের দ্বারা এই পাঁচ প্রকারে পূর্বদিকরূপী মাতাপিতা সেবিত হয়ে পুত্রকে পাঁচ প্রকারে অনুকম্পা করে, যেমন: তারা তাকে পাপকাজে বাধা দেয়, কল্যাণ কাজে নিয়োজিত করায়, শিল্পবিদ্যা শেখার সুযোগ করে দেয়, উপযুক্ত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়, যথাসময়ে পুত্রের হাতে উত্তরাধিকার তুলে দেয়।” (দী.নি.৩.২৬৭)

তা ছাড়া, যে ব্যক্তি এই তিন প্রকারে মাতাপিতাকে সেবা করে, যেমন: মাতাপিতার মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়া, মাতাপিতাকে দিয়ে শীল গ্রহণ করানো এবং মাতাপিতাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করানো, এই ধরনের ব্যক্তিই মাতাপিতাকে সেবাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার সেই মাতাপিতার সেবা মাতাপিতার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার হিসেবে এবং এই জন্মে ও পরজন্মে অনেক ধরনের কল্যাণের আশু কারণ হয় বিধায় এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

**স্ত্রী-পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করা**, এখানে নিজের ঔরসজাত পুত্র ও কন্যা উভয়কেই “পুত্র” হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। **স্ত্রী** বলতে বিশ প্রকার স্ত্রীর মধ্যে যেকোনো এক প্রকার স্ত্রী বা পত্নী। আর **সদয় আচরণ করা** মানে হচ্ছে সম্মান দেখানো ইত্যাদির দ্বারা উপকার করা। কাজগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেওয়া ইত্যাদি এই জন্মের হিতের কারণ হয় বিধায় এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। তাই তো ভগবান বলেছেন, “স্ত্রী-পুত্রকে পশ্চিম দিক হিসেবে বুঝতে হবে।” (দী.নি.৩.২৬৬) এখানে উল্লেখিত স্ত্রী-পুত্রকে পত্নী শব্দের দ্বারা এর অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে এভাবে:

“হে গৃহপতিপুত্র, পাঁচ প্রকারে একজন স্বামীর পশ্চিম দিকরূপী পত্নীকে যত্ন করা উচিত, যেমন: সম্মান করার দ্বারা, অবমাননা না করার দ্বারা, ব্যভিচার না করার দ্বারা, কাজে-কর্মে কর্তৃত্ব প্রদানের দ্বারা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অলংকার প্রদানের দ্বারা। হে গৃহপতিপুত্র, এই পাঁচ প্রকারে পশ্চিম দিকরূপী পত্নীকে যত্ন করা হলে সেও পাঁচ প্রকারে স্বামীকে অনুকম্পা করে, যেমন: সে সমস্ত কাজকর্ম সুন্দরভাবে করে দেয়, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, ব্যভিচারিণী হয় না, সম্পত্তি রক্ষা করে এবং সকল কাজে দক্ষ ও উদ্যমী হয়।” (দী.নি.৩.২৬৯)

অথবা আরেক প্রকার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: **সদয় আচরণ করা** মানে হচ্ছে ধর্মসম্মত দান, প্রিয়বাক্য, কল্যাণচর্যার দ্বারা সদয় আচরণ করা। যেমন: উপোসথ দিনে খরচপাতি দেওয়া, উৎসবের দিনে উৎসব দেখাতে নিয়ে যাওয়া, পুণ্যময় দিনে পুণ্য করার সুযোগ দেওয়া, ইহ-পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যথাযথ উপদেশ-অনুশাসন দেওয়া। এটি আগের মতোই এই জন্মে হিতের কারণ হয়, পরজন্মে হিতের কারণ হয় এবং দেবতাদের কাছে নমস্য হওয়ার কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। যেমনটা দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক বলেছেন:

“যে গৃহী উপাসকেরা পুণ্যকর্ম করে, শীলবান হয়,

এবং ধর্মসম্মতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণ করে,

হে মাতলি, তাদের আমি নমস্কার জানাই।” (সং.নি.১.২৬৪)

**নির্দোষ পেশা অবলম্বন করা** মানে হচ্ছে ভালো করে সময় সম্পর্কে জেনে, কাজে দক্ষতা অর্জন করে, অলস না হয়ে, উদ্যমশীল পরিশ্রমী হয়ে ও ক্ষতির মুখোমুখি না হয়ে, অর্থাৎ কালক্ষেপণ, অদক্ষতা, অকর্মণ্যতা, শৈথিল্য ইত্যাদি দোষ-বিরহিত হয়ে কৃষি-গোপালন-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম করা। এসব কাজে নিজেকে বা স্ত্রী-পুত্রকে অথবা দাস-কর্মচারীদের দক্ষতার সঙ্গে নিয়োজিত করলে তা এই জীবনেই ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি ও অর্জনের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন:

“যে ব্যক্তি কাজে দক্ষ, হাল ছেড়ে দেয় না,

ও প্রচুর পরিশ্রম করে, সে-ই ধন লাভ করে।”

(সু.নি.১৮৯; সং.নি.১.২৪৬)

“যারা দেরি করে ঘুমোতে যায়,

এখনো ভোর হয়নি দেখে ঘুম থেকে ওঠে না,

এবং সব সময় মাতাল হয়ে থাকে,

তারা গৃহে বাস করতে পারে না।”

“যারা অতিরিক্ত শীত, অতিরিক্ত গরম,

আর সময় নেই বলে কাজকর্ম ছেড়ে দেয়,

হে যুবক, তাদের কোনো উন্নতি হয় না।”

“এখানে যে ব্যক্তি শীত ও গরমকে

তৃণের চাইতে বেশি কিছু মনে করে না,

এবং কঠোর পরিশ্রম করে,

সে-ই সুখ হতে বঞ্চিত হয় না।” (দী.নি.৩.২৫৩)

“যে ব্যক্তি বিচর‌ণরত মৌমাছির মতো

কাউকে কষ্ট না দিয়ে ভোগসম্পত্তি সঞ্চয় করে,

তার ভোগসম্পত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পায়

উইঢিবির মাটি জমা হওয়ার মতো।” (দী.নি.৩.২৬৫) এভাবে ইত্যাদি।

এভাবে এই গাথায় মাতাকে সেবাযত্ন করা, পিতাকে সেবাযত্ন করা, স্ত্রীপুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করা ও নির্দোষ পেশা অবলম্বন করা, এই চারটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে, “স্ত্রীপুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করা” এটিকে দুটি মঙ্গল হিসেবে ধরলে মোট পাঁচটি মঙ্গল, অথবা “মাতাপিতার সেবাযত্ন করা” এটিকে মাত্র একটি মঙ্গল হিসেবে ধরলে মোট তিনটি মঙ্গল। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“মাতাপিতার সেবাযত্ন করা” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘দান দেওয়া’ গাথাটির বর্ণনা

৭. এখন “**দান দেওয়া**”এই গাথাটিতে **দান দেওয়া** মানে হচ্ছে নিজের কোনো জিনিস অন্যকে দেওয়া, অর্পণ করা। **ধর্মচর্চা করা** মানে হচ্ছে ধর্মকে চর্চা করা, অথবা ধর্ম হতে বিচ্যুত না হয়ে চর্চা করা। **জ্ঞাতি** মানে হচ্ছে যাদের আপন ভাবা যায়। **নির্দোষ** মানে হচ্ছে দোষ-বিরহিত, অর্থাৎ এর দ্বারা অনিন্দিত ও অগর্হিত বুঝানো হয়েছে। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এই হচ্ছে পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **দান** হচ্ছে পরের উদ্দেশ্যে অন্ন ইত্যাদি দশ প্রকার দানীয় বস্তু ত্যাগের সুবুদ্ধিজাত চেতনা বা তৎসংযুক্ত অলোভ। অলোভের দ্বারাই সেই বস্তুটি অন্যকে দেওয়া হয়। তাই বলা হয়েছে, “নিজের জিনিস অন্যকে দেওয়াই হচ্ছে দান।” এটি বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি এই জন্মে এবং পরজন্মে বিশেষ সুফল লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে “হে সিংহ, দানপতি দায়ক বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়” এভাবে ইত্যাদি সূত্রগুলো (অ.নি.৫.৩৪) স্মরণ করা উচিত।

আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: দান দুই প্রকার; যথা: আমিষ-দান ও ধর্মদান। এখানে আমিষ-দানকে পূর্বোক্ত নিয়মেই বুঝতে হবে। আর ইহলোক ও পরলোকে দুঃখক্ষয় করে এবং সুখ বয়ে আনে এমন সম্যকসম্বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মকে অন্যদের হিতকামী হয়ে দেশনা করাটাই হচ্ছে ধর্মদান। এই দুই প্রকার দানের মধ্যে ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ। যেমন বলা হয়েছে:

“ধর্মদান সকল দানকে জয় করে,

ধর্মরস সকল রস বা স্বাদকে জয় করে।

ধর্মানন্দ সকল আনন্দকে জয় করে,

আর তৃষ্ণাক্ষয় সকল দুঃখকে জয় করে।” (ধ.প.৩৫৪)

এখানে আমিষ-দানের ফলে যে মঙ্গল হয় তা বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মদান যেহেতু অর্থকে ঠিকমতো বোঝা ইত্যাদি গুণগুলোর কাছাকাছি কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ভগবান বলেছেন:

“হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু যেভাবে ধর্ম শুনেছে এবং যেভাবে ধর্ম শিক্ষা করেছে, তা সে বিস্তারিতভাবে অন্যদের দেশনা করে এবং সে সেই ধর্মের অর্থকে সেভাবেই বোঝে, সেভাবেই ধর্মকে বোঝে” এভাবে ইত্যাদি। (দী.নি.৩.৩৫৫; অ.নি.৫.২৬)

**ধর্মচর্চা** মানে হচ্ছে দশ কুশল কর্মপথ চর্চা করা। যেমন বলা হয়েছে, “হে গৃহপতিগণ, সে তিন প্রকারে কায়িকভাবে ধর্মচর্চা করে, সমচর্চা করে” এভাবে ইত্যাদি। সেই ধর্মচর্চা স্বর্গলোকে জন্মানোর হেতু হয় বিধায় “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। তাই তো ভগবান বলেছেন, “হে গৃহপতিগণ, ধর্মচর্চা ও সমচর্চা করার ফলে এই জগতে কোনো কোনো সত্ত্ব দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে।” (ম.নি.১.৪৪১)

**জ্ঞাতি** মানে হচ্ছে মায়ের দিক থেকে কিংবা বাবার দিক থেকে সাত পুরুষ পর্যন্ত রক্তের সম্পর্ক থাকা। তারা যখন সম্পত্তিহানির শিকার হয় বা মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন নিজের কাছে আসলে ভাত-কাপড়সহ ধন-সম্পত্তি বিভিন্ন কিছু দিয়ে সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করা, এটি এই জীবনে প্রশংসা ইত্যাদি এবং পরজন্মে সুগতিতে গমন ইত্যাদি বিশেষ সুফল লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

**নির্দোষ কর্ম** মানে হচ্ছে উপোসথশীল গ্রহণ, সেবা-সম্মান করা, উদ্যান নির্মাণ করা, বনায়ন করা, সেতু-ব্রীজ নির্মাণ করা ইত্যাদিসহ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সুচরিত কর্মগুলো। সেগুলো নানা প্রকার হিতসুখ লাভের কারণ হয়, তাই সেগুলোকে “মঙ্গল” বলা হয়। এ ক্ষেত্রে “হে বিশাখা, এমনটি হওয়া সম্ভব যে, এখানে কোনো কোনো নারী কিংবা পুরুষ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথশীল পালন করে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক দেবতাদের মাঝে উৎপন্ন হবে” এভাবে ইত্যাদি সূত্রগুলো (অ.নি.৮.৪৩) স্মরণ করা উচিত।

এভাবে এই গাথায় দান দেওয়া, ধর্মচর্চা করা, জ্ঞাতিদের সাহায্য করা, নির্দোষ কর্ম সম্পাদন করা, এই চারটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“দান দেওয়া” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘পাপকাজে আনন্দ না পাওয়া’ গাথাটির বর্ণনা

৮. এখন “**পাপকাজে আনন্দ না পাওয়া, পাপকাজ হতে বিরত থাকা**” এই গাথাটিতে **আনন্দ না পাওয়া** মানে হচ্ছে রমিত না হওয়া। **বিরত থাকা** মানে হচ্ছে সংযত থাকা, অর্থাৎ সত্ত্বগণ এর দ্বারা সংযত থাকে এই অর্থে বিরত থাকা। **পাপ** মানে হচ্ছে অকুশল। মাদকতার সৃষ্টি করে অর্থে মদ্য, মদ্য পান করা হচ্ছে মদ্যপান, সেই **মদ্যপান হতে**। নিবৃত্ত থাকাই হচ্ছে **সংযত থাকা**। **অপ্রমত্ত থাকা** মানে হচ্ছে সাবধান বা সতর্ক থাকা। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এই হচ্ছে এর পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **আনন্দ না পাওয়া** হচ্ছে এর বিপদ দেখতে পাওয়ায় মনে মনে খুশি না হওয়া। **বিরত থাকা** মানে হচ্ছে কর্ম ও দ্বারের ভিত্তিতে কায়িক ও বাচনিক পাপ হতে বিরত থাকা। সেই বিরতি আবার তিন প্রকার, যথা: সম্প্রাপ্ত-বিরতি, সমাদান-বিরতি ও সমুচ্ছেদ-বিরতি। এখানে একজন কুলপুত্র যে নিজের জাতি বা কুল অথবা গোত্রের কথা ভেবে “আমি যে এই প্রাণীটিকে হত্যা করব, আমি যে চুরি করব, এটি করা আমার পক্ষে ঠিক মাননসই নয়” ইত্যাদি প্রকারে প্রাপ্ত বিষয়ের কথা ভেবে বিরত থাকে, এটিই হচ্ছে **সম্প্রাপ্ত-বিরতি**। শিক্ষাপদ বা শীল গ্রহণের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয় সেটি হচ্ছে **সমাদান-বিরতি**। এই বিরতি উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে একজন কুলপুত্র প্রাণিহত্যা ইত্যাদি পাপকাজ আর করে না। আর্যমার্গের সঙ্গে সম্পর্কিত বিরতিই হচ্ছে **সমুচ্ছেদ-বিরতি**। এই বিরতি উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে একজন আর্যশ্রাবকের পঞ্চ ভয় ও পঞ্চ বৈরী চিরতরে প্রশমিত হয়। আর **পাপ** হচ্ছে তা-ই যা “হে গৃহপতিপুত্র, প্রাণিহত্যা হচ্ছে কর্মকলুষতা, অদত্তগ্রহণ... কামে মিথ্যাচার.. মিথ্যাকথা হচ্ছে কর্মকলুষতা” এভাবে বিস্তারিত করে—

“প্রাণিহত্যা, অদত্তগ্রহণ, মিথ্যাকথা এবং পরদারগমন,

পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এগুলো প্রশংসা করেন না।” (দী.নি.৩.২৪৫)

এভাবে গাথার অন্তর্গত কর্মকলুষতা নামক চার প্রকার অকুশল। সেইসব পাপকাজ হতে বিরত থাকা। এইসব পাপকাজে আনন্দ না পাওয়া এবং এইসব পাপকাজ হতে বিরত থাকা, এগুলো এই জন্ম ও পরজন্মের ভয় ও বৈরীকে পরিত্যাগ ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ লাভের কারণ হয়, তাই এগুলোকে “মঙ্গল” বলা হয়। এ ক্ষেত্রে “হে গৃহপতিপুত্র, একজন আর্যশ্রাবক প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকে” ইত্যাদি সূত্রগুলো স্মরণ করা উচিত।

**মদ্যপান হতে সংযত থাকা** এটি পূর্বোক্ত সুরা, আসব, মদ ও প্রমাদের কারণ হতে বিরত থাকারই নামান্তর। যেহেতু একজন মদ্যপায়ী অর্থ জানে না, ধর্ম জানে না, মায়ের অন্তরায় করে, পিতা, বুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ ও তথাগত-শ্রাবকের অন্তরায় করে, সে এই জন্মেই নিন্দার শিকার হয় এবং পরজন্মে দুর্গতিতে গমন করে, এবং জন্মজন্মান্তরে উন্মাদগ্রস্ত হয়। কিন্তু যারা মদ্যপান হতে বিরত থাকে তারা সেসব দোষের উপশম ও তদ্বিপরীত গুণসম্পদ লাভ করে। তাই এই মদ্যপান হতে সংযত থাকাকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

**কুশলধর্মে অপ্রমত্ত থাকা** মানে হচ্ছে “কুশল-ধর্মগুলোকে গড়ে তোলার জন্য মনোযোগ না দেওয়া, উদ্যমী না হওয়া, যত্নশীল না হওয়া, লেগে না থাকা, ইচ্ছা ত্যাগ করা, হাল ছেড়ে দেওয়া, বারবার চর্চা না করা, চেষ্টা না করা, বারবার চেষ্টা না করা, অধিষ্ঠান না করা, আত্মনিয়োগ না করা, অসতর্ক হওয়া। যা এই ধরনের প্রমাদ, প্রমাদকরণ ও প্রমত্তভাব, একেই বলা হয় প্রমাদ।” (ৰিভ.৮৪৬) অর্থগতভাবে এখানে বর্ণিত প্রমাদের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ কুশল-ধর্মগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিকে বুঝতে হবে। এটি নানা প্রকার কুশল লাভের হেতু হয় এবং অমৃত নির্বাণ লাভের হেতু হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়। এ ক্ষেত্রে “যে অপ্রমত্ত ও উদ্যমশীল তার” (ম.নি.২.১৮-১৯; অ.নি.৫.২৬) এবং “অপ্রমাদ অমৃতের পথ” (ধ.প.২১) এভাবে ইত্যাদি শাস্তার উপদেশগুলোকে স্মরণ করা উচিত।

এভাবে এই গাথায় পাপকাজ হতে বিরতি, মদ্যপান হতে সংযম, কুশল-ধর্মগুলোতে অপ্রমাদ, এই তিনটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“পাপকাজে আনন্দ না পাওয়া” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘গৌরব প্রদর্শন করা’ গাথাটির বর্ণনা

৯. এখন “**গৌরব প্রদর্শন করা**” এই গাথাটিতে **গৌরব** মানে হচ্ছে গারবতা বা সম্মান। **ভদ্র ব্যবহার** মানে হচ্ছে অহংকারহীন ব্যবহার। **কৃতজ্ঞ হওয়া** মানে হচ্ছে কৃত উপকারকে জানা। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এই হচ্ছে এর পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **গৌরব প্রদর্শন করা** মানে হচ্ছে বুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ, তথাগতের শিষ্য, আচার্য, উপাধ্যায়, মাতাপিতা, বড়ভাই, বড়বোন ইত্যাদি গৌরব করার যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি যথোপযুক্ত গৌবর প্রদর্শন করা, মর্যাদা দেওয়া, সম্মান দেখানো। কারণ, এই জাতীয় গৌরব সুগতিতে গমন ইত্যাদির হেতু হয়। যেমন বলা হয়েছে:

“যে গৌরব করার যোগ্য ব্যক্তিকে গৌরব দেখায়, মান্য ব্যক্তিকে মান দেয়, পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করে। সেই কর্মের দ্বারা সে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সে যদি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর... উৎপন্ন না হয়, যদি মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে যেখানেই জন্মায় উচ্চকুলীন হয়।” (ম.নি.৩.২৯৫)

যেমন আরো বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, এই সাতটি বিষয় অপরিহানীয় ধর্ম। কোনো সাতটি? শাস্তার প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা” ইত্যাদি। (অ.নি.৭.৩২-৩৩) তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

**ভদ্র ব্যবহার করা** মানে হচ্ছে নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে ভদ্র ব্যবহার করা, যেই ভদ্র ব্যবহারের অধিকারী ব্যক্তি মানহীন, দর্পহীন, পাপোশতুল্য, শিংভাঙা ষাঁড়তুল্য ও দাঁত-তোলা সাপতুল্য হয়ে শান্ত, ভদ্র ও নম্রভাষী হয়, একেই বলে ভদ্র ব্যবহার। এটি যশখ্যাতি ইত্যাদি গুণ অর্জনের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়। আরো বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি ভদ্র ব্যবহার করে, নমনীয় মনোভাবসম্পন্ন হয়, সে যশখ্যাতির অধিকারী হয়” ইত্যাদি। (দী.নি.৩.২৭৩)

**সন্তুষ্টি** হচ্ছে ভালো-মন্দ ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীতে সন্তুষ্ট থাকা। সন্তুষ্টি বারো প্রকার; যেমন: চীবরে যথালাভে সন্তুষ্টি, যথাসাধ্য সন্তুষ্টি ও যথোপযুক্ত সন্তুষ্টি। ভিক্ষান্ন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই।

এগুলোর বিশদ বর্ণনা হচ্ছে এই: ধরা যাক, এখানে কোনো ভিক্ষু একটি চীবর পেল, সেটি হতে পারে সুন্দর কিংবা অসুন্দর, সেটি পরেই সে জীবনযাপন করে, অন্য কোনো চীবর সে আশা করে না, পেলেও সেটি সে গ্রহণ করে না, এটিই হচ্ছে চীবরে **যথালাভে সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, লম্বা চীবর পরতে গিয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল অথবা পরতে কষ্ট হতে লাগল, তখন সমজাতীয় ভিক্ষুর সঙ্গে সেটি বদল করে ছোটো চীবর পরে জীবনযাপন করলেও সে সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে চীবরে **যথাসাধ্য সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, অন্য এক ভিক্ষু উন্নত উন্নত ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী দান পায়, সে রেশমি চীবর ইত্যাদির মধ্যে উন্নতমানের একটি চীবর পেয়ে “এটি স্থবির, দীর্ঘপ্রব্রজিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুদেরই বেশি মানাবে” ভেবে তাদের দান দিয়ে, নিজে আবর্জনা-স্তূপ বা অন্য কোথাও থেকে ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে এনে সঙ্ঘাটি বা দোয়াজিক বানিয়ে ধারণ করলেও সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে চীবরে **যথোপযুক্ত সন্তুষ্টি**।

এরপর ধরা যাক, এখানে কোনো ভিক্ষু ভিক্ষান্ন পেল, সেটি হতে পারে ভালো কিংবা নিকৃষ্ট মানের, তা দিয়েই সে জীবনযাপন করে, অন্য কোনো ভিক্ষান্ন পাওয়ার আশা করে না, পেলেও গ্রহণ করে না, এটিই হচ্ছে ভিক্ষান্নে **যথালাভে সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, নিকৃষ্ট ভিক্ষান্ন খেয়ে তার রোগ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করল, তখন সে সমজাতীয় ভিক্ষুকে তা দিয়ে তার হাত থেকে ঘি-মধু-দুধ ইত্যাদি ভোজন করে শ্রমণধর্ম পালন করলেও সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে ভিক্ষান্নে **যথাসাধ্য সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, অন্য এক ভিক্ষু ভালো ভালো ভিক্ষান্ন পেল, তখন সে “এই ভিক্ষান্ন যারা স্থবির ও দীর্ঘপ্রব্রজিত এবং অন্য যেই সতীর্থ ভিক্ষুরা ভালো ভালো ভিক্ষান্ন খেতে পাচ্ছে না তাদের জন্যই বেশি উপযোগী” এই ভেবে তাদের দান করে, নিজে পিণ্ডচারণ করে ভালো-মন্দ মিলিয়ে ভোজন করলেও সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে ভিক্ষান্নে **যথোপযুক্ত সন্তুষ্টি**।

এরপর ধরা যাক, এখানে কোনো ভিক্ষু একটি বাড়ি পেল, সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, পুনরায় এর চেয়ে সুন্দর অন্য কোনো বাড়ি পেলেও সে গ্রহণ করে না, এটিই হচ্ছে বাসস্থানে **যথালাভে সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, ঠিকমতো বায়ু চলাচল করতে পারে না এমন বাড়িতে বাস করায় সে পিত্তরোগ ইত্যাদিতে আরো বেশি আক্রান্ত হতে লাগল, তখন সে সমজাতীয় ভিক্ষুকে সেটি দিয়ে তার পাওয়া, বায়ু চলাচল করতে পারে এমন শীতল বাড়িতে বাস করে শ্রমণধর্ম পালন করলেও সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে বাসস্থানে **যথাসাধ্য সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, অন্য এক ভিক্ষু সুন্দর একটি বাড়ি পেয়েও গ্রহণ করল না। সে ভাবল, “সুন্দর বাড়ি হচ্ছে প্রমাদের কারণ, সেখানে বসে থাকলে দেহ-মনে আলস্য-তন্দ্রা জেঁকে ধরে, ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মনে কামচিন্তা উৎপন্ন হয়।” তাই সে সেটি প্রত্যাখ্যান করে খোলা আকাশের নিচে, বা কোনো গাছের গোড়ায়, অথবা কোনো পর্ণকুটিরে, যেকোনো জায়গায় বাস করলেও সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে বাসস্থানে **যথোপযুক্ত সন্তুষ্টি**।

এরপর ধরা যাক, এখানে কোনো ভিক্ষু ওষুধপত্র পেল, সেটি হতে পারে কোনো হরীতকী কিংবা আমলকী, তা-ই দিয়েই সে জীবনযাপন করে, অন্যরা ঘি-মধু-গুড় ইত্যাদি পেলেও সে তা পাওয়ার আশা করে না, পেলেও গ্রহণ করে না, এটিই হচ্ছে ওষুধপত্রে **যথালাভে সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন তার দরকার তেলের, অথচ পেল গুড়, তখন সে তা সমজাতীয় ভিক্ষুকে দিয়ে তার হাত থেকে তেল নিয়ে ওষুধ বানিয়ে শ্রমণধর্ম পালন করলেও সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে ওষুধপত্রে **যথাসাধ্য সন্তুষ্টি**। এরপর ধরা যাক, অন্য এক ভিক্ষু, একটি পাত্রে পচা মূত্র ও হরীতকী রেখে এবং আরেকটি পাত্রে চতুর্মধু রেখে তাকে যদি বলা হয়—“ভন্তে, আপনার যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন” এবং সেই দুটোর যেকোনো একটি দিয়েই যদি রোগ ভালো হয়ে যায়, তখন সে ভাবে—“পচা মূত্র ও হরীতকীকে বুদ্ধ ইত্যাদি মহান ব্যক্তিরা প্রশংসা করেছেন, পচা মূত্ররূপ ওষুধের ওপর নির্ভর করেই এই প্রব্রজ্যা, এতেই তোমার আজীবন উৎসাহ বজায় রাখা উচিত” (মহাৰ.১২৮) বলা হয়েছে। এভাবে ভাবার পর সে চতুর্মধুরূপ ওষুধ প্রত্যাখ্যান করে, মূত্র ও হরীতকীরূপ ওষুধ খেয়েই পরম সন্তুষ্ট থাকে, এটিই হচ্ছে ওষুধপত্রে **যথোপযুক্ত সন্তুষ্টি**।

এভাবে উপরোক্ত সব ধরনের সন্তুষ্টিকেই সন্তুষ্টি বলা হয়। এই সন্তুষ্টি অতি ইচ্ছা, পাপেচ্ছা ও মাত্রাতিরিক্ত ইচ্ছা ইত্যাদি পাপধর্মগুলো পরিত্যাগের কারণ হয়, বিশেষ কিছু লাভের কারণ হয়, সুগতির কারণ হয় ও আর্যমার্গ লাভের উপকরণ হয়, চতুর্দিকে ইত্যাদি ভাব অর্জনের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

“চতুর্দিকে বিরোধহীন হয়ে,

ভালো-মন্দ সবকিছুতে সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে” (সু.নি.৪২; চূল়নি. খগ্গ-ৰিসাণসুত্তনিদ্দেস ১২৮) এভাবে ইত্যাদি।

**কৃতজ্ঞ হওয়া** মানে হচ্ছে অল্প হোক বা বেশি হোক, কেউ কোনো উপকার করলে সেটি বারবার স্মরণ করে জানা, অবগত হওয়া। তা ছাড়া, নিরয় ইত্যাদি দুঃখ হতে পরিত্রাণ করায় বলে পুণ্যও প্রাণীদের বহু উপকার করে, তাই সেগুলোর উপকারের কথা স্মরণ করাকেও “কৃতজ্ঞ হওয়া” বুঝতে হবে। এটি সৎপুরুষদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ কিছু লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, জগতে দুই প্রকার ব্যক্তি দুর্লভ। কোন দুই প্রকার? যে আগে উপকার করে এবং যে কৃতজ্ঞ হয় ও উপকারের কথা প্রকাশ করে।” (অ.নি.২.১২০)

**যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা** মানে হচ্ছে যখন চিত্ত চঞ্চল হয়, বা কামচিন্তা ইত্যাদির কোনো একটির দ্বারা চিত্ত অভিভূত হয়, তখন সেগুলোকে দূর করার জন্যই ধর্মশ্রবণ করা। কেউ কেউ বলেন যে, প্রতি পাঁচ দিন অন্তর অন্তর ধর্মশ্রবণ করাই হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ যেমনটি বলেছেন, “ভন্তে, আমরা সবাই প্রতি পাঁচ দিনে একবার সারা রাত ধরে ধর্মালোচনা করে বসে থাকি।” (ম.নি.১.৩২৭; মহাৰ.৪৬৬)

তা ছাড়া, নিজের মনের সংশয় দূরকারী ধর্মকথা শোনার জন্য যখনই কোনো কল্যাণমিত্রের কাছে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়, তখন ধর্মশ্রবণ করাকেও “যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা” বুঝতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, “সে মাঝেমধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, জানতে চায়” ইত্যাদি (দী.নি.৩.৩৫৮) যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করলে এটি আবরণ পরিত্যাগ, চারটি সুফল লাভ, আসবক্ষয় ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ কিছু লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। তাই তো বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, যেই সময়ে একজন আর্যশ্রাবক মনোযোগ দিয়ে, চেতনাকে পুরোপুরি সংহত করে, কান খাড়া করে ধর্ম শোনে, সেই সময় তার পাঁচটি আবরণ উৎপন্ন হয় না।” (সং.নি.৫.২১৯) এবং

“যারা মনোযোগ সহকারে বারবার ধর্মকথা শোনে,... প্রজ্ঞা দিয়ে ভেদ করে দেখে তারা চারটি সুফল আশা করতে পারে।” (অ.নি.৪.১৯১) এবং

“হে ভিক্ষুগণ, এই চারটি বিষয়কে সময়ে সময়ে সঠিকভাবে গড়ে তুললে এবং বারবার সম্পাদন করলে সেগুলো ক্রমান্বয়ে আসবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। কোন চারটি বিষয়? যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা” এভাবে ইত্যাদি। (অ.নি.১৪৭)

এভাবে এই গাথায় গৌরব প্রদর্শন করা, ভদ্র ব্যবহার করা, সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞ হওয়া, যথাসময়ে ধর্মশ্রবণ করা, এই পাঁচটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“গৌরব প্রদর্শন করা” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘সহিষ্ণু হওয়া’ গাথাটির বর্ণনা

১০. এখন “**সহিষ্ণু হওয়া**” এই গাথাটিতে সহিষ্ণু হওয়া মানে হচ্ছে সহ্য করা। কলুষতাগুলো শমিত বা শান্ত হয়েছে বিধায় **শ্রমণ**। ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনাই হচ্ছে **ধর্মালোচনা**। আর বাকিগুলো পূর্ববৎ। এই হচ্ছে এর পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **সহিষ্ণুতা** মানে হচ্ছে সহনশীলতা। যেই সহিষ্ণুতার অধিকারী একজন ভিক্ষু দশ প্রকার আক্রোশ বাক্যের দ্বারা গালিগালাজ করলে, অথবা হত্যা, আটক ইত্যাদির দ্বারা কষ্ট দিলেও তাদের প্রতি শুনেও না-শোনার মতো ও দেখেও না-দেখার মতো ভাবলেশহীন নির্বিকার থাকে, ক্ষান্তিবাদীর মতো। যেমন বলা হয়েছে:

“বহুকাল আগে এক ক্ষান্তিবাদী শ্রমণ ছিল।

সেই ক্ষান্তিতে স্থিত শ্রমণকে কাশিরাজা হত্যা করেছিল।”

(জা.১.৪.৫১)

অথবা, তার অধিক অপরাধ না করায় ভদ্রভাবে মনোনিবেশকারী আয়ুষ্মান পূর্ণ স্থবিরের ন্যায়। যেমন বলা হয়েছে:

“ভন্তে, সুনাপরন্তবাসী মানুষেরা যদি আমায় আক্রোশ করে, দুর্ব্যবহার করে, তখন আমি ভাবব যে, ‘আহা, এই সুনাপরন্তবাসী মানুষেরা বড়োই ভদ্র, আহা, এই সুনাপরন্তবাসী মানুষেরা বড়োই সুভদ্র, কারণ তারা আমায় হাত দিয়ে প্রহার করছে না” ইত্যাদি। (ম.নি.৩.৩৯৬; সং.নি.৪.৮৮)

যেটির অধিকারী হলে সে ঋষিদের কাছে প্রশংসনীয় হয়। সরভঙ্গ ঋষি যেমনটা বলেছেন:

“ক্রোধকে হত্যা করে কখনো শোক করে না,

ঘৃণা-পরিত্যাগকে ঋষিগণ প্রশংসা করেন।

সব ধরনের কর্কশ বাক্যকে সহ্য করো,

পণ্ডিতেরা এই ধরনের ক্ষান্তিকেই উত্তম বলে থাকেন।”

(জা.২.১৭.৬৪)

সে দেবতাদের কাছেও প্রশংসনীয় হয়। দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক যেমনটা বলেছেন:

“যে বলবান হয়েও শান্ত থাকে, দুর্বলকেও সহ্য করে,

এবং দুর্বলকে সব সময় ক্ষমা করে,

সেটিকেই পরম ক্ষান্তি বলা হয়।” (সং.নি.১.২৫০-২৫১)

সে বুদ্ধগণের কাছে প্রশংসনীয় হয়। ভগবান যেমনটি বলেছেন:

“যিনি আক্রোশ, বধ ও বন্ধনকে নির্দোষচিত্তে সহ্য করেন,

তিনিই ক্ষান্তিবল ও শ্রেষ্ঠবলের অধিকারী হন।

হে ব্রাহ্মণ, তাঁকেই আমি ‘ব্রাহ্মণ’ বলি।” (ধ.প.৩৯৯)

এই ক্ষান্তি বা সহিষ্ণুতা এখানে উপরোক্ত ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের গুণ লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

**সুবাধ্য হওয়া** মানে হচ্ছে কেউ ধর্মত উপায়ে কোনো কথা বললে তার সেই কথা বিনা প্রতিবাদে বা নিরবে অথবা দোষ-গুণ কিছুই না ভেবে এবং অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা, গৌরব ও ভদ্রতার বশে “সাধু” বলে মেনে নেওয়া। এটি সতীর্থ ব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে উপদেশ ও অনুশাসন লাভের কারণ হয় এবং বিদ্বেষ-পরিত্যাগের গুণ লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

**শ্রমণদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা** মানে হচ্ছে সেসব প্রব্রজিতের কলুষতাগুলো প্রশমিত হয়েছে, যারা কায়-বাক্য-চিত্তে ভাবিতপ্রাজ্ঞ ও উত্তম দমগুণ ও শমথের অধিকারী, তাদের কাছে উপস্থিত হওয়া, তাদের সেবাযত্ন করা, তাদের কথা স্মরণ করা ও তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, এসব কিছুকেই “দেখাসাক্ষাৎ” বলা হয়। এটিকেও “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে। কেন? কারণ, এর দ্বারা বহু উপকার হয়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, সেইসব ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলে বহু উপকার হয়, আমি বলি” ইত্যাদি (ইতিৰু.১০৪) শীলবান ভিক্ষুরা যখন বাড়ির সামনে উপস্থিত হয় তখন যদি দান দেওয়ার মতো কিছু থাকে তা হলে একজন কুলপুত্রের উচিত তাদের সাধ্যমতো দান দিয়ে সম্মান দেখানো। আর যদি দান দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে তা হলে পঞ্চাঙ্গ বন্দনা নিবেদন করা উচিত। তাও সম্ভব না হলে দুহাত জোড় করে প্রণাম জানানো উচিত। তাও যদি সম্ভব না হয় তখন শুধু প্রসন্নচিত্তে প্রিয়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত। এভাবে দর্শনমূলক পুণ্যের ফলে বহু হাজার জন্ম ধরে তার চক্ষুরোগ হয় না, চোখ জ্বালা করে না, চোখ ফোলে না বা চোখে ফোস্কা হয় না। রত্নবিমানে মণিময় খোলা দরজার কবাটের মতো তার চোখগুলো একদম স্বচ্ছ ও পঞ্চবর্ণে উজ্জ্বল হয় এবং সে লক্ষকল্প ধরে দেবতা ও মানুষদের মাঝে সর্বসম্পত্তি লাভ করে থাকে। একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ সঠিক উপায়ে শ্রমণদর্শন-জনিত পুণ্যের ফলে এই বিপাক-সম্পত্তি ভোগ করবে, এতে আশ্চর্য হওয়া কী আছে, যেখানে একটি ইতর প্রাণীও শুধু শ্রদ্ধার বশে শ্রমণকে দর্শন করার ফলে এই ধরনের বিপাক-সম্পত্তি লাভ করেছিল বলা হয়েছে। যেমন:

“বেদিয়ক পর্বতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী

গোলগাল চোখওয়ালা একটি পেঁচা আছে।

আহা, এই পেঁচা সুখী সুখী ভাব নিয়ে

যথাসময়ে জেগে ‍ওঠা বুদ্ধশ্রেষ্ঠকে দর্শন করেছে।”

“আমার ও অনুত্তর ভিক্ষুসংঘের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করে

সেও লক্ষকল্প ধরে দুর্গতিতে গমন করবে না।”

“দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে কুশলকর্মের প্রভাবে সে

ভবিষ্যতে ‘সোমনস্স’ নামে বিখ্যাত ও অনন্তজ্ঞানী হবে।”

(ম.নি.অট্ঠ.১.১৪৪; খু.পা.অট্ঠ.৫.১০)

**যথাসময়ে ধর্মালোচনা করা** মানে হচ্ছে সকালে কিংবা সন্ধ্যায় দুজন সূত্রধর ভিক্ষু পরস্পর সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে, বিনয়ধর ভিক্ষুরা বিনয় সম্বন্ধে, আভিধার্মিকরা অভিধর্ম সম্বন্ধে, জাতক আবৃত্তিকারীরা জাতক সম্বন্ধে, অর্থকথাধররা অর্থকথা সম্বন্ধে আলোচনা করে, অথবা তারা আলস্য ও চঞ্চলতাকে দূর করার জন্য এবং সন্দেহগ্রস্ত চিত্তকে বিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করে, এটিই হচ্ছে যথাসময়ে ধর্মালোচনা করা। এটি ধর্ম বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি গুণ অর্জনের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়।

এভাবে এই গাথায় সহিষ্ণুতা, সুবাধ্যতা, শ্রমণদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা ও যথাসময়ে ধর্মালোচনা করা, এই চারটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“সহিষ্ণু হওয়া” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘তপস্যা করা’ গাথাটির বর্ণনা

১১. এখন “**তপস্যা করা**” এই গাথাটিতে পাপ অকুশল ধর্মগুলোকে পুড়িয়ে ফেলে এই অর্থে **তপস্যা**। ব্রহ্মার চর্যা বা ব্রহ্মাদের চর্যা এই অর্থে **ব্রহ্মচর্যা**, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চর্যা বলা হয়েছে। আর্যসত্যগুলোকে দর্শন করাই হচ্ছে **আর্যসত্য দর্শন**। বাণ হতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে বিধায় নির্বাণ, সেই নির্বাণকে সাক্ষাৎ করাই হচ্ছে **নির্বাণ সাক্ষাৎ করা**। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এই হচ্ছে এর পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **তপস্যা** মানে হচ্ছে যা লালসা, মনঃকষ্ট ইত্যাদিকে পুড়িয়ে ফেলে, এটি ইন্দ্রিয়-সংবরণ, অথবা যা আলস্যকে পুড়িয়ে ফেলে, এটি উদ্যম। এগুলোর অধিকারী ব্যক্তিকেই “উদ্যমী” বলা হয়। এটি লালসা ইত্যাদির পরিত্যাগ এবং ধ্যান ইত্যাদি লাভের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

**ব্রহ্মচর্য** হচ্ছে মৈথুন হতে বিরতি, এটি শ্রমণধর্ম, শাসন ও মার্গেরই নামান্তর। যেমন: “অব্রহ্মচর্য পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হয়” (দী.নি.১.১৯৪; ম.নি.১.২৯২) এভাবে ইত্যাদিতে মৈথুন হতে বিরতিকেই ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। “হে বন্ধু, আমরা ভগবানের কাছেই ব্রহ্মচর্য পালন করছি” এভাবে ইত্যাদিতে (ম.নি.১.২৫৭) শ্রমণধর্মকেই ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। “হে পাপমতি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিনির্বাণ লাভ করব না যতক্ষণ আমার এই ব্রহ্মচর্য ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ ও বহুজনের কাছে বিস্তৃত হবে না” এভাবে ইত্যাদিতে (দী.নি.২.১৬৮; সং.নি.৫.৮২২; উদা.৫১) শাসনকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। “হে ভিক্ষু, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, যেমন: সম্যক দৃষ্টি” এভাবে ইত্যাদিতে (সং.নি.৫.৬) মার্গকেই ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে আর্যসত্য দর্শনের দ্বারা মার্গকে গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় বাকি সবকটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি উপর্যুপরি নানা প্রকার বিশেষ কিছু অর্জনের কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

**আর্যসত্য দর্শন করা** মানে হচ্ছে কুমার-প্রশ্নে বর্ণিত চার আর্যসত্যকে উপলব্ধি করার ভিত্তিতে মার্গদর্শন করা। এটি সংসারদুঃখ অতিক্রম করার কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” বলা হয়েছে।

**নির্বাণ সাক্ষাৎ করা** মানে এখানে অর্হত্ত্বফল নামক নির্বাণই অভিপ্রেত। এটি পঞ্চগতিবাণের দ্বারা বাণ নামক তৃষ্ণাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাই এটিকে “নির্বাণ” বলা হয়েছে। এটি লাভ করা বা পর্যবেক্ষণ করাকেই “সাক্ষাৎ করা” বলা হয়েছে। এভাবে এই নির্বাণ সাক্ষাৎ করাটা এই জীবনে সুখে বাস করা ইত্যাদির কারণ হয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

এভাবে এই গাথায়ও তপস্যা করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা, আর্যসত্য দর্শন করা ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করা, এই চারটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“তপস্যা করা” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘যাঁর চিত্ত অষ্ট লোকধর্মে’ গাথাটির বর্ণনা

১২. এখন “**যাঁর চিত্ত অষ্ট লোকধর্মে বিচলিত হয় না**” এই গাথাটিতে **লোকধর্ম** মানে হচ্ছে জগতের ধর্ম, যেসব ধর্ম জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে অবিরাম গতিতে ঘটেই চলেছে বলা হয়েছে। **চিত্ত** মানে হচ্ছে মন, মানস। **যাঁর** মানে হচ্ছে নবীন বা মধ্যবয়সী অথবা প্রবীণ স্থবিরের। **বিচলিত হয় না** মানে হচ্ছে কম্পিত হয় না, আন্দোলিত হয় না। **শোকহীন** মানে হচ্ছে শোকমুক্ত বা শোকশল্য উপড়ে ফেলা হয়েছে এমন। **বিরজ** মানে হচ্ছে রজ বা ধুলো বিগত হয়েছে এমন, রজ বা ধুলো বিধ্বংসিত হয়েছে এমন। **ভয়হীন** মানে হচ্ছে ভয়মুক্ত, উপদ্রবহীন। বাকিগুলো পূর্ববৎ। এই পর্যন্ত হচ্ছে এর পদবর্ণনা।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনাকে বুঝতে হবে এভাবে: **যাঁর চিত্ত অষ্ট লোকধর্মে বিচলিত হয় না** মানে হচ্ছে যাঁর চিত্ত লাভ-অলাভ ইত্যাদি আটটি লোকধর্মের সম্মুখীন হলেও বিচলিত হয় না, কম্পিত হয় না, আন্দোলিত হয় না, তার সেই চিত্ত অকম্পনীয় লোকোত্তর ভাব এনে দেয়, তাই এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

এগুলোর সম্মুখীন হলে কার চিত্ত বিচলিত হয় না? ক্ষীণাসব অর্হতের, অন্য কারো নয়। তাই তো বলা হয়েছে:

“বায়ু যেমন কঠিন পাথুরে পর্বতকে

কম্পিত করতে পারে না,

একইভাবে যার চিত্ত স্থির, বিমুক্ত ও ব্যয়দর্শী

তাকে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং

ইষ্ট-অনিষ্ট বিষয়গুলো কম্পিত করতে পারে না।”

(অ.নি.৬.৫৫; মহাৰ.২৪৪)

একমাত্র ক্ষীণাসবের চিত্তই হচ্ছে **শোকহীন**। “শোক, অনুতাপ, অনুশোচনা, অন্তরের শোক, অন্তরের পরিশোক, মনস্তাপ” ইত্যাদি প্রকারে (ৰিভ.২৩৭) যেই শোকের কথা বলা হয়েছে, সেই শোকের অবিদ্যমানতাই হচ্ছে শোকহীন। কেউ কেউ অবশ্য নির্বাণকেই বুঝিয়ে থাকেন, তবে সেটি পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। যেমন শোকহীন তেমনি বিরজ ও ভয়হীনও হচ্ছে ক্ষীণাসবেরই চিত্ত। ক্ষীণাসবের চিত্ত লোভ-বিদ্বেষ-মোহরজ হতে মুক্ত বিধায় **বিরজ**, এবং চারি যোগ হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ বিধায় **ভয়হীন**। যখনই এটি পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হয় ঠিক সেই মুহূর্তে উদ্দিষ্টমতে তিন প্রকারে পুঞ্জ ইত্যাদি উৎপন্ন না করিয়ে জগতের বাইরে নিয়ে যায় এবং আহ্বানযোগ্য ইত্যাদি ভাব আনয়ন করে বিধায় এটিকে “মঙ্গল” হিসেবে বুঝতে হবে।

এভাবে এই গাথায় অষ্ট লোকধর্মে অকম্পিত চিত্ত, শোকহীন চিত্ত, বিরজ চিত্ত ও ভয়হীন চিত্ত, এই চারটি মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। এটি কীভাবে মঙ্গল বয়ে আনে তা যথাস্থানে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

“যার চিত্ত অষ্ট লোকধর্মে” এই গাথাটির অর্থবর্ণনা সমাপ্ত।

## ‘এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ’ গাথাটির বর্ণনা

১৩. এভাবে ভগবান “মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা” ইত্যাদি দশটি গাথার মাধ্যমে আটত্রিশটি মঙ্গলের কথা বলার পর, এখন নিজের কথিত মঙ্গলগুলোর প্রশংসা করতেই “**এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ সম্পাদন করে**” এই শেষোক্ত গাথাটি বললেন।

এর অর্থবর্ণনা হচ্ছে এই: **এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ** মানে হচ্ছে মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা না করা ইত্যাদি আমি যেসব মঙ্গলের কথা বলেছি সেগুলো। **সর্বত্র অপরাজেয় হয়ে** মানে হচ্ছে সর্বত্রই স্কন্ধমার, ক্লেশমার, অভিসংস্কারমার ও দেবপুত্রমার এই চার প্রকার শত্রুর কোনো একটির দ্বারা পরাজিত না হয়ে, অর্থাৎ নিজেই সেই চার প্রকার মারকে পরাজিত করে অর্থে বলা হয়েছে।

**সর্বত্রই (তারা) স্বস্তি (সুখ) লাভ করে থাকে** মানে হচ্ছে এই মঙ্গলময় কাজগুলো সম্পাদন করে, চার প্রকার মারের দ্বারা পরাজিত না হয়ে, ইহ-পরলোকে, দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা চঙ্ক্রমণ করার সময় ইত্যাদিতে সর্বত্রই তারা স্বস্তি লাভ করে থাকে, অর্থাৎ মূর্খসংসর্গ ইত্যাদির ফলে যেসব আসব, আঘাত ও মনোজ্বালা উৎপন্ন হয় সেগুলো বিদ্যমান না থাকায় তারা স্বস্তি লাভ করে থাকে, এতে করে তারা উপদ্রবমুক্ত, শোকহীন, নিরাপদ ও ভয়হীন হয়ে থাকে বলা হয়েছে।

“**এগুলোই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম মঙ্গল**”এই কথা বলে ভগবান তাঁর দেশনা শেষ করলেন। কীভাবে? এভাবেই, হে দেবপুত্র, যারা এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ সম্পাদন করে তারা যেহেতু সর্বত্রই স্বস্তি লাভ করে থাকে, তাই সেই মূর্খসংসর্গ না করা ইত্যাদি আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলকে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও প্রবর বলে গ্রহণ করো।

এভাবে ভগবান দেশনা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ কোটি দেবতা অর্হত্ত্ব লাভ করেছিল, আর স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী ফললাভীর সংখ্যা ছিল গণনাতীত। এরপর ভগবান পরদিন আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, “হে আনন্দ, গত রাতে জনৈক দেবতা আমার কাছে উপস্থিত হয়ে মঙ্গল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে। আমি তাকে মোট আটত্রিশটি মঙ্গলের কথা বলেছি। হে আনন্দ, তুমি সেই মঙ্গল-পর্যায় শিক্ষা করো, শিক্ষা করে ভিক্ষুদের শিখিয়ে দাও।” স্থবির নিজে শিক্ষা করার পর সেগুলো ভিক্ষুদের শিখিয়ে দিলেন। সেগুলো আচার্যপরম্পরা এখনো পর্যন্ত চালু আছে, এভাবেই এই ব্রহ্মচর্য (শাসন) দেবতা ও মানুষদের দ্বারা ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ, বহুজনের কাছে বিস্তৃত ও সুপ্রকাশিত করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

এখন এই সমস্ত মঙ্গল সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় আরো খোলাসা করে তুলে ধরার জন্য একদম শুরু থেকে এর পারস্পরিক সম্বন্ধকে জানতে হবে এভাবে: ইহ-পারলৌকিক ও লোকোত্তর-সুখ কামনাকারী এই সত্ত্বগণ মূর্খ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা পরিহার করে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করে, পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করে এবং ধর্মানুকূল দেশে বাস করার মাধ্যমে ও পূর্বকৃত পুণ্যসম্পত্তি সঞ্চিত থাকার মাধ্যমে কুশলকর্ম না করাকে নিন্দা জানিয়ে, নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করে, শাস্ত্রজ্ঞান-শিল্পবিদ্যা-বিনয়ে অলংকৃত হয়ে, বিনয়ানুরূপ সুভাষিত কথা বলে, যতদিন গৃহীজীবনে থাকে ততদিন মাতাপিতার সেবাযত্ন করার মাধ্যমে পুরোনো ঋণ শোধ করে, স্ত্রীপুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করার মাধ্যমে নতুন ঋণ বিনিয়োগ করে, নির্দোষ পেশা অবলম্বন করার মাধ্যমে ব্যাপক ধনসম্পত্তি ইত্যাদি অর্জন করে, দানের দ্বারা ভোগের সার এবং ধর্মচর্চার দ্বারা জীবনের সার গ্রহণ করে, জ্ঞাতিদের সাহায্য করার মাধ্যমে নিজের আপনজনদের হিত সাধন করে, নির্দোষ কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে অন্যদের হিত সাধন করে, পাপকাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে অন্যদের কষ্ট না দিয়ে, মদ্যপান হতে সংযত থাকার মাধ্যমে নিজেকে কষ্ট না দিয়ে, কুশলধর্মে অপ্রমত্ত থাকার মাধ্যমে কুশলধর্মকে বর্ধিত করে, কুশলধর্মকে বর্ধিত করার পর গৃহীবেশ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য, আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদির প্রতি গৌরব ও সম্মানের বশে ব্রত পালন করে, সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে জিনিসপত্রের প্রতি যে লোভ সেটিকে পরিত্যাগ করে, কৃতজ্ঞ হওয়ার মাধ্যমে সৎপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে, ধর্মশ্রবণের দ্বারা চিত্তের জড়তাকে কাটিয়ে, সহিষ্ণু হওয়ার মাধ্যমে সব ধরনের বিপদকে জয় করে, সুবাধ্যতার দ্বারা নিজেকে সহায়সম্পন্ন করে, শ্রমণদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার মাধ্যমে আচরণের যথার্থ প্রয়োগকে দর্শন করে, ধর্মালোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ দূর করে, ইন্দ্রিয়-সংবরণ নামক তপস্যার দ্বারা শীলবিশুদ্ধি অর্জন করে, শ্রমণধর্ম নামক ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি অর্জন করে, এরপর ক্রমান্বয়ে আরো চারটি বিশুদ্ধি অর্জন করে, এই পথে আর্যসত্য দর্শন নামক জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি অর্জন করে, অর্হত্ত্বফল নামক নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে। নির্বাণ সাক্ষাৎ করে তারা সিনেরু পর্বতের মতো ঝড়-বৃষ্টিরূপ অষ্ট লোকধর্মে অবিচলিত-চিত্ত হয়, শোকহীন, বিরজ ও ভয়হীন হয়। যারা ভয়হীন তারা সর্বত্রই কারো দ্বারা পরাজিত হয় না, তারা সর্বত্রই স্বস্তি লাভ করে থাকে। তাই তো ভগবান বলেছেন:

“এই সমস্ত মঙ্গলময় কাজ সম্পাদন করে

(মারের দ্বারা) সর্বত্র অপরাজেয় হয়ে,

সর্বত্রই (তারা) স্বস্তি (সুখ) লাভ করে থাকে।

এগুলোই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম মঙ্গল।”

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

মঙ্গল সূত্রের বর্ণনা সমাপ্ত।

# ৬. রত্ন সূত্রের বর্ণনা

## সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা

এখন “**যে-সকল অমনুষ্য এখানে**” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে মঙ্গল সূত্রের পরপর আলোচিত রত্ন সূত্রের অর্থবর্ণনার পালা এসেছে। এখানে প্রথমে তার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা বলে, তারপর সুপরিশুদ্ধ ঘাটসম্পন্ন নদী, হ্রদ ইত্যাদির জলে নামার মতো সুপরিশুদ্ধ উৎপত্তির দ্বারা এই সূত্রের অর্থে অবগাহনকে তুলে ধরতেই—

“যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে বলা হয়েছে,

এই নিয়মে এই সূত্রটিকে প্রকাশ করে,

আমরা এর অর্থবর্ণনা করব।”

এখানে যেহেতু মঙ্গল সূত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা, অকল্যাণ করা ও কল্যাণ না-করার কারণ ও আসবগুলোর বিনাশ প্রদর্শিত হয়েছে, এই সূত্র অন্যদের রক্ষা, অমনুষ্য ইত্যাদির কারণ ও আসবগুলোর বিনাশ সাধন করে, তাই এর পরপরই এই সূত্রটি আলোচিত হয়েছে।

এখানে এই পর্যন্ত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা।

## বৈশালীর কাহিনি

এখন “**যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে বলা হয়েছে**” এ ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে, “এই সূত্রটি কার দ্বারা বলা হয়েছে? কখন, কোথায় ও কেন বলা হয়েছে?” উত্তরে বলা যায়, এটি ভগবানের দ্বারাই বলা হয়েছে, কোনো শিষ্য ইত্যাদির দ্বারা নয়। তাও আবার যখন দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপদ্রবের দ্বারা উপদ্রুত বৈশালীর লিচ্ছবীদের প্রার্থনায় রাজগৃহ হতে ভগবানকে বৈশালীতে আনা হয়েছিল, তখন বৈশালীর সেই উপদ্রবগুলোকে দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যেই বলা হয়েছে। এটিই হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর। বিস্তারিত বলতে গিয়ে প্রাচীনেরা কিন্তু একেবারে বৈশালীর কাহিনি থেকেই বর্ণনা শুরু করেন।

এখানে এই হচ্ছে **বর্ণনা**: বারাণসী-রাজার অগ্রমহিষী নাকি গর্ভবতী হয়েছিলেন। তিনি গর্ভধারণের কথা জানতে পেরে রাজাকে সে-কথা জানালেন। রাজা তাঁর গর্ভ-সুরক্ষার যাবতীয় সুব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি সঠিকভাবে গর্ভ সুরক্ষা করে সন্তান প্রসবের সময় হলে আঁতুরঘরে প্রবেশ করলেন। পুণ্যবতী নারীরা খুব ভোরবেলা সন্তান প্রসব করেন, তিনি হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন, তাই তিনি খুব ভোরবেলা আলতামাখা দুপুর-মালতী ফুলের মতো এক মাংসপিণ্ড প্রসব করলেন। তখন “অন্য রানিরা স্বর্ণপ্রতিমার মতো পুত্র প্রসব করেন, আর এই অগ্রমহিষী কিনা মাংসপিণ্ড প্রসব করলেন ভেবে রাজা আমার বদনাম করবেন” এই চিন্তা করে সেই বদনামের ভয়ে সেই মাংসপিণ্ডটিকে একটি পাত্রে রেখে, অন্যকিছু দিয়ে ঢেকে, তার ওপর রাজচিহ্ন এঁকে দিয়ে নদীর স্রোতে ছুঁড়ে দেয়ালেন। মানুষেরা ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতারা সেটিকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত হলেন। সোনালি কাপড়ের ওপর প্রাকৃতিক সিঁদুর দিয়ে “বারাণসী-রাজার অগ্রমহিষীর সন্তান” লিখে সেটি পাত্রের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। তারপর সেই পাত্রটি জলের প্রবল ঢেউ ইত্যাদির দ্বারা উপদ্রুত না হয়ে নিরাপদে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে লাগল।

সেই সময় এক তাপস গোপালক পরিবারগুলোকে আশ্রয় করে নদীতীরে বাস করতেন। তিনি ভোরে নদীতে নেমে সেই পাত্রটিকে ভেসে আসতে দেখে পাংশুকূল ধারণায় গ্রহণ করলেন। তারপর তাতে লেখা লিখিত কাপড় ও রাজচিহ্ন আঁকা দেখে, সেটি খুলে সেই মাংসপিণ্ডটিকে দেখতে পেলেন। দেখার পর তখন তাঁর মনে হলো—“এটি গর্ভ হলেও, এর সে-রকম কোনো পচা বা দুর্গন্ধ নেই।” তাই সেটিকে তিনি আশ্রমে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার জায়গায় রেখে দিলেন। তারপর অর্ধমাস পরে সেটি দুটি মাংসপিণ্ডতে পরিণত হলো। তাপস তা দেখে সেটিকে আরো ভালো করে রেখে দিলেন। তারপর পুনরায় আরো অর্ধমাস পরে একেকটি পেশী হতে হাত-পা-মাথার জন্য পাঁচটি করে ফোস্কার গুটি দেখা দিল। তারপর অর্ধমাস পরে একটি মাংসপেশী থেকে সোনার প্রতিমার মতো ছেলেশিশু এবং আরেকটি মাংসপেশী থেকে মেয়েশিশু হলো। তাদের প্রতি তাপসের মনে পুত্রস্নেহ উৎপন্ন হলো। তাঁর বুড়ো আঙুল থেকে দুধ উৎপন্ন হলো। তারপর থেকে তিনি দুধভাত পেতে লাগলেন। তিনি নিজে ভাতগুলো খেয়ে অবশিষ্ট দুধটুকু শিশুদুটির মুখে ঢেলে দিতেন। তাদের পেটের মধ্যে যা যা ঢুকত সবই স্বচ্ছ মণিপাত্রে রাখার মতো স্পষ্ট দেখা যেত। এভাবেই সেই শিশুদুটি নিচ্ছৰি বা চামড়াহীন ছিল। তবে কেউ কেউ বলেন যে, “সেলাই করে রাখার মতো করে তাদের পরস্পরের চামড়া বিলীন হয়ে গিয়েছিল।” এভাবেই নিচ্ছৰিতা বা চামড়াহীনতার কারণে, অথবা লীনচ্ছৰিতা বা চামড়া বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণে তারা **লিচ্ছবী** নামে পরিচিত হয়েছিল।

তাপস শিশুদের পেলেপুষে বড়ো করার সময় সকালে গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করতেন, আর বিকালে ফিরে আসতেন। তাঁর সেই ঘটনাটি জানার পর গোপালকেরা বলল, “ভন্তে, প্রব্রজিতদের পক্ষে শিশু লালনপালন করা অনেক ঝামেলার। আপনি বরং শিশুদুটিকে আমাদের দিয়ে দিন। আমরাই তাদের দেখভাল করব। আপনি নিজের কাজ করুন।” তাপস “সাধু” বলে সায় দিলেন। গোপালকেরা পরদিন রাস্তা সমান করে দিয়ে, তার ওপর ফুল ছড়িয়ে দিয়ে, ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আশ্রমে আসল। তাপস “শিশুদুটি মহাপুণ্যবান, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বড়ো করে তোলো, বড়ো হওয়ার পর তাদের দুজনকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিও, পঞ্চ গোরস দিয়ে রাজাকে খুশি করে জায়গাজমি নিয়ে একটি নগর নির্মাণ করো, সেখানেই কুমারকে (রাজপদে) অভিষিক্ত করো।” বলে শিশুদুটিকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা “সাধু” বলে সায় দিয়ে শিশুদুটিকে নিয়ে গিয়ে লালনপালন করতে লাগল।

বেড়ে ওঠার সময় শিশুরা যখন খেলা করত তখন ঝগড়া বাঁধলে তারা অন্য গোপালকদের শিশুদের হাত কিংবা পা দিয়ে আঘাত করত এবং শিশুরা কেঁদে উঠত। “কাঁদছ কেন?” বলে মা-বাবারা জিজ্ঞেস করলে তারা বলত, “এই মাতাপিতাহীন তাপসের দ্বারা পালিতরাই আমাদের জোরে মারছে।” তখন তাদের মা-বাবারা বলত, “এই শিশুরা অন্য শিশুদের কষ্ট দিচ্ছে, দুঃখ দিচ্ছে, তাই এদের সঙ্গে মিশবে না, এদের এড়িয়ে চলবে।” তখন থেকেই নাকি সেই জায়গাটিকে “বজ্জী” ডাকা হতো। জায়গাটির আয়তন ছিল একশো যোজন। তারপর গোপালকেরা রাজাকে খুশি করে সেই জায়গাটি অধিগ্রহণ করল। সেখানেই তারা নগর নির্মাণ করল। তারপর কুমার ষোলো বছরে পদার্পণ করলে তাকে অভিষিক্ত করে রাজা বানাল। তার সঙ্গে অন্য মেয়েশিশুটির বিয়ে দিয়ে তারা অঙ্গীকার করল যে, “আমরা বাইরে থেকেও মেয়ে আনব না, আবার এখান থেকেও কোনো মেয়ে কাউকে দেব না।” তাদের সহবাসের ফলে প্রথমে দুটি শিশুর জন্ম হলো, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। এভাবে মোট ষোলোবার দুটি দুটি করে শিশুর জন্ম হলো। তারপর ক্রমান্বয়ে সেই শিশুরা যখন বড়ো হতে লাগল তখন বন-উদ্যান-বাসস্থান-পরিবারসম্পত্তির জন্য স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা সেই নগরটিকে বাড়িয়ে মোট তিনবার প্রতি তিন কিলোমিটার পরপর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দিল। এভাবে বারবার বিশালিকৃত করায় তথা বাড়ানোয় এটি “**বৈশালী**” নামে পরিচিত হয়েছিল। এই হচ্ছে **বৈশালীর কাহিনি**।

ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন এই বৈশালী বিপুল ও সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। সেখানে সাত হাজার সাতশো জন রাজা ছিলেন, সমসংখ্যক যুবরাজ, সেনাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি ব্যক্তিরাও ছিল। যেমন বলা হয়েছে:

“সেই সময় বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, বিশাল ও ঘনবসতিপূর্ণ। সেখানে খাদ্যের কোনো অভাব ছিল না। সেখানে সাত হাজার সাতশো সাতটি প্রাসাদ, সাত হাজার সাতশো সাতটি চূড়াযুক্ত অট্টালিকা, সাত হাজার সাতশো সাতটি প্রমোদকানন এবং সাত হাজার সাতশো সাতটি পুষ্করিণী ছিল।” (মহাৰ.৩২৬)

পরে সেখানে তীব্র খরা দেখা দিল, শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলো, ফলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। প্রথমে দরিদ্র মানুষেরা মারা যেতে লাগল। তাদের মৃতদেহ নগরের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। মানুষের মৃতদেহের গন্ধ পেয়ে অমনুষ্যরা নগরে প্রবেশ করতে লাগল। তারপর এত বেশি মানুষ মারা যেতে লাগল যে, তাদের আর ঠিকমতো সৎকার করা যাচ্ছিল না, ফলে লোকজনের মধ্যে দ্রুত নানান সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ল। এভাবে দুর্ভিক্ষ-ভয়, অমনুষ্য-ভয় ও রোগভয় এই তিন প্রকার ভয়ে উপদ্রুত হয়ে বৈশালী নগরবাসীরা রাজার কাছে গিয়ে বলল, “মহারাজ, এই নগরে তিন প্রকার ভয় দেখা দিয়েছে, এর আগে রাজকুলের সাত পুরুষ ধরে এ-রকম ভয় দেখা দেয়নি, বোধহয় আপনার অধার্মিকতার কারণেই এখন এই জাতীয় ভয় দেখা দিয়েছে।” রাজা সবাইকে সম্মেলন-ঘরে সমবেত করিয়ে বললেন, “আমার কোনো অধার্মিকতা আছে কি না খুঁজে দেখো তো।” তারা সবাই মিলে খুঁজে দেখল, কিন্তু তেমন কিছুই পেল না।

তখন রাজার কোনো দোষ দেখতে না পেয়ে তারা ভাবল, “আমাদের এই ভয় কীভাবে দূর করা যাবে?” সেখানে কেউ কেউ ছয়জন শাস্তার কথা বলল, “এঁরা পদার্পণ করলেই সমস্ত ভয় দূর হয়ে যাবে।” কেউ কেউ বলল, “বুদ্ধ নাকি জগতে উৎপন্ন হয়েছেন, সেই ভগবান সকল সত্ত্বের হিতের জন্য ধর্মদেশনা করছেন, তিনি মহাঋদ্ধিমান ও মহাপ্রভাবশালী, তিনি পদার্পণ করা মাত্রই সমস্ত ভয় কেটে যাবে।” এই কথায় তারা খুশি হয়ে বলল, “সেই ভগবান এখন কোথায় বাস করছেন? আমরা লোক পাঠালেই কি তিনি আসবেন?” তখন কেউ কেউ বলল, “বুদ্ধগণ অত্যন্ত অনুকম্পাপরায়ণ হন, কেন তিনি আসবেন না? সেই ভগবান এখন রাজগৃহে বাস করছেন, রাজা বিম্বিসারই তাঁর সেবা-পরিচর্যা করছেন, যদি তিনি আসতে না দেন?” “তা হলে রাজাকে জানিয়ে তাঁকে নিয়ে আসব” এই ভেবে তারা দুজন লিচ্ছবী রাজাকে বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ প্রচুর উপহারসামগ্রী দিয়ে রাজার কাছে পাঠাল এই বলে—“বিম্বিসারকে জানিয়ে ভগবানকে নিয়ে এসো।” তারা গিয়ে রাজাকে উপহারগুলো দিয়ে, সেই খবরটি নিবেদন করে বলল, “মহারাজ, ভগবানকে আমাদের নগরে পাঠান।” রাজা তাদের কথায় সম্মতি দিলেন না, বললেন, “সেটি তোমরাই জানো।” তারা ভগবানের কাছে গিয়ে, বন্দনা করে বলল, “ভন্তে, আমাদের নগরে তিন প্রকার ভয় দেখা দিয়েছে। ভগবান যদি একবার আসেন তা হলে আমাদের স্বস্তি হবে।” ভগবান ভেবে দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, “বৈশালীতে রত্ন সূত্র পাঠ করলে সেই রক্ষাকবচটি লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, সূত্রপাঠ শেষে চুরাশি হাজার প্রাণী ধর্মজ্ঞান লাভ করবে।” তাই তিনি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তখন রাজা বিম্বিসার ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন শুনে “ভগবান বৈশালী যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন” এই বলে নগরে ঘোষণা করিয়ে, ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, “ভন্তে, আপনি কি বৈশালী যাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন?” “হ্যাঁ, মহারাজ।” “তা হলে, ভন্তে, রাস্তাঘাট প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।”

তারপর রাজা বিম্বিসার রাজগৃহ ও গঙ্গার মধ্যকার পাঁচ যোজন রাস্তা জুড়ে মাটি সমান করে, প্রতি এক যোজন অন্তর অন্তর বিশ্রামাগার বানিয়ে দিয়ে, ভগবানের বৈশালীতে যাওয়ার সময় হয়েছে জানালেন। ভগবান পাঁচশো ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। রাজা পাঁচ যোজন রাস্তা জুড়ে হাঁটুসমান পাঁচ রঙের ফুল ছড়িয়ে দিয়ে, ধ্বজা-পতাকা টাঙিয়ে দিয়ে, পূর্ণঘট, কলাগাছ ইত্যাদি স্থাপন করে, ভগবানের মাথার ওপর দুটি সাদা ছাতা ও একেকজন ভিক্ষুর মাথার ওপর একেকটি সাদা ছাতা ধারণ করিয়ে, সপরিবারে ফুল-সুগন্ধি ইত্যাদি দিয়ে পুজো করতে করতে একেকটি বিশ্রামাগারে ভগবানকে বাস করিয়ে, মহাদান দিয়ে পাঁচ দিনে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন। সেখানে নৌকাটিকে সর্বালংকারে অলংকৃত করার সময় বৈশালীবাসীদের কাছে খবর পাঠালেন, “ভগবান এসে পড়েছেন, রাস্তাঘাট ঠিক করে সবাই ভগবানকে সাদরে গ্রহণ করো।” তারা “আমরা এর দ্বিগুণ পুজো করব” ভেবে বৈশালী ও গঙ্গার মধ্যকার তিন যোজন রাস্তা জুড়ে মাটি সমান করে ভগবানের জন্য চারটি এবং একেকজন ভিক্ষুর জন্য দুটি করে সাদা ছাতা সাজিয়ে পুজো করতে করতে গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াল।

রাজা বিম্বিসার দুটি নৌকাকে একসঙ্গে বেঁধে, তার ওপর মণ্ডপ বানিয়ে, সেটিকে ফুল ইত্যাদি দিয়ে অলংকৃত করে, সেখানে সর্বরত্নময় বুদ্ধাসন প্রস্তুত করালেন। ভগবান সেই আসনে বসলেন। পাঁচশো ভিক্ষুও নৌকায় আরোহণ করে যার যার আসনে বসল। রাজা ভগবানের পিছে পিছে গিয়ে, গলা সমান জলে নেমে “ভন্তে, ভগবান ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই এই গঙ্গাতীরে বাস করব” বলে সেখানে থামলেন। ওপরে দেবতারা অকনিষ্ঠ ভবন পর্যন্ত পুজো করল, এবং নিচে গঙ্গায় বসবাসকারী কম্বল, অস্সতর ইত্যাদি নাগগণ পুজো করল। এভাবে বিপুল পূজায় পূজিত হয়ে ভগবান দীর্ঘ গঙ্গার মাত্র এক যোজন গিয়ে বৈশালীর সীমানায় প্রবেশ করলেন।

তখন লিচ্ছবী রাজারা বিম্বিসার যেভাবে পুজো করেছেন তার দ্বিগুণ পুজো করতে করতে গলা সমান জলে নেমে ভগবানকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই চারদিকে বিশাল অন্ধকার ঘনকালো মেঘ দেখা দিল, বিকট শব্দে গর্জন করতে লাগল, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তারপর ভগবান গঙ্গাতীরে প্রথম পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝরঝর করে পদ্মবৃষ্টি[[1]](#footnote-0) নেমে আসল। সেই বৃষ্টিতে যারা ভিজতে চাইল তারাই শুধু ভিজল, আর যারা ভিজতে চাইল না তারা একটুও ভিজল না। কোথাও হাঁটুসমান, কোথাও ঊরুসমান, কোথাও কোমরসমান, কোথাও গলাসমান সর্বত্রই জল বয়ে যেতে লাগল, জলের তোড়ে সমস্ত মৃতদেহ গঙ্গায় প্রবেশ করায় সমস্ত জায়গাগুলো পরিষ্কার হয়ে গেল।

লিচ্ছবী রাজারা ভগবানকে প্রতি এক যোজন অন্তর অন্তর বিশ্রাম করিয়ে, মহাদান দিয়ে, তিন দিন ধরে বিম্বিসার রাজার দ্বিগুণ পুজো করতে করতে বৈশালীতে নিয়ে গেলেন। ভগবান বৈশালীতে পৌঁছুলে দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক দেবসংঘ সহকারে ভগবানের কাছে আসল। এভাবে প্রভাবশালী দেবতারা সমবেত হওয়ায় অমনুষ্যদের প্রায় সকলেই পালিয়ে গেল। ভগবান নগরদ্বারে দাঁড়িয়ে আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, “হে আনন্দ, এই রত্ন সূত্রটি শিক্ষা করে, পুজোর উপকরণগুলো নিয়ে, লিচ্ছবী কুমারদের সঙ্গে নিয়ে বৈশালীর তিনটি প্রাচীরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পরিত্রাণ করো।” এই বলে ভগবান রত্ন সূত্রটি বললেন। এভাবেই “এই সূত্রটি কার দ্বারা, কখন, কোথায় ও কেন বলা হয়েছে?” এইসব প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে বৈশালীর কাহিনি থেকে শুরু করে প্রাচীন স্থবিরগণ বর্ণনা করেন।

এভাবে ভগবান বৈশালীতে যেদিন পৌঁছালেন সেদিনই বৈশালীর নগরদ্বারে সেইসব উপদ্রবকে দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যে এই রত্ন সূত্রটি বললেন এবং আনন্দ স্থবির সেটি শিক্ষা করে পরিত্রাণের জন্য আবৃত্তি করতে করতে ভগবানের পাত্রে জল নিয়ে সারা নগরে ছিটিয়ে দিতে দিতে বিচরণ করলেন। স্থবির “যা কিছু” বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেসব অমনুষ্য আগে পালিয়ে যায়নি, আবর্জনার স্তূপে, দেয়ালের আড়ালে ইত্যাদিতে লুকিয়ে ছিল, তারা সবাই চারটি দ্বার দিয়ে পালিয়ে গেল, দ্বারগুলোতে প্রচণ্ড ভিড় লেগে গেল। তখন কোনো কোনো অমনুষ্য দ্বার দিয়ে পালানোর জায়গা না পেয়ে প্রাচীর ভেঙে পলিয়ে গেল। অমনুষ্যরা পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের শরীর থেকে রোগ দূর হয়ে গেল। তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সব ধরনের সুগন্ধি, ফুল ইত্যাদি দিয়ে স্থবিরকে পুজো করল। বহু লোক মিলে নগরের মাঝখানে অবস্থিত সম্মেলন-ঘরটিকে সব ধরনের সুগন্ধী দিয়ে লেপে, ওপরে শামিয়ানা টাঙিয়ে, সর্ববিধ অলংকারে অলংকৃত করে, সেখানে বুদ্ধাসন প্রস্তুত করে ভগবানকে নিয়ে আসল।

ভগবান সম্মেলন-ঘরে ঢুকে প্রস্তুতকৃত আসনে বসলেন। ভিক্ষুসংঘ, রাজারা এবং লোকজনও যার যার উপযুক্ত স্থানে বসল। দেবরাজ ইন্দ্র সক্কও দুটি দেবলোকের দেবপরিষদকে সঙ্গে নিয়ে অন্য দেবতাদের পাশে বসল। আনন্দ স্থবিরও সারা বৈশালী ঘুরে ঘুরে সুরক্ষা নিশ্চিত করে, বৈশালী নগরবাসীকে সঙ্গে করে এসে একপাশে বসলেন। সেখানেই ভগবান সকলের উদ্দেশ্যে সেই রত্ন সূত্রটি বললেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত “**যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে বলা হয়েছে, এই নিয়মে এই সূত্রটিকে প্রকাশ করে**” যেই সংক্ষিপ্ত বিবরণী উল্লেখিত হয়েছে, তা সর্বপ্রকারে বিস্তারিত করা হলো।

## ‘এখানে যে-সকল’ গাথাটির বর্ণনা

১. এখন “**আমরা এর অর্থবর্ণনা করব**” এই কথাটি বলায় **অর্থবর্ণনা** শুরু হতে যাচ্ছে। তবে অন্যরা বলে থাকেন যে, “প্রথম দিকের পাঁচটি গাথাই শুধু ভগবানের দ্বারা বলা হয়েছে, আর বাকিগুলো পরিত্রাণ করার সময়ে আনন্দ স্থবির কর্তৃক বলা হয়েছে।” অথবা সে যা-ই হোক, এতসব বিচার-বিশ্লেষণ করে কী হবে আমাদের! এখন আমরা সর্বতোভাবে এই রত্ন সূত্রের অর্থবর্ণনাই করব।

“**এখানে যে-সকল অমনুষ্য**” এটিই হচ্ছে প্রথম গাথা। এখানে **যে-সকল** মানে হচ্ছে যে ধরনের অল্পপ্রভাবশালী কিংবা মহাপ্রভাবশালী। **এখানে** মানে হচ্ছে এই স্থানে, অর্থাৎ সেই মুহূর্তে সম্মিলিত হওয়ার স্থানটি সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। **অমনুষ্য** মানে হচ্ছে চতুর্মহারাজিক দেবতাদের নিচে যেসব সত্ত্বগণ বাস করে। কিন্তু এখানে সবাইকে সাধারণভাবে ‘অমনুষ্য’ হিসেবেই দেখা উচিত।

**সমবেত হয়েছে** মানে হচ্ছে একত্র হয়েছে। **ভূমিবাসী** মানে হচ্ছে ভূমিতে জন্মানো। **আকাশবাসী** মানে যে-সকল অমনুষ্য অন্তরীক্ষে জন্ম নিয়েছে, তারা সবাই এখানে সমবেত হয়েছে, এই হচ্ছে এর অর্থ। এখানে যামস্বর্গ হতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত জন্ম নেওয়া সত্ত্বগণ আকাশে আবির্ভূত বিমানে জন্মগ্রহণ করার দরুন তাদেরকে “আকাশবাসী অমনুষ্য” হিসেবে বুঝতে হবে। যেসব সত্ত্ব যামস্বর্গের নিচে সিনেরু পর্বত হতে শুরু করে মাটিতে বৃক্ষ-লতাগুল্ম ইত্যাদিতে বসবাস করে থাকে এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা সবাই ভূমিতে ও ভূমি-লাগোয়া বৃক্ষ-লতা-পর্বত ইত্যাদিতে জন্মগ্রহণ করার দরুন তাদেরকে “ভূমিবাসী অমনুষ্য” হিসেবে বুঝতে হবে।

এভাবে ভগবান সকল অমনুষ্য সত্ত্বগণকে “যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী” এই দুটি পদে নির্দিষ্ট করে, পুনরায় একটি পদে গ্রহণ করে “**সকল সত্ত্বগণ আনন্দিত হও**” বললেন। **সকল** মানে হচ্ছে নির্বিশেষে, সবাই। **আনন্দিত হও** মানে সুখীমনা হও, প্রীত হও, খুশি হও, এই হচ্ছে এর অর্থ। **আমার দেশনা মন দিয়ে শোনো** মানে হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে, সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দিব্যসম্পত্তি ও লোকোত্তর-সুখদায়ক আমার দেশনা শোনো।

এভাবেই ভগবান এখানে “এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে” এই অনির্দিষ্ট বাক্যের দ্বারা সত্ত্বগণকে গ্রহণ করে, পুনরায় “যারা ভূমিবাসী কিংবা আকাশবাসী” এই দুই প্রকারে নির্দিষ্ট করে, তারপর “সকল সত্ত্বগণ” বলে পুনরায় একত্র করে “আনন্দিত হও” এই বাক্যের দ্বারা ইচ্ছা-সম্পত্তিতে এবং “আমার দেশনা মন দিয়ে শোনো” বলে প্রয়োগ-সম্পত্তিতে নিয়োজিত করে, ঠিক সেভাবে যথাযথ মনোযোগ-সম্পত্তিতে ও পরের দেশনা শোনার সম্পত্তিতে, ঠিক সেভাবে নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করার সম্পত্তিতে, সৎপুরুষের সম্পত্তিতে ও অতীত পুণ্যহেতু-সম্পত্তিতে, এবং সমাধি-সম্পত্তিতে, প্রজ্ঞাসম্পত্তিতে ও হেতুসম্পত্তিতে নিয়োজিত করে গাথাটি শেষ করলেন।

## ‘অতএব’ গাথাটির বর্ণনা

২. “**অতএব, হে অমনুষ্যগণ**” এটি দ্বিতীয় গাথা। এখানে **সবাই** মানেহচ্ছে নির্বিশেষে, সকলে। এতে কী বলা হয়েছে? যেহেতু তোমরা দিব্যস্থান ও সেখানকার উপভোগ্য-সম্পত্তি ছেড়ে ধর্ম শোনার জন্যই এখানে সমবেত হয়েছ, নাচ-গান ইত্যাদি দেখার জন্য নয়, তাই সত্ত্বগণ তোমরা সবাই শোনো। অথবা “আনন্দিত হও, মন দিয়ে শোনো” এই বাক্যের দ্বারা তাদের আনন্দিত ভাব ও মন দিয়ে শোনার আগ্রহ দেখে বললেন, যেহেতু তোমরা আনন্দিত-মনা হয়েছ, নিজেকে সম্যক পথে পরিচালনা, যথাযথ মনোযোগ ও ইচ্ছা-পরিশুদ্ধির দ্বারা মন দিয়ে শোনার ইচ্ছাসম্পন্ন হয়েছ, সৎপুরুষ, পুণ্যহেতু ও অন্যের দেশনা শোনা ইত্যাদি কাছাকাছি কারণের ভিত্তিতে প্রয়োগ-শুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছ, তাই সত্ত্বগণ তোমরা সবাই শোনো। অথবা পূর্ববর্তী গাথার শেষে যেটিকে “দেশনা” বলা হয়েছে, সেটিকে উল্লেখ করে বললেন, “যেহেতু অষ্ট অক্ষণ বাদে ক্ষণ অত্যন্ত দুর্লভ হওয়ায় এবং প্রজ্ঞা ও করুণাগুণের দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ায় বহুবিধ সুফলযুক্ত আমার দেশনা অতি দুর্লভ, আমি সেই দুর্লভ দেশনা দেওয়ার ইচ্ছায় ‘আমার দেশনা শোনো’ বলেছি। তাই সত্ত্বগণ তোমরা সবাই শোনো” এই কথাটি এই গাথাপদের দ্বারা বলা হয়েছে।

এভাবে এই যুক্তি দেখিয়ে, নিজের দেশনা শোনায় নিয়োজিত করে, মন দিয়ে শোনা উচিত বলার জন্যই “**মানুষদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হও**” বলেছেন। তার অর্থ হচ্ছে এই: যেসব মানুষ তিন প্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত হয়েছে তোমরা তাদের প্রতি মৈত্রীভাব তথা হিত কামনা উৎপন্ন করো। এখানে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই: আমি বুদ্ধ তাই ক্ষমতার বলে তোমাদের বলছি না, বরং তোমাদের ও এই সকল মানুষদের হিতের জন্যই আমি বলছি—“মানুষদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হও।” এখানে যারা—

“যে রাজর্ষিরা সত্ত্বগণে ভর্তি পৃথিবীকে জয় করে,

বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করে ঘুরে বেড়ায়; যেমন:

অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সম্যকপাশ, প্রিয়বাক্য ও নিরর্গল।”

“এগুলো মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলার

ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না।”

“একটি প্রাণীর প্রতিও যদি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করে,

তাতে সে কুশল কর্মকারী হয়।

সকল প্রাণীর প্রতি মনে মনে অনুকম্পাকারী হয়ে

আর্যব্যক্তি প্রভূত পুণ্য করেন।” (অ.নি.৮.১)

এভাবে ইত্যাদি সূত্রে এগারো প্রকার সুফলের ভিত্তিতে যারা মৈত্রী চর্চা করে তাদের মৈত্রী হিত সাধন করে বলে বুঝতে হবে।

“দেবতাদের অনুকম্পালাভী ব্যক্তি

সর্বদা সৌভাগ্যের দেখা পান।”

(দী.নি.২.১৫৩; উদা.৭৬; মহাৰ.২৮৬)

এভাবে ইত্যাদির ভিত্তিতে যাদের প্রতি করা হয় তাদেরও হিত সাধিত হয় বলে বুঝতে হবে।

এভাবে উভয়ের হিতভাব দেখিয়ে দিতেই “মানুষদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হও” বলে, এখন তাদের উপকারকে দেখিয়ে দিতেই বললেন, “**তারা তোমাদের উদ্দেশ্যে রাত-দিন পূজা দেয়, তাই অপ্রমত্ত হয়ে তাদের রক্ষা করো।**” তার অর্থ হচ্ছে এই: যেসব মানুষ চিত্র এঁকে, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে দেবতা বানিয়ে এবং চৈত্য, বৃক্ষ ইত্যাদির কাছে গিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে দিনে পুজো দেয়, এবং কৃষ্ণপক্ষ ইত্যাদির রাতে পুজো দেয়। অথবা শলাকা-ভাত ইত্যাদি দিয়ে আরক্ষা-দেবতা থেকে শুরু করে ব্রহ্মলোকের দেবতাদের পর্যন্ত পুণ্যদান করার মাধ্যমে দিনে পুজো দেয়, এবং ছাতা ধরা, পুষ্পমাল্য দেওয়া, সারা রাত ধরে ধর্মশ্রবণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ও পুণ্যদান করার মাধ্যমে রাতেও পুজো দেয়, তাদের কেন রক্ষা করবে না? যেহেতু তারা এভাবে দিন-রাত তোমাদের উদ্দেশ্যে পুজো দেয়, তাই **তাদের রক্ষা করো**। তাই পূজাকারী সেই মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ হৃদয়ে ধারণ করে, সর্বদা স্মরণ করে তোমরা তাদের অপ্রমত্ত হয়ে রক্ষা করো, সুরক্ষা করো, তাদের অহিত দূর করে দাও, হিত সাধন করো।

## ‘যা কিছু’ গাথাটির বর্ণনা

৩. এভাবে দেবতাদের প্রতি মানুষদের উপকারকে দেখিয়ে দিয়ে, বুদ্ধ ইত্যাদির গুণ প্রকাশ করার মাধ্যমে তাদের যাবতীয় উপদ্রব দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং দেবমনুষ্যদের ধর্মদেশনা প্রদানের লক্ষ্যে “**ইহলোকে কিংবা পরলোকে যা কিছু বিত্ত আছে**” ইত্যাদি প্রকারে সত্যবাক্য প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। এখানে **যা কিছু** মানে হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহারের উপযোগী যা কিছু আছে সবই অনির্দিষ্ট কথার ভিত্তিতে এর অন্তর্গত। **বিত্ত** মানে হচ্ছে ধন। **ইহলোকে** এটি মনুষ্যলোককে নির্দেশ করছে, **কিংবা পরলোকে** এটি বাদবাকি জগৎগুলোকে নির্দেশ করছে। এর দ্বারা মনুষ্যলোক ছাড়া বাকি সমস্ত জগৎকে গ্রহণ করা হলেও, পরের বাক্যে “অথবা স্বর্গে” বলার কারণে মনুষ্যলোক ও স্বর্গ বাদে বাদবাকি নাগ, সুপর্ণ ইত্যাদিকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এভাবে এই দুটি পদের দ্বারা যা কিছু মানুষের ব্যবহারের উপযোগী ও অলংকার হিসেবে পরিভোগের উপযোগী সোনা, রুপো, মণি, মুক্তো, বৈদূর্য, প্রবাল, চুনিপাথর, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি এবং যা কিছু মণি-মুক্তো-বালুকাময় ভূমির বহুশত যোজন বিস্তৃত ভবন রত্নময় বিমানগুলোতে উৎপন্ন নাগ-সুপর্ণ ইত্যাদির বিত্ত, সেগুলোকেই এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

**অথবা স্বর্গে** মানে হচ্ছে কামজগৎ ও সূক্ষ্ম পদার্থ জগৎ নামক দেবলোকে। তারা সেখানে সুন্দর কর্মের দ্বারা জীবিত থাকে, গমন করে অর্থে স্বর্গ, অথবা শ্রেষ্ঠ, অগ্র অর্থেও স্বর্গ। **যা কিছু** মানে হচ্ছে যা কিছু মালিকানাধীন অথবা মালিকহীন। **রত্ন** মানে হচ্ছে রতি নিয়ে আসে, বয়ে আনে, জন্ম দেয়, বর্ধিত করে এই অর্থে রত্ন, অর্থাৎ যা কিছু শ্রদ্ধেয়, মহার্ঘ, অতুলনীয়, দেখা পাওয়া দুর্লভ ও অতুলনীয় সত্ত্বদের পরিভোগ্য, এগুলোই হচ্ছে এর নামান্তর। যেমন বলা হয়েছে:

“শ্রদ্ধেয়, মহার্ঘ, অতুলনীয়, দেখা পাওয়া দুর্লভ ও

অতুলনীয় সত্ত্বদের পরিভোগ্য জিনিসকেই রত্ন বলা হয়।”

**শ্রেষ্ঠ** মানে হচ্ছে উত্তম, সেরা, উৎকৃষ্ট। এভাবে এই গাথাপদের দ্বারা স্বর্গের বহুশত যোজনপ্রমাণ সর্ববিধ রত্নময় বিমানগুলোর মধ্যে সুধর্মা ও বৈজয়ন্ত প্রাসাদ ইত্যাদিতে যা কিছু মালিকানাধীন রত্ন, এবং বুদ্ধোৎপত্তি-বিরহিত হয়ে অপায়ে গমনকারী সত্ত্বদের শূন্যবিমানে পড়ে থাকা যা কিছু মালিকবিহীন রত্ন, অথবা পৃথিবী, মহাসমুদ্র, হিমালয় ইত্যাদিতে থাকা অন্য কোনো রত্ন, সেগুলোকেই এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

**সেগুলোর কোনোটিই তথাগতের সমান নয়**। এখানে **সমান** মানে হচ্ছে সমতুল্য। **তথাগতের** মানে হচ্ছে বুদ্ধের। এতে কী বলা হয়েছে? যেসব বিত্ত কিংবা রত্নগুলো দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে সেগুলোর একটি রত্নও বুদ্ধরত্নের সমতুল্য নয়। যেগুলোকে **শ্রদ্ধেয় অর্থে রত্ন** বলা হয়েছে, যেমন: চক্রবর্তী রাজার চক্ররত্ন ও মণিরত্ন, যা উৎপন্ন হলে বহু মানুষ আর অন্যত্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে না, কেউই আর ফুল-সুগন্ধি ইত্যাদি নিয়ে যক্ষের স্থানে কিংবা ভূতের স্থানে গমন করে না, সবাই চক্ররত্নকে ও মণিরত্নকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, পুজো করে, বিভিন্ন আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, কারো কারো প্রার্থনা পূরণ হয়, সেই রত্নও বুদ্ধরত্নের সমতুল্য হয় না। যদি শ্রদ্ধেয় অর্থে রত্ন হয় তা হলে তথাগতও রত্ন। কারণ তথাগত উৎপন্ন হলে যেসব প্রভাবশালী দেবতা ও মানুষেরা আছেন তাঁরা আর অন্যত্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন না, অন্য কাউকেই পুজো করেন না। ঠিক একইভাবে সহম্পতি ব্রহ্মাও সিনেরু পর্বতের সমান রত্নমাল্য দিয়ে তথাগতকে পুজো করেন, এবং অন্যান্য দেবতা ও মানুষেরা এবং বিম্বিসার, কোশলরাজ, অনাথপিণ্ডিক ইত্যাদি ব্যক্তিরাও সাধ্যমতো পুজো করেন। পরিনির্বাপিত হওয়ার পরও ভগবানের উদ্দেশ্যে ছিয়ানব্বই কোটি ধন ব্যয় করে মহারাজ অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপে চুরাশি হাজার বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্যদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথাই-বা কী! অধিকন্তু অন্য কেউ পরিনির্বাপিত হলে তাঁর উদ্দেশ্যেও, অথবা ভগবানের জন্ম, বোধিলাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন ও পরিনির্বাণ লাভের স্থান, কিংবা বুদ্ধপ্রতিমা, চৈত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও এইভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে, গৌরব করে থাকে, যেমনটা করেছেন ভগবানের প্রতি। এভাবে শ্রদ্ধেয় অর্থেও তথাগতের সমতুল্য অন্য কোনো রত্ন নেই।

ঠিক তদ্রূপ, যেগুলোকে **মহার্ঘ অর্থে রত্ন** বলা হয়েছে, যেমন: কাশীবস্ত্র। যেমনটা বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, কাশীবস্ত্র পুরোনো হলেও তা উজ্জ্বল, মসৃণ ও মহার্ঘ হয়।” কিন্তু সেটিও বুদ্ধরত্নের সমতুল্য হয় না। যদি মহার্ঘ অর্থে রত্ন হয় তা হলে তথাগতও রত্ন। তথাগত যদি কারো কাছ থেকে কাদাও গ্রহণ করেন সেটি তাদের জন্য মহাফলদায়ক হয়, মহাসুফলদায়ক হয়, যেমন অশোক রাজার হয়েছিল। এটি হয় তাঁর মহার্ঘতার জন্যই। এভাবেই মহার্ঘতার কথায় নির্দোষভাব সাধনকারী এই সূত্রপদকে বুঝতে হবে—

“তিনি যাদের কাছ থেকে চীবর, ভিক্ষান্ন, বাসস্থান, রোগীর ওষুধপথ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করেন, সেটি তাদের জন্য মহাফলদায়ক ও মহাসুফলদায়ক হয়। এটি হয় তাঁর মহার্ঘতার জন্যই, আমি বলি। যেমন, হে ভিক্ষুগণ, সেই কাশীবস্ত্র মহার্ঘ, এই ব্যক্তিও ঠিক সে-রকম, আমি বলি।” (অ.নি.৩.১০০)

এভাবেই মহার্ঘ অর্থেও তথাগতের সমতুল্য কোনো রত্ন নেই।

ঠিক তদ্রূপ, যেগুলোকে **অতুলনীয় অর্থে রত্ন** বলা হয়েছে, যেমন: চক্রবর্তী রাজার **চক্ররত্ন** উৎপন্ন হয় যার মধ্যে থাকে ইন্দ্রনীল মণিময় চক্রনাভি, সপ্তরত্নময় হাজারটি শিক, প্রবালময় চক্রনেমি, লাল স্বর্ণময় সন্ধি, যার দশটি করে শিকের ওপর থাকে একটি করে খালি শিক, যাতে করে বাতাস টেনে শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, সেই শব্দ সুদক্ষ বাদকের বাজানো পঞ্চাঙ্গিক তূর্যশব্দের মতো হয়ে থাকে। যার চক্রনাভির উভয় পাশে দুটি সিংহমুখ থাকে, যার ভেতরটি থাকে শকটের চাকার মতো ছিদ্রযুক্ত, সেই চক্ররত্নের কোনো কর্তা বা নির্মাতা নেই, সেটি কর্মের কারণেই ঋতু থেকে আপনাআপনি উৎপন্ন হয়। যেটিকে রাজা দশ প্রকার চক্রবর্তী-ব্রত পূরণ করে, সেদিনের পঞ্চদশী পূর্ণিমার উপোসথ দিনে মাথাসহ স্নান করে উপোসথশীল গ্রহণ করে, প্রাসাদের ওপরতলায় গিয়ে, শীলগুলোকে পরিশুদ্ধ করতে করতে বসে থাকা অবস্থায় পূর্ণচন্দ্রের মতো এবং সূর্যের মতো উদয় হতে দেখেন, যার শব্দ বারো যোজন দূর হতে শোনা যায়, যার বর্ণ এক যোজন দূর হতে দেখা যায়, যেটিকে বিশাল জনতা “মনে হয় দ্বিতীয় চন্দ্র বা সূর্য উদিত হয়েছে” ভেবে অতীব কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে দেখার সময় নগরের ওপরে এসে, রাজার অন্তঃপুরের পূর্বপাশে অতিরিক্ত উঁচুও নয়, আবার অতিরিক্ত নিচুও নয় এমন উপযুক্ত স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়ায় যে, যাতে বিশাল জনতার পক্ষে সুগন্ধি, ফুল ইত্যাদি দিয়ে পুজো করতে সুবিধা হয়।

তার পরপরই **হস্তীরত্ন** উৎপন্ন হয়, যার সর্বাঙ্গ সাদা, পাগুলো লাল, যার ওপর সত্ত্বগণের বসার প্রশস্ত স্থান আছে, ঋদ্ধিমান, আকাশপথে গমনকারী এবং সেটি উপোসথকুল কিংবা ছদ্দন্তকুল হতেই আসে। উপোসথকুল হতে আসলে সর্বজ্যেষ্ঠটিই আসে, আর ছদ্দন্তকুল হতে আসে সর্বকনিষ্ঠটি, যেটি অত্যন্ত সুপ্রশিক্ষিত ও দমনযোগ্য। সেটি বারো যোজন দীর্ঘ পরিষদকে নিয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপ পরিদর্শন করে প্রাতরাশের আগেই নিজ রাজধানীতে ফিরে আসতে পারে।

তার পরপরই **অশ্বরত্ন** উৎপন্ন হয়, যার সর্বাঙ্গ সাদা, পাগুলো লাল, মাথাটি কাকের মতো, কেশরাশি মুঞ্জতৃণের মতো এবং যেটি আসে মেঘের রাজকুল হতে। বাকিগুলো হস্তীরত্নের মতোই।

তার পরপরই **মণিরত্ন** উৎপন্ন হয়। সেটি হয় মণি, বৈদূর্য, সুন্দর, উঁচুমানের, আটকোনা, সুন্দরভাবে নির্মিত, দৈর্ঘ্যে চক্রনাভির মতো এবং সেটি আসে বৈপুল্ল-পর্বত হতে। সেটি ঘুটঘুটে কালো ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও রাজার ধ্বজাগ্র হতে এক যোজন দূর পর্যন্ত আলোকিত করে, যার আলোয় মানুষেরা “দিন” মনে করে কাজকর্মে নিয়োজিত হয়, এমনকি পিঁপড়ে-উইপোকাকে পর্যন্ত দেখতে পারে।

তার পরপরই **স্ত্রীরত্ন** উৎপন্ন হয়। সে সাধারণ অগ্রমহিষীও হতে পারে, আবার উত্তরকুরু কিংবা মদ্দরাজকুল হতেও আসতে পারে। সে অতি লম্বা ইত্যাদি ছয়টি দোষ বর্জিত হয়ে থাকে। তার গায়ের রং মানুষের গায়ের রঙের চেয়ে উজ্জ্বল হয়, তবে পুরোপুরি দিব্যবর্ণের মতোও নয়। সে রাজার দেহকে শীতকালে উষ্ণ করে রাখে, আর গরমকালে শীতল করে রাখে। তার গায়ের স্পর্শ হয় নরম কার্পাস তুলোর মতো। তার দেহ হতে চন্দনের গন্ধ বের হয়, মুখ হতে বের হয় পদ্মফুলের গন্ধ। সে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি বহুগুণে গুণান্বিত হয়।

তার পরপরই **গৃহপতিরত্ন** উৎপন্ন হয়, রাজার সাধারণ কর্মচারীটি হয় শ্রেষ্ঠী, চক্ররত্ন উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দিব্যচোখ উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা সে চারপাশে এক যোজন এলাকার মধ্যেকার মালিকানাধীন ও মালিকবিহীন গুপ্তধনগুলো দেখতে পায়। সে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে আহ্বান জানায়—“প্রভু, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, যা ধন লাগে আমিই আপনাকে দেব।”

তার পরপরই **উপদেষ্টারত্ন** উৎপন্ন হয়, রাজার সাধারণত একজন জ্যেষ্ঠপুত্র থাকে, চক্ররত্ন উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে অতীব প্রজ্ঞাবান ও অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। সে নিজের চিত্ত দিয়ে বারো যোজন জায়গা জুড়ে থাকা পরিষদের মনের অবস্থা জেনে (প্রয়োজনে) তাদের দমন ও উৎসাহদান করতে সক্ষম। সে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে আহ্বান জানায়—“প্রভু, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আমিই আপনার রাজ্য অনুশাসন করব।” অথবা অন্য যা কিছু এইভাবে অতুলনীয় অর্থে রত্ন হয়, “এটি একশো টাকা মূল্যের, বা এটি হাজার টাকা মূল্যের, অথবা এটি কোটি টাকা মূল্যের” এভাবে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করে যেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এখানে এই ধরনের একটি রত্নও বুদ্ধরত্নের সমতুল্য নয়। যদি অতুলনীয় অর্থে রত্ন হয় তা হলে তথাগতও রত্ন। তথাগতের শীল, সমাধি বা প্রজ্ঞা ইত্যাদির কোনো একটিকেও কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করে “এটি এত গুণের অধিকারী, অথবা এটি এর সমান বা সদৃশ” এভাবে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। এভাবেই অতুলনীয় অর্থেও তথাগতের সমতুল্য কোনো রত্ন নেই।

ঠিক তদ্রূপ, যেগুলোকে **দেখা পাওয়া দুর্লভ অর্থে রত্ন** বলা হয়েছে, যেমন: চক্রবর্তী রাজা ও তার চক্ররত্ন ইত্যাদি রত্নের আবির্ভাব দুর্লভ, সেগুলোও বুদ্ধরত্নের সমতুল্য নয়। যদি দেখা পাওয়া দুর্লভ অর্থে রত্ন হয় তা হলে তথাগতও রত্ন, চক্রবর্তী ইত্যাদির রত্নত্ব আবার কী, সেগুলো তো একই কল্পে অনেকগুলোই উৎপন্ন হয়। কিন্তু যেহেতু অনেক সময় জগতে অসংখ্য কল্পকাল ধরে কোনো তথাগতের উৎপত্তি হয় না, তাই কখনো কখনো উৎপত্তির ভিত্তিতে তথাগতের দেখা পাওয়া দুর্লভ। ভগবান নিজেই পরিনির্বাণের সময় এই কথা বলেছেন:

“হে আনন্দ, দেবতারা ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল এই বলে যে, “আহা, আমরা অনেক দূর থেকে তথাগতের দর্শন পাওয়ার জন্য এসেছি, কখনো কখনো তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ জগতে উৎপন্ন হন, আজই রাতের শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বাণ হবে, এই প্রভাবশালী ভিক্ষু ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করছেন, যার ফলে আমরা শেষকালে তথাগতের দর্শন লাভ করতে পারছি না।” (দী.নি.২.২০০)

এভাবেই দেখা পাওয়া দুর্লভ অর্থেও তথাগতের সমতুল্য কোনো রত্ন নেই।

ঠিক তদ্রূপ, যেগুলোকে **অতুলনীয় সত্ত্বদের পরিভোগ্য জিনিস অর্থে রত্ন** বলা হয়েছে, যেমন: চক্রবর্তী রাজার চক্ররত্ন ইত্যাদি। সেগুলো লক্ষ-কোটি ধনের মালিকদেরও উৎপন্ন হয় না, সাততলা প্রাসাদে বসবাসকারীদেরও না, আর চণ্ডাল-বেন-ব্যাধ-রথকার-পুক্কুস ইত্যাদি নীচকুলের নিচুশ্রেণির মানুষদের স্বপ্নেও সেগুলো পরিভোগের জন্য উৎপন্ন হয় না। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়কুলে পরিশুদ্ধভাবে জন্ম নেওয়া ও দশ প্রকার চক্রবর্তী-ব্রত পরিপূরণ করা ক্ষত্রিয় রাজার পরিভোগের জন্য উৎপন্ন হওয়ার ভিত্তিতে সেগুলো অতুলনীয় সত্ত্বদের পরিভোগ্য জিনিস হয়, কিন্তু সেগুলোও বুদ্ধরত্নের সমতুল্য হয় না। যদি অতুলনীয় সত্ত্বদের পরিভোগ্য জিনিস অর্থে রত্ন হয় তা হলে তথাগতও রত্ন। জগতে যারা অতুলনীয় সত্ত্ব হিসেবে গণ্য হওয়া, অতীত পুণ্যহেতুহীন, বিপরীত দর্শনসম্পন্ন পূরণ-কাশ্যপ ইত্যাদি ছয়জন শাস্তা এবং এই জাতীয় অন্যান্যরা আছে তারা স্বপ্নেও তথাগতকে পরিভোগ করতে পারে না, কিন্তু যাঁরা অতীত পুণ্যহেতুসম্পন্ন, চতুষ্পদী গাথা শুনে অর্হত্ত্ব লাভ করতে সমর্থ, তীক্ষ্ণভেদী জ্ঞানদর্শনসম্পন্ন বাহিয় দারুচিরিয়ের মতো এবং মহান সব পরিবার হতে আগত অন্যান্য মহাশ্রাবকরা আছেন তাঁরা তথাগতকে পরিভোগ করতে পারেন। তাঁরা তাঁকে অনুত্তর দর্শন, অনুত্তর শ্রবণ, অনুত্তর কর্তব্য ইত্যাদি সাধন করে বিভিন্নভাবে পরিভোগ করেন। এভাবেই অতুলনীয় সত্ত্বদের পরিভোগ্য জিনিস অর্থেও তথাগতের সমতুল্য কোনো রত্ন নেই।

যেগুলোকে **রতির জন্ম দেয় অর্থে রত্ন** বলা হয়েছে, যেমন: চক্রবর্তী রাজার চক্ররত্ন। তাকে দেখে চক্রবর্তী রাজা খুশি হন, একইভাবে তা রাজার মনে রতিরও জন্ম দেয়। পুনরায় চক্রবর্তী রাজা বাম হাতে সোনার জগ নিয়ে, ডান হাত দিয়ে চক্ররত্নে ছিটিয়ে দেন এই বলে—“সম্মাননীয় চক্ররত্নটি চলতে শুরু করুক! সম্মাননীয় চক্ররত্নটি বিজয়ী হোক!” তখন চক্ররত্নটি পঞ্চাঙ্গিক তূর্যের ন্যায় মধুর স্বর নির্গত করতে করতে আকাশপথে পূর্বদিকে গমন করে, সেই সঙ্গে চক্রবর্তী রাজা সেই চক্ররত্নের প্রভাবে বারো যোজন বিস্তৃত চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনী নিয়ে, বেশি উঁচুও নয় আবার বেশি নিচুও নয় এমনভাবে উঁচু উঁচু গাছগুলোর নিচ দিয়ে, আর নিচু গাছগুলোর ওপর দিয়ে, গাছগুলোর ফুল-ফল-পাতা ইত্যাদি উপহার নিয়ে আগত লোকদের হাত থেকে উপহার গ্রহণ করতে করতে, “আসুন, মহারাজ” ইত্যাদি বলে পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করে সেখানে আগত বিপক্ষীয় রাজাদের “কোনো প্রাণীকে হত্যা করা উচিত নয়” ইত্যাদি প্রকারে অনুশাসন করতে করতে গমন করেন। কিন্তু রাজা যেখানে ভোজন করতে ইচ্ছুক হন, অথবা দিনের বেলা বিশ্রাম নিতে চান, সেখানেই চক্ররত্নটি আকাশ থেকে অবতরণ করে, জল পাওয়া যায় ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আছে এমন উপযুক্ত সমতল জায়গায় অক্ষতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পুনরায় রাজার গমনচিত্ত উৎপন্ন হলে আগের মতো করেই চক্ররত্নটি শব্দ করতে করতে গমন করে, যা শুনে বারো যোজন দীর্ঘ পরিষদ আকাশপথে গমন করে। চক্ররত্নটি পর্যায়ক্রমে পূর্বদিকের সমুদ্রে অবগাহন করে, সেখানে অবগাহনের সময় এক যোজন পরিমাণ জল সরে গিয়ে ঠেস দেওয়ার মতো করে স্থির হয়ে থাকে। তখন বিশাল জনতা ইচ্ছেমতো সপ্ত রত্ন গ্রহণ করে। পুনরায় রাজা সোনার জগ নিয়ে “এখান থেকেই আমার রাজ্য” বলে জল ছিটিয়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর আগে আগে সৈন্যরা গমন করে, চক্ররত্নটি তাদের পরে, আর রাজা থাকেন মাঝখানে। চক্ররত্নটি সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটি আবার জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরদিকের সমুদ্রেও গমন করেন।

এভাবে চতুর্দিক পরিদর্শন করে চক্ররত্নটি আকাশে তিন যোজন ওপরে ওঠে। সেখানে দাঁড়িয়ে রাজা চক্ররত্নের প্রভাবে জয় করা পাঁচশো ছোটো ছোটো দ্বীপ-সমন্বিত ও সাত হাজার যোজন আয়তনবিশিষ্ট পূর্ববিদেহের দিকে, একইভাবে আট হাজার যোজন আয়তনবিশিষ্ট উত্তরকুরুর দিকে, সাত হাজার যোজন আয়তনবিশিষ্ট অপরগোয়ানের দিকে এবং দশ হাজার যোজন আয়তনবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপের দিকে, এভাবে চারটি মহানদী ও দুই হাজার ছোটো ছোটো দ্বীপ সমন্বিত একটি চক্রবাল তথা মহাবিশ্বের দিকে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মবনের দিকে তাকানোর মতো করে তাকান। এভাবে তাকানোর সময় তাঁর মনে অসামান্য রতি উৎপন্ন হয়। এভাবেই সেই চক্ররত্ন রাজার মনে রতির জন্ম দেয়, তারপরও সেটি বুদ্ধরত্নের সমতুল্য হয় না। যদি রতির জন্ম দেয় অর্থে রত্ন হয় তা হলে তথাগতও রত্ন। এই চক্ররত্ন কী করবে? তথাগত যে দিব্যরতির জন্ম দেন তার তুলনায় চক্ররত্ন ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে উৎপন্ন হওয়া চক্রবর্তী-রতি ষোলো ভাগের এক ভাগও হয় না, সেই রতি থেকে উত্তমতর ও শ্রেষ্ঠতর নিজের উপদেশ পালনকারী অসংখ্য দেবতা ও মানুষদের প্রথম ধ্যানের রতি, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যানের রতি, আকাশ-অনন্ত-আয়তন ধ্যানের রতি, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, আকিঞ্চন-আয়তন ও নৈব-সংজ্ঞা-না-অসংজ্ঞা-আয়তন ধ্যানের রতি, স্রোতাপত্তিমার্গের রতি, স্রোতাপত্তিফলের রতি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বমার্গফলের রতির জন্ম দেন। এভাবে রতির জন্ম দেয় অর্থেও তথাগতের সমতুল্য কোনো রত্ন নেই।

অধিকন্তু, রত্ন হচ্ছে দুই প্রকার; যথা: সপ্রাণ রত্ন ও নিষ্প্রাণ রত্ন। এখানে নিষ্প্রাণ রত্ন হচ্ছে চক্ররত্ন, মণিরত্ন, অথবা অন্য যা কিছু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সোনা-রুপো ইত্যাদি, আর সপ্রাণ রত্ন হচ্ছে হস্তীরত্ন ইত্যাদি এবং সবশেষে উপদেষ্টা রত্ন, অথবা অন্য যা কিছু এই রকম ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত এমন রত্ন। এভাবে এই দুই প্রকার রত্নের মধ্যে কিন্তু সপ্রাণ রত্নকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? কারণ, নিষ্প্রাণ সোনা-রুপো-মণি-মুক্তো ইত্যাদি রত্ন সপ্রাণ হস্তীরত্ন ইত্যাদির কাছেই অলংকার হিসেবে উপনীত হয়।

আবার, সপ্রাণ রত্নও দুই প্রকার; যথা: ইতর প্রাণীর রত্ন ও মানুষের রত্ন। তন্মধ্যে মানুষের রত্নকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? কারণ, ইতর প্রাণীর রত্ন মানুষের রত্নের আরোহণের যোগ্য হয়। মানুষের রত্নও দুই প্রকার; যথা: স্ত্রীরত্ন ও পুরুষরত্ন। তন্মধ্যে পুরুষরত্নকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? কারণ, স্ত্রীরত্ন পুরুষরত্নের সেবা-পরিচর্যায় নিয়োজিত হয়। পুরুষরত্নও দুই প্রকার; যথা: গৃহীরত্ন ও প্রব্রজিত-রত্ন। তন্মধ্যে প্রব্রজিত-রত্নকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? কারণ, গৃহীরত্নগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন চক্রবর্তী রাজা, তিনিও শীল ইত্যাদি গুণযুক্ত অনাগারিক প্রব্রজিত-রত্নকে পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করে, সেবা-শুশ্রূষা করে ও সান্নিধ্য লাভ করে, দিব্য ও মনুষ্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে, শেষে নির্বাণসম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

এভাবে আর্য ও সাধারণ ব্যক্তির ভিত্তিতে প্রব্রজিত-রত্নও দুই প্রকার। শৈক্ষ্য ও অশৈক্ষ্যের ভিত্তিতে আর্যরত্নও দুই প্রকার। শুষ্ক বিদর্শক ও শমথ যানিকের ভিত্তিতে অশৈক্ষ্য-রত্নও দুই প্রকার। শ্রাবক পারমীপ্রাপ্ত ও শ্রাবক পারমী অপ্রাপ্তের ভিত্তিতে শমথ যানিক রত্নও দুই প্রকার। তন্মধ্যে শ্রাবক পারমীপ্রাপ্তকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? গুণের দিক দিয়ে বেশি মহান হওয়ার কারণে। শ্রাবক পারমীপ্রাপ্ত রত্নের চাইতেও পচ্চেক-বুদ্ধরত্নকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? গুণের দিক দিয়ে বেশি মহান হওয়ার কারণে। সারিপুত্র ও মোগ্গল্লানের মতো বহুশত শ্রাবকও একজন পচ্চেক-বুদ্ধের গুণের শতভাগের একভাগের সমান হন না। আবার, পচ্চেক-বুদ্ধরত্নের চাইতেও সম্যকসম্বুদ্ধ-রত্নকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কেন? গুণের দিক দিয়ে বেশি মহান হওয়ার কারণে। সমগ্র জম্বুদ্বীপ জুড়ে গায়ে গা লাগিয়ে অর্থাৎ গা ঘেঁষাঘেষি করে পদ্মাসনে উপবিষ্ট পচ্চেক-বুদ্ধগণও মাত্র একজন সম্যকসম্বুদ্ধের গুণগুলোর সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনার যোগ্য হন না। ভগবান নিজেই এই কথাটি বলেছেন, “হে ভিক্ষুগণ, পদহীন বা... যত সত্ত্ব আছে, তথাগত তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য হন।” ইত্যাদি (সং.নি.৫.১৩৯; অ.নি.৪.৩৪; ৫.৩২; ইতিৰু.৯০) এভাবে কোনো প্রকারেই তথাগতের সমতুল্য কোনো রত্ন নেই। তাই ভগবান বলেছেন, “**সেগুলোর কোনোটিই তথাগতের সমান নয়।**”

এভাবে ভগবান বুদ্ধরত্ন অন্যান্য রত্নগুলোর সমান নয় বলার পর, এখন সেই সত্ত্বগণের উৎপন্ন উপদ্রবগুলো দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যে, কোনো জাতি-গোত্র কিংবা কোনো কুলপুত্রের বর্ণ-সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে নয়, শুধুমাত্র অবীচি থেকে শুরু করে একেবারে ভবাগ্র পর্যন্ত সমগ্র জগতে শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ ইত্যাদি গুণসমন্বিত বুদ্ধরত্নের অসদৃশতার ওপর ভিত্তি করে সত্যবাক্য প্রয়োগ করলেন এই বলে—“**এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।**”

তার অর্থ হচ্ছে এই: **এই** মানে হচ্ছে ইহলোকে বা পরলোকে, অথবা স্বর্গে যা কিছু বিত্ত কিংবা রত্ন আছে সেগুলোর সঙ্গে পূর্বোক্ত গুণগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সমতা বা সাদৃশ্য না থাকায় **বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন**। যদি এটি সত্য হয় তা হলে **এই সত্যের দ্বারা** এইসব প্রাণীদের **স্বস্তি হোক**, অর্থাৎ তারা সবাই সুন্দর হোক, রোগহীন ও নিরুপদ্রব হোক। এখানে যেমন “হে আনন্দ, চোখ আত্মাশূন্য, অথবা আত্মার অধিকারী নয়।” এভাবে ইত্যাদিতে (সং.নি.৪.৮৫) আত্মা হিসেবে বা আত্মার অধিকারী হিসেবে, এই হচ্ছে এর অর্থ। অন্যথায় চোখ আত্মা অথবা আত্মার অধিকারী, এটি নিষিদ্ধ হয়ে যেত না। এভাবেই **শ্রেষ্ঠ রত্ন** মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রত্নত্ব, শ্রেষ্ঠ রত্নভাব, এই অর্থই বুঝতে হবে। অন্যথায় ‘বুদ্ধ কোনো রত্ন নন’ এই কথা সিদ্ধ হয়ে যাবে। যেখানে কোনো রত্ন নেই সেখানে তিনিই রত্ন বলে সিদ্ধ হন। কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধেয় ইত্যাদি অর্থে নামক পূর্বোক্ত যেকোনো বিধির সঙ্গে সম্পর্কিত রত্নত্ব আছে, যেহেতু সেই রত্নত্বের কারণেই রত্ন হিসেবে পরিচিত হয়, তাই সেই রত্নত্ব থাকায় রত্ন বলে সিদ্ধ হন। অথবা **এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন** মানে এই কারণেই বুদ্ধই হচ্ছেন রত্ন, এভাবেই এখানে এর অর্থ বুঝতে হবে। ভগবান এই গাথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপরিবারের মনে স্বস্তি দেখা দিল, ভয় দূর হলো। এই গাথার আদেশ লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘ক্ষয়, বিরাগ’ গাথাটির বর্ণনা

৪. এভাবে বুদ্ধগুণের দ্বারা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন নির্বাণধর্মের গুণের কথা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**ক্ষয়, বিরাগ।**” এখানে যেহেতু নির্বাণ সাক্ষাৎ করার দ্বারাই লোভ ইত্যাদি ক্ষীণ হয়, পরিক্ষীণ হয়, অথবা যেহেতু সেটি শুধু তাঁদের অনুৎপত্তি, নিরোধ ও ক্ষয়, যেহেতু সেই লোভ ইত্যাদি বিযুক্তকে সংযোজন ও বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে, অথবা যেহেতু সেটি সাক্ষাৎ করলে লোভ ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন হয়, বিগত হয়, বিধ্বস্ত হয়, তাই “**ক্ষয়**” ও “**বিরাগ**” বলা হয়েছে। যেহেতু তার কোনো উৎপত্তি দেখা যায় না, ব্যয় ও স্থিতির অন্যথাভাবও দেখা যায় না, তাই তা জন্মায় না, জীর্ণ হয় না, মরে না এই অর্থে “**অমৃত**” বলা হয়েছে, আর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অর্থে “**উৎকৃষ্ট**” বলা হয়েছে। **যা অধিগত করেছেন** মানে হচ্ছে লাভ করেছেন, অর্জন করেছেন, নিজের জ্ঞানবলে সাক্ষাৎ করেছেন। **শাক্যমুনি** মানে হচ্ছে শাক্যকুলে জন্ম নিয়েছেন বিধায় শাক্য, মোনেয়্যধর্মে সমন্বিত হয়েছেন বিধায় মুনি, শাক্যই হচ্ছেন মুনি অর্থাৎ শাক্যমুনি। **সমাহিত** মানে হচ্ছে আর্যমার্গ-সমাধির দ্বারা সমাহিত-চিত্ত। **সেই ধর্মের সমতুল্য কিছুই নেই** মানে হচ্ছে সেই ক্ষয় ইত্যাদি নামক যা শাক্যমুনি অধিগত করেছেন সেই ধর্মের সমতুল্য কিছুই নেই। তাই বিভিন্ন সূত্রেও বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, যতগুলো সৃষ্ট কিংবা অসৃষ্ট ধর্ম আছে, সেগুলোর মধ্যে বিরাগকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়” ইত্যাদি। (অ.নি.৪.৩৪; ইতিৰু.৯০)

এভাবে ভগবান অন্যান্য ধর্মগুলোর সঙ্গে নির্বাণধর্মের অসমতার কথা বলার পর, এখন সেই সত্ত্বগণের মাঝে উৎপন্ন উপদ্রবগুলোকে দূর করে দেওয়ার লক্ষ্যে ক্ষয়-বিরাগ-অমৃত-উৎকৃষ্টতা গুণবিশিষ্ট নির্বাণ-ধর্মরত্নের অসদৃশ-ভাবের ওপর ভিত্তি করে সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যেই’ গাথাটির বর্ণনা

৫. এভাবে নির্বাণধর্মগুণের দ্বারা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন মার্গধর্মগুণের দ্বারা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যেই শুচির কথা প্রকাশ করেছেন।**” এখানে “সত্যগুলো বুঝেছেন” ইত্যাদি (মহানি.১৯২; চূল়নি. পারাযনত্থুতিগাথানিদ্দেস ৯৭; পটি.ম.১.১৬২) প্রকারে বুদ্ধ উত্তম, প্রশংসনীয় ও শ্রেষ্ঠ হন; এবং বুদ্ধই সেই শ্রেষ্ঠ এই অর্থে **বুদ্ধশ্রেষ্ঠ**। অথবা অনুবুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ নামক বুদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই অর্থে বুদ্ধশ্রেষ্ঠ। সেই বুদ্ধশ্রেষ্ঠ **যা প্রকাশ করেছেন**, অর্থাৎ “নির্বাণ লাভের জন্য মার্গের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গই শান্তিপূর্ণ।” (ম.নি.২.২১৫) এবং “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের কারণযুক্ত ও উপকরণযুক্ত আর্য সম্যক সমাধি সম্বন্ধে দেশনা করব।” (ম.নি.৩.১৩৬) এভাবে ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্ন স্থানে প্রশংসা করেছেন, প্রকাশ করেছেন। **শুচি** মানে হচ্ছে কলুষতার মলকে দূর করে দেওয়ায় অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ। **আনন্তরিক সমাধি বলা হয়** মানে হচ্ছে যা নিজে উৎপন্ন হওয়ার পরপরই নিয়মমাফিক ফলদানের ভিত্তিতে “আনন্তরিক সমাধি” বলা হয়। মার্গসমাধি উৎপন্ন হলে তার ফল উৎপত্তিতে বাধা দেবে এমন কোনো অন্তরায় জগতে নেই। যেমনটি বলা হয়েছে:

“এই ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করতে নিযুক্ত হয়েছেন এবং কল্প দগ্ধ হওয়ার সময়ও উপস্থিত, এমতাবস্থায় যতক্ষণ এই ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ না করেন ততক্ষণ কল্প দগ্ধ হবে না, এই ব্যক্তিকেই বলা হয় স্থিতকল্পী। সকল মার্গস্থ ব্যক্তিই স্থিতকল্পী।” (পু.প.১৭)

**সেই সমাধির সমতুল্য কিছুই নেই** মানে হচ্ছে সেই বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্তৃক বর্ণিত শুচি নামক আনন্তরিক সমাধির সমতুল্য কোনো রূপাবচর-সমাধি বা অরূপাবচর-সমাধি বিদ্যমান নেই। কেন? কারণ, সেসব সমাধি গড়ে তোলায় বিভিন্ন ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেও পুনরায় নিরয় ইত্যাদিতে উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এই অর্হত্ত্ব-সমাধি গড়ে তুললে আর্যব্যক্তির সব ধরনের উৎপত্তিই ধ্বংস হয়ে যায়। তাই বিভিন্ন সূত্রেও বলা হয়েছে, “হে ভিক্ষুগণ, যত প্রকার সৃষ্ট ধর্ম আছে তাদের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ বলা হয়।” (অ.নি.৪.৩৪; ইতিৰু.৯০)

এভাবে ভগবান অন্যান্য সমাধির সঙ্গে আনন্তরিক সমাধির অসমতাকে তুলে ধরার পর, এখন আগের মতো করেই মার্গধর্মরত্নের অসদৃশতার ওপর ভিত্তি করে সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই ধর্মরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সত্যের দ্বারা স্বস্তি হোক।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘যে আটজন ব্যক্তি’ গাথাটির বর্ণনা

৬. এভাবে মার্গধর্মগুণের দ্বারা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন সংঘগুণের দ্বারা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**যে আটজন ব্যক্তি।**” এখানে **যে** মানে হচ্ছে অনির্দিষ্টভাবে বলা কথা। **ব্যক্তি** মানে হচ্ছে সত্ত্ব। **আটজন** (*অট্ঠ*) মানে হচ্ছে তাঁদের গোনার সংখ্যা। তাঁরা চারজন মার্গস্থ এবং চারজন ফলস্থ, এভাবেই আটজন হন। **সৎপুরুষের দ্বারা প্রশংসিত** (*সতং পসত্থা*) মানে হচ্ছে সৎপুরুষ বুদ্ধ, পচ্চেক-বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের দ্বারা এবং অন্যান্য দেবতা ও মানুষদের দ্বারা প্রশংসিত। কেন? কারণ, তাঁদের মধ্যে সহজাত আকারে শীল ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে। স্বর্ণচাঁপা, বকুলফুল ইত্যাদির সহজাত বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদির মতো তাঁদের মধ্যে সহজাত আকারে শীল-সমাধি ইত্যাদি গুণ বিদ্যমান আছে। তাই তাঁরা বর্ণ-গন্ধ ইত্যাদি-সম্পন্ন ফুলের ন্যায় সৎ দেবতা ও মানুষদের কাছে প্রিয়, মনোজ্ঞ ও প্রশংসনীয় হন। তাই বলা হয়েছে, “যে আটজন ব্যক্তি সৎপুরুষের দ্বারা প্রশংসিত।”

অথবা, **যে** মানে হচ্ছে অনির্দিষ্টভাবে বলা কথা। **ব্যক্তি** মানে হচ্ছে সত্ত্ব। **একশো আটজন** (*অট্ঠ সতং*)মানে হচ্ছে তাঁদের গোনার সংখ্যা। তাঁরা একবীজী, কোলংকোল ও সাতবার পরম এই তিনজন স্রোতাপন্ন; কাম-রূপ-অরূপভবে ফললাভী তিনজন সকৃদাগামী; তাঁরা সবাই চারটি উপায় (*পটিপদা*) অনুসারে চব্বিশজন; মধ্যবর্তী পরিনির্বাণলাভী, উপহত পরিনির্বাণলাভী, সৃষ্টিসহকারে পরিনির্বাণলাভী, সৃষ্টিবিহীনভাবে পরিনির্বাণলাভী, ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী—অবৃহের মধ্যে এই পাঁচজন; অতপ্প-সুদর্শন-সুদর্শীর মধ্যেও সংখ্যাটি একই। কিন্তু অকনিষ্ঠের মধ্যে ঊর্ধ্বস্রোতা বাদে মোট চারজন; এই চব্বিশজন অনাগামী; শুষ্ক বিদর্শক ও শমথ যানিক দুজন অর্হৎ এবং চারজন মার্গস্থ ব্যক্তি, মোট চুয়ান্নজন। তাঁরা সবাই শ্রদ্ধাধুর ও প্রজ্ঞাধুরের ভিত্তিতে দ্বিগুণ হয়ে সর্বমোট একশো আটজন হন। বাকিগুলো পূর্ববৎ।

**তাঁরা জোড়া হিসেবে চার জোড়া** মানে হচ্ছে তাঁরা সবাই বিস্তারিতভাবে বললে আটজন অথবা একশো আটজন ব্যক্তি, আর সংক্ষেপে বললে স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ও ফলস্থ এক জোড়া, একইভাবে অর্হত্ত্বমার্গস্থ ও ফলস্থ পর্যন্ত এক জোড়া, এভাবে মোট চার জোড়া। **তাঁরা দক্ষিণাযোগ্য** মানে এখানে **তাঁরা** হচ্ছে পূর্বে অনির্দিষ্টভাবে বলার পর এখন নির্দিষ্ট করে বলা কথা। যে ব্যক্তিরা বিস্তারিতভাবে বললে আটজন অথবা একশো আটজন হন, আর সংক্ষেপে বললে চার জোড়া হন বলা হয়েছে, তাঁরা সবাই দক্ষিণা লাভের যোগ্য এই অর্থে দক্ষিণাযোগ্য। দক্ষিণা মানে হচ্ছে কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করে “ইনি আমার এই চিকিৎসা করবেন বা হাঁটু মালিশ করে দেবেন” এভাবে ইত্যাদি প্রত্যাশা না করে দানীয় বস্তু দান দেওয়া, সেগুলো পাওয়ার যোগ্য মানে হচ্ছে তাঁরা শীল ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তি। এঁরা সবাই সে-রকম, তাই তো বলা হয়েছে তাঁরা “দক্ষিণাযোগ্য”।

**সুগতের শিষ্য** মানে হচ্ছে ভগবান যিনি সুন্দরভাবে গমন করেছেন, সুন্দর স্থানে গমন করেছেন, সুষ্ঠুভাবে গমন করেছেন এবং সুষ্ঠুভাবে গত হয়েছেন, সেই সুগতের। তাঁরা সবাই কথা শোনেন এই অর্থে শিষ্য। অন্যরাও শোনেন, কিন্তু তারা তো সেগুলো মানেন না, পালন করেন না। এঁরা কিন্তু শোনার পর সেগুলোকে যথানিয়মে পালন করে, মেনে চলে মার্গফল লাভ করেছেন, তাই তাঁদের “শিষ্য” বলা হয়েছে। **এঁদের দান দিলে মহাফল লাভ হয়** মানে হচ্ছে এই সুগত-শিষ্যদের অল্পমাত্র দান দিলেও গ্রহীতার দিক থেকে দক্ষিণা-বিশুদ্ধি হয় বিধায় মহাফল পাওয়া যায়। তাই বিভিন্ন সূত্রের মধ্যেও বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, যত প্রকার সংঘ বা দল আছে তাদের মধ্যে তথাগতের শিষ্যসংঘকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়, যেমন এই চার জোড়া পুরুষ বা আটজন ব্যক্তি, এঁরাই ভগবানের শিষ্যসংঘ... শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়।” (অ.নি.৪.৩৪; ৫.৩২; ইতিৰু.৯০)

এভাবে ভগবান সকলের, অর্থাৎ মার্গস্থ ও ফলস্থের ভিত্তিতে সংঘরত্নের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘যাঁরা সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত’ গাথাটির বর্ণনা

৭. এভাবে মার্গস্থ ও ফলস্থের ভিত্তিতে সংঘগুণের দ্বারা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন তাঁদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ফলসমাপত্তিসুখ অনুভবকারী ক্ষীণাসব ব্যক্তিদের গুণের দ্বারা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**যাঁরা সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত।**” এখানে **যাঁরা** মানে হচ্ছে অনির্দিষ্টভাবে বলা কথা। **সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত** মানে সুষ্ঠুভাবে নিযুক্ত, অনেক প্রকার মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে, শুদ্ধ জীবিকার ওপর নির্ভর করে, বিদর্শন ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করতে শুরু করেছেন, এই হচ্ছে এর অর্থ। অথবা **সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত** মানে হচ্ছে পরিশুদ্ধ কায়িক-বাচনিক প্রয়োগের অধিকারী। এর দ্বারা তাঁদের শীলরাশিকে বুঝানো হয়েছে। **মানসিক দৃঢ়তা সহকারে** মানে হচ্ছে শক্ত মন নিয়ে, দৃঢ় সমাধিযুক্ত মন নিয়ে, এই হচ্ছে এর অর্থ। এর দ্বারা তাঁদের সমাধিরাশিকে বুঝানো হয়েছে। **নিষ্ক্রমণকারী** মানে হচ্ছে দেহ ও জীবনের প্রতি মায়া ত্যাগ করে, প্রজ্ঞাধুর ও উদ্যমের দ্বারা সমস্ত কলুষতা হতে বেরিয়ে আসা। এর দ্বারা তাঁদের উদ্যমসম্পন্ন প্রজ্ঞারাশিকে বুঝানো হয়েছে।

**গৌতম বুদ্ধের শাসনে** মানে হচ্ছে গোত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গৌতম তথাগতের শাসনে। এর দ্বারা এর বাইরে নানা প্রকার অমর তপস্যাকারীদের সুষ্ঠু প্রয়োগ ইত্যাদি গুণের অভাবের ভিত্তিতে কলুষতাগুলো হতে বেরিয়ে আসার অক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে। **তাঁরা** হচ্ছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের নির্দেশক শব্দ। **যা প্রাপ্তব্য তা লাভ করেছেন** মানে হচ্ছে এখানে প্রাপ্তব্য হচ্ছে অর্হত্ত্ব, যাকে পেয়ে তাঁরা পরিপূর্ণ যোগক্ষেমলাভী হন, এটি অর্হত্ত্বফলেরই নামান্তর। **অমৃতে** মানে হচ্ছে নির্বাণে। **ডুব দিয়ে** মানে হচ্ছে আলম্বন বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ডুব দিয়ে। **লাভ করে** মানে হচ্ছে পেয়ে। **বিনামূল্যে** মানে হচ্ছে মাত্র এক পয়সাও ব্যয় না করে। **শান্তি** মানে হচ্ছে কলুষতার যন্ত্রণাকে প্রশমিত করে ফলসমাপত্তি। **উপভোগ করছেন** মানে হচ্ছে অনুভব করছেন। এতে কী বলা হয়েছে? যাঁরা এই গৌতম বুদ্ধের শাসনে শীলসম্পন্ন হয়ে সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত হয়েছেন, মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে সমাধিসম্পন্ন হয়ে ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে নিষ্ক্রমণ করেছেন, তাঁরাই এই সম্যক উপায়ে অমৃতে ডুব দিয়ে বিনামূল্যে লাভ করে, ফলসমাপত্তি নামক শান্তি উপভোগ করছেন এবং যা প্রাপ্তব্য তা লাভ করেছেন।

এভাবে ভগবান ফলসমাপত্তিসুখ উপভোগকারী ক্ষীণাসব ব্যক্তিদের ভিত্তিতে সংঘরত্নের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘মাটিতে পোঁতা শক্ত খুঁটি’ গাথাটির বর্ণনা

৮. এভাবে ক্ষীণাসব ব্যক্তিদের গুণের দ্বারা সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন বহুজনের প্রত্যক্ষ করা স্রোতাপন্নের গুণের দ্বারা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**মাটিতে পোঁতা শক্ত খুঁটি যেমন।**” এখানে **যেমন** হচ্ছে উপমাকথা। **শক্ত খুঁটি** হচ্ছে এটি নগরদ্বারকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দ্বারের অভ্যন্তরে আট-দশ হাত মাটি খুঁড়ে দৃঢ়ভাবে পোঁতা শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি স্তম্ভেরই নামান্তর। **মাটিতে** মানে হচ্ছে ভূমিতে। **পোঁতা** মানে হচ্ছে গভীরে প্রবেশ করে স্থিত। **চতুর্দিকের বাতাসে** মানে হচ্ছে চারদিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে। **কম্পিত হয় না** মানে হচ্ছে কাঁপাতে পারে না, নড়াতে পারে না। **সৎপুরুষ** মানে হচ্ছে উত্তম পুরুষ। **যিনি আর্যসত্যকে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন** মানে হচ্ছে যিনি চার আর্যসত্যকে প্রজ্ঞা দ্বারা ডুব দিয়ে দর্শন করেন। এখানে আর্যসত্যকে *বিশুদ্ধিমার্গ* গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে।

এখানে এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে এই: মাটির গভীরে পোঁতা শক্ত খুঁটিকে যেমন চারদিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে কাঁপাতে পারে না, এই সৎপুরুষকেও আমি তেমনটিই বলি, যিনি আর্যসত্যকে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন। কেন? যেহেতু চারদিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে অকম্পিত থাকা শক্ত খুঁটির ন্যায় তিনিও সকল ভিন্নমতাবলম্বীদের মতবাদের বাতাসে কম্পিত হন না, অথবা তাঁর সেই দর্শন থেকে তাঁকে কেউই টলাতে পারে না, বা নড়াতে পারে না। তাই বিভিন্ন সূত্রের মধ্যেও বলা হয়েছে:

“যেমন, হে ভিক্ষুগণ, লোহার খুঁটি অথবা কাঠের খুঁটিকে গর্ত খুঁড়ে মাটির গভীরে না নড়ে মতো শক্ত করে পোঁতা হলে পূর্বদিক থেকে ধেয়ে আসা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সেটিকে কম্পিত করতে পারে না, টলাতে পারে না, নড়াতে পারে না। পশ্চিমদিক থেকে... দক্ষিণদিক থেকে... উত্তরদিক থেকে... নড়াতে পারে না। তার কারণ কী? কারণ, হে ভিক্ষুগণ, সেই খুঁটিটির গোড়া মাটি খুঁড়ে গভীরে পোঁতা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, যেসব শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ ‘এটি দুঃখ... এটি দুঃখনিরোধের উপায়’ বলে যথার্থভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তাঁরা অন্য শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকান না এই ভেবে যে, ‘এই মাননীয় নিশ্চয় জানেন, দেখেন।’ তার কারণ কী? কারণ, হে ভিক্ষুগণ, তাঁরা চার আর্যসত্যকে ভালো করে দর্শন করেছেন।” (সং.নি.৫.১১০৯)

এভাবে ভগবান বহুজনের প্রত্যক্ষ করা স্রোতাপন্নের ভিত্তিতে সংঘরত্নের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘যাঁরা আর্যসত্যকে’ গাথাটির বর্ণনা

৯. এভাবে সাধারণভাবে স্রোতাপন্নের গুণের দ্বারা সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন এই যে তিনজন স্রোতাপন্ন, যেমন: একবীজী, কোলংকোল ও সাতবার পরম। যেমনটি বলা হয়েছে:

“এখানে কোনো কোনো ব্যক্তি তিনটি সংযোজন ক্ষয় করে স্রোতাপন্ন হন... তিনি একবার মাত্র ভবে জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্তসাধন করেন, ইনি হচ্ছেন একবীজী। ঠিক একইভাবে দুই বা তিনটি কুলে পরিভ্রমণ করে, সঞ্চরণ করে দুঃখের অন্তসাধন করেন, ইনি হচ্ছেন কোলংকোল। ঠিক একইভাবে সাতবার মাত্র দেবতা ও মানুষদের মধ্যে পরিভ্রমণ করে, সঞ্চরণ করে দুঃখের অন্তসাধন করেন, ইনি হচ্ছেন সাতবার পরম।” (পু.প.৩১-৩৩)

তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সাতবার পরম স্রোতাপন্নের গুণের দ্বারা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**যাঁরা আর্যসত্যকে।**” এখানে **যাঁরা আর্যসত্যকে** মানে এটিকে পূর্বোক্ত নিয়মেই বুঝতে হবে। **প্রতিভাত করেন** মানে হচ্ছে প্রজ্ঞালোকের দ্বারা সত্যকে ঢেকে রাখা কলুষতার অন্ধকারকে দূর করে দিয়ে, নিজেই প্রকাশিত করেন, সুস্পষ্ট করেন। **গম্ভীর প্রাজ্ঞ কর্তৃক** মানে হচ্ছে অপ্রমেয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা, দেবতাসহ সাধারণ মানুষের জ্ঞানের দ্বারা অলভ্য প্রতিষ্ঠিত-প্রাজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ কর্তৃক বলা হয়েছে। **সুদেশিত** মানে হচ্ছে সমাস-ব্যাস-সম্পূর্ণতা-অপূর্ণতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে সুষ্ঠুভাবে দেশিত। **তাঁরা যদি খানিকটা প্রমত্তও হয়ে থাকেন** মানে হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে আর্যসত্যকে বোঝা সেই ব্যক্তিরা যদি দেবরাজত্ব, চক্রবর্তী রাজত্ব ইত্যাদি প্রমাদের বিষয়ের কারণে কিছুটা প্রমত্তও হয়ে থাকেন, তবুও স্রোতাপত্তি-মার্গজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টিমূলক চিত্তের নিরোধে, সাতজন্ম ব্যতীত অনাদি সংসারে যেসব বিষয় মন ও পদার্থ উৎপন্ন করায় তাঁদের সেগুলো নিরুদ্ধ হওয়ায়, অস্তগত হওয়ায় তাঁরা আর ভবে অষ্টমবার জন্মগ্রহণ করেন না, সপ্তম জন্মেই বিদর্শন শুরু করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

এভাবে ভগবান সাতবার পরম স্রোতাপন্নের ভিত্তিতে সংঘরত্নের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘সেই দর্শনসম্পদের সঙ্গে’ গাথাটির বর্ণনা

১০. এভাবে সাতবার পরম স্রোতাপন্নের অষ্টমবার জন্মগ্রহণ না করার গুণের দ্বারা সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন সেই সাতবার জন্মগ্রহণের সময়েও জন্মকে পরিত্যাগ করতে না পারা অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে তাঁর বিশেষ গুণের দ্বারা বলতে শুরু করলেন এই বলে, “**সেই দর্শনসম্পদের সঙ্গে।**” এখানে **দর্শনসম্পদের সঙ্গে** মানে হচ্ছে স্রোতাপত্তি-মার্গসম্পত্তির সঙ্গে। স্রোতাপত্তিমার্গ নির্বাণকে দেখে করণীয়-কর্তব্য সম্পদের দ্বারা সর্বপ্রথম নির্বাণকে দর্শনের ভিত্তিতে “দর্শন” বলা হয়। তা নিজের মধ্যে আবির্ভূত হয় বিধায় দর্শনসম্পদ, সেই দর্শনসম্পদের সঙ্গেই। **তিনটি বিষয় পরিত্যক্ত হয়** মানে হচ্ছে “হে সারিপুত্র, এমনই ছিল আমার সবচেয়ে নোংরা খাবার” এভাবে ইত্যাদির (ম.নি.১.১৫৬) মতো। যখন সেই দর্শনসম্পদের সঙ্গে তিনটি বিষয় পরিত্যক্ত হয়, ত্যক্ত হয়, এখানে এই হচ্ছে এর অর্থ।

এখন পরিত্যক্ত বিষয়গুলোকে দেখানোর জন্যই বললেন, “**আত্মদৃষ্টি, সন্দেহ, শীল ও ব্রতের মিথ্যাদৃষ্টি, অথবা যা কিছু আছে।**” এখানে কায় বিদ্যমান থাকলে সেই পাঁচটি আঁকড়ে ধরার পুঞ্জ নামক কায়ের প্রতি বিশ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ **আত্মদৃষ্টি**, অথবা এখানে কায়ের প্রতি মিথ্যাদৃষ্টি থাকলেই সেটি আত্মদৃষ্টি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে কায়ের প্রতি বিদ্যমান মিথ্যাদৃষ্টি, এই হচ্ছে এর অর্থ। অথবা কায়ের প্রতি মিথ্যাদৃষ্টি থাকলেই সেটি আত্মদৃষ্টি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে কায়ের মধ্যে পদার্থ ইত্যাদি নামক আত্মা বিদ্যমান রয়েছে, এভাবে উৎপন্ন হওয়া মিথ্যাদৃষ্টি, এই হচ্ছে এর অর্থ। এই আত্মদৃষ্টি পরিত্যক্ত হলেই সব ধরনের মিথ্যাদৃষ্টিই পরিত্যক্ত হয়। কারণ আত্মদৃষ্টিই হচ্ছে সেগুলোর মূল। সকল কলুষতা-ব্যাধির উপশমের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাকে “নিরাময়কারী” বলা হয়, এখান থেকে সেই প্রজ্ঞা-নিরাময়কারী বিগত হয়েছে, অথবা সেই প্রজ্ঞা-নিরাময়কারী হতে এটি বিগত হয়েছে এই অর্থে **সন্দেহ**, অর্থাৎ “শিক্ষকের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে” ইত্যাদি (ধ.স.১০০৮; ৰিভ.৯১৫) প্রকারে বর্ণিত আট ধরনের সন্দেহই এর অন্য নাম। এই সন্দেহ পরিত্যক্ত হলে সকল প্রকার সন্দেহই পরিত্যক্ত হয়। কারণ এই সন্দেহই হচ্ছে সেগুলোর মূল। “এর বাইরে (অর্থাৎ বুদ্ধশাসনের বাইরে) শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের শীলের দ্বারা শুদ্ধি হয়, ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি হয়” এভাবে ইত্যাদিতে (ধ.স.১২২২; ৰিভ.৯৩৮) উল্লেখিত গোশীল, কুকুরশীল ইত্যাদি শীলকে এবং গোব্রত, কুকুরব্রত ইত্যাদি ব্রতকে “শীল ও ব্রতের মিথ্যাদৃষ্টি” বলা হয়। এটি পরিত্যক্ত হলে সব ধরনের নগ্নতা, মাথা ন্যাড়া করা ইত্যাদি অমর তপস্যা পরিত্যক্ত হয়। কারণ এটিই হচ্ছে সেগুলোর মূল। তাই সবার শেষে বলা হয়েছে “**যা কিছু আছে।**” এখানে দুঃখদর্শন-সম্পদের দ্বারা আত্মদৃষ্টি, উৎপত্তি-দর্শনসম্পদের দ্বারা সন্দেহ, আর মার্গদর্শন বা নির্বাণদর্শন-সম্পদের দ্বারা শীল ও ব্রতের মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যক্ত হয় বলে জানতে হবে।

## ‘তিনি চার অপায় হতে’ গাথাটির বর্ণনা

১১. এভাবে তাঁর কলুষতার বৃত্ত পরিত্যাগকে তুলে ধরার পর, এখন সেই কলুষতার বৃত্ত বিদ্যমান থাকলে যেই বিপাক-বৃত্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে, অর্থাৎ কলুষতার বৃত্ত পরিত্যক্ত হলে সেই সঙ্গে বিপাক-বৃত্তও পরিত্যক্ত হয়, সেটি তুলে ধরতেই বললেন, “**তিনি চার অপায় হতে মুক্ত হন।**” এখানে চার অপায় মানে হচ্ছে নিরয়, ইতর প্রাণী, প্রেতবিষয় (অর্থাৎ প্রেতকুল) ও অসুরকায়; এই সত্ত্ব ভবকে আঁকড়ে ধরে থাকলেও সেগুলো হতে মুক্ত হন, এই হচ্ছে এর অর্থ।

এভাবে তাঁর বিপাক-বৃত্তের পরিত্যাগকে তুলে ধরার পর, এখন এই বিপাক-বৃত্তের মূল কর্মবৃত্ত, তার পরিত্যাগকে তুলে ধরতেই বললেন, “**ছয়টি গুরুতর পাপকাজ সম্পাদন করা তাঁর পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়।**” এখানে **গুরুতর পাপকাজ** মানে হচ্ছে মারাত্মক পাপকাজ, সেগুলো মোট ছয় প্রকার, তাঁর পক্ষে সেগুলো করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেগুলোকে “হে ভিক্ষুগণ, একজন দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর মাকে হত্যা করবে, এটি অসম্ভব, এর কোনো সুযোগ নেই” ইত্যাদি (অ.নি.১.২৭১; ম.নি.৩.১২৮; ৰিভ.৮০৯) প্রকারে একক নিপাতে বর্ণিত মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ-হত্যা, (বুদ্ধের দেহ থেকে) রক্তপাত, সংঘভেদ এবং শাস্তা কর্তৃক বর্ণিত অন্যান্য কর্মগুলো বুঝতে হবে। একজন দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যশ্রাবক এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে ও উইপোকাকে পর্যন্ত হত্যা করেন না, তা সত্ত্বেও মূলত এখানে সাধারণ ব্যক্তির অবস্থাকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যেই সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। একজন সাধারণ ব্যক্তি দৃষ্টিসম্পন্ন না হওয়ায় এই ধরনের মহাদোষযুক্ত গুরুতর পাপকাজ করে থাকে, কিন্তু একজন দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সেসব পাপকাজ করা অসম্ভব। এখানে অসম্ভব মানে পরজন্মেও করেন না বুঝানো হয়েছে। পরজন্মে এই ব্যক্তি নিজের আর্যশ্রাবকত্ব সম্পর্কে না জানলেও স্বভাববশে এই ছয়টি গুরুতর পাপকাজ, অথবা শাস্তা কর্তৃক বর্ণিত অন্যান্য সাধারণ প্রাণিহত্যা ইত্যাদি পঞ্চ শত্রুসহ এই ছয়টি গুরুতর পাপকাজ করেন না। এ ক্ষেত্রে মৃতমাছ গ্রহণকারী ইত্যাদি আর্যশ্রাবক গ্রাম্য বালকরাই এর দৃষ্টান্ত।

এভাবে ভগবান সাতবার জন্মগ্রহণ করলেও জন্মকে পরিত্যাগ করতে না পারা অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে তাঁর বিশেষ গুণের ভিত্তিতে সংঘরত্নের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘তিনি যদি সামান্যতম’ গাথাটির বর্ণনা

১২. এভাবে সাতবার জন্মগ্রহণ করলেও জন্মকে পরিত্যাগ করতে না পারা অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে তাঁর বিশেষ গুণের ভিত্তিতে সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন “একজন দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শুধু যে ছয়টি গুরুতর পাপকাজ করাই অসম্ভব তা নয়, এমনকি অল্পমাত্র পাপকর্ম করেও সেটি তাঁর পক্ষে গোপন করা সম্ভব নয়” অর্থাৎ প্রমত্ত হয়ে বাস করলেও একজন দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কৃতপাপ গোপন করার অসম্ভবতা-গুণের দ্বারা বলতে শুরু করলেন এই বলে, “**তিনি যদি সামান্যতম পাপকর্মও করেন।**”

তার অর্থ হচ্ছে এই: সেই দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি সামান্য স্মৃতিহীন প্রমত্ত হয়ে বাস করাকে ভিত্তি করে ভগবান যেই লোকবর্জ্য জেনেশুনে শীললঙ্ঘন সম্বন্ধে বলেছেন, যেমন “আমি শিষ্যদের জন্য যেই শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করেছি, আমার শিষ্যরা তা প্রাণ গেলেও লঙ্ঘন করেন না” (চূলৰ.৩৮৫; অ.নি.৮.১৯; উদা.৪৫), সেটি বাদে তিনি যদি অন্য কুটির নির্মাণকারী, একসঙ্গে শয়ন ইত্যাদি, অথবা প্রজ্ঞপ্তি-বর্জ্য শীললঙ্ঘন নামক বুদ্ধনিন্দিত **কায়িক পাপকর্ম করেন**, অথবা প্রতি পদে পদে ধর্ম, পাঁচ-ছয় বাক্যের বেশি ধর্মদেশনা, অনর্থক বাক্য, কর্কশ বাক্য ইত্যাদি **বাচনিক পাপকর্ম**, অথবা কোথাও লোভ-বিদ্বেষ উৎপত্তি, সোনা-রুপো ইত্যাদি গ্রহণ, চীবর ইত্যাদি পরিভোগের সময় পর্যালোচনা না করা ইত্যাদি **মানসিক পাপকর্ম করেন**। **তিনি তা গোপন রাখতে পারেন না** মানে হচ্ছে তিনি তা “এটি অনুমোদনযোগ্য নয়, এটি করা উচিত নয়” জেনে কিছুক্ষণের জন্যও গোপন করেন না, অথবা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তা অথবা বিজ্ঞ সতীর্থ ব্রহ্মচারীদের কাছে প্রকাশ করে নিয়ম অনুসারে প্রতিকার করেন, এবং “আমি আর পুনরায় তা করব না” বলে সংযত হন। কেন? **কারণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন করা অসম্ভব বলা হয়েছে**, এই ধরনের পাপকর্ম করে সেটি গোপন করা এই জীবনে নির্বাণ সাক্ষাৎকারী দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বলা হয়েছে, এই হচ্ছে এর অর্থ। কীভাবে?

“যেমন, হে ভিক্ষুগণ, কোনো অল্পবয়সী, অবুঝ, চিৎ হয়ে শোয়া শিশু হাত কিংবা পা দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরলে শিগগিরই সরিয়ে আনে, ঠিক তদ্রূপ হে ভিক্ষুগণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির এটিই নিয়ম যে, তিনি যদি তেমন কোনো অপরাধ করে থাকেন, তা হলে যেভাবে করলে অপরাধ হতে মুক্তি পাওয়া যায়, শিগগিরই সেভাবে শাস্তা কিংবা বিজ্ঞ সতীর্থ ব্রহ্মচারীদের কাছে দেশনা করেন, প্রকাশ করেন, খোলাসা করেন, দেশনা করার পর, প্রকাশ করার পর, খোলাসা করার পর তিনি ভবিষ্যতে সংযত হন।” (ম.নি.১.৪৯৬)

এভাবে ভগবান প্রমত্ত হয়ে বসবাসকারী দর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির কৃতপাপ গোপন না করার গুণের দ্বারা সংঘরত্নের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সত্যবাক্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে’ গাথাটির বর্ণনা

১৩. এভাবে সংঘের অন্তর্গত ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার গুণের দ্বারা সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন ভগবান ত্রিরত্নের গুণ তুলে ধরতে গিয়ে এখানে সংক্ষেপে আর অন্যত্র বিস্তারিতভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো দেশনা করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই পুনরায় বুদ্ধের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্যকে বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে যেমন বনের বৃক্ষরাজির ডালপালায় ফুল ফোটে।**” এখানে নিবিড় ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের সমষ্টি হচ্ছে বন, শেকড়-কাণ্ড-সার-বাকল-ডালপালা-পাতায় বর্ধিত হওয়া ঘন ঝোঁপঝাড় হচ্ছে বৃক্ষরাজি, আর বনের মধ্যেকার বৃক্ষরাজিই হচ্ছে **বনের বৃক্ষরাজি**, তাই এটিকে “বনের বৃক্ষরাজির” বলা হয়েছে। এমনটিও বলা যায় “সবিতর্ক-সবিচার আছে, অবিতর্ক-বিচারমাত্র আছে, সুখে দুঃখে জীবে” ইত্যাদির মতো। **গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাসে** মানে হচ্ছে গ্রীষ্মঋতুর যে চার মাস সেই চার মাসের মধ্যে একটি মাসে। কোন মাসে? **প্রথম মাসে**, অর্থাৎ চৈত্রমাসে এই হচ্ছে এর অর্থ। চৈত্রমাসকে “গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাস” এবং “শিশুবসন্ত” বলা হয়। এর পরের শব্দগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট।

এখানে এর সামগ্রিক অর্থ হচ্ছে এই: যেমন গ্রীষ্মঋতুর প্রথম মাস নামক শিশুবসন্তে নানান জাতীয় গাছগাছালিতে ভরা বনে সুপুষ্পিত ডালপালাসম্পন্ন তরুণ গাছগুলো অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি পুঞ্জ-আয়তন ইত্যাদি, অথবা মহাস্মৃতিপ্রতিষ্ঠা, সম্যক প্রচেষ্টা ইত্যাদি, অথবা শীলরাশি, সমাধিরাশি ইত্যাদি নানা প্রকার অর্থজ্ঞাপক ফুলের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দর হয়ে ওঠা নির্বাণগামী মার্গ তুলে ধরার ভিত্তিতে তাদৃশ নির্বাণগামী শিক্ষণীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম কেবল মহাকরুণা বিগলিত হৃদয়ে সত্ত্বগণের পরম হিতের জন্যই দেশনা করেছেন, কোনো লাভ-সৎকার পাওয়ার জন্য নয়।

এভাবে ভগবান এই সুপুষ্পিত বনের বৃক্ষরাজিসদৃশ শিক্ষণীয় ধর্ম প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই বুদ্ধের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। কেবল পূর্বোক্ত প্রকারের শিক্ষণীয় ধর্ম নামক বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ এই কথাটি যোগ করতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞ’ গাথাটির বর্ণনা

১৪. এভাবে ভগবান শিক্ষণীয় ধর্মের দ্বারা বুদ্ধের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন লোকোত্তর ধর্মের দ্বারা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞ।**” এখানে **শ্রেষ্ঠ** মানে হচ্ছে উত্তমের দ্বারা মুক্ত হওয়া ব্যক্তিরা ইচ্ছা করে—“আহা, আমরা যদি এইরকম হতে পারতাম”, অথবা শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ উত্তম, সেরা, এই হচ্ছে এর অর্থ। **শ্রেষ্ঠজ্ঞ** মানে হচ্ছে নির্বাণজ্ঞ। সব বিষয়ের মধ্যে নির্বাণই হচ্ছে উত্তম অর্থে শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠকে তিনি স্বয়ং বোধিমূলে ভেদ করে জেনেছেন। **শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক** মানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু, ভদ্রবর্গীয় ভিক্ষু, জটাধারী সন্ন্যাসী ইত্যাদি ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য দেবতা ও মানুষদের নির্বেধভাগীয়, বাসনাভাগীয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক, এই হচ্ছে এর অর্থ। **শ্রেষ্ঠ ধর্ম আহরণকারী** মানে শ্রেষ্ঠ মার্গকে আহরণ করায় তাঁকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আহরণকারী বলা হয়। সেই ভগবান দীপংকর বুদ্ধ হতে মোট ত্রিশ প্রকার পারমী পূরণ করার সময় পূর্ববর্তী সম্যকসম্বুদ্ধগণের পথ অনুসরণ করে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ মার্গ আহরণ করেছিলেন, তাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আহরণকারী বলা হয়। অন্যদিকে তিনি সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান লাভ করেছেন বিধায় শ্রেষ্ঠ, নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছেন বিধায় শ্রেষ্ঠজ্ঞ, সত্ত্বগণকে বিমুক্তিসুখ প্রদান করেন বিধায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক, উত্তম উপায় আহরণ করেছেন বিধায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম আহরণকারী, এই সমস্ত লোকোত্তর-গুণের চাইতে অধিক গুণ আর কারো কাছেই নেই বিধায় তিনি **অনুত্তর**।

আরেক ধরনের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: উপশমের অধিষ্ঠান পরিপূরণ করেছেন বিধায় তিনি শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাধিষ্ঠান পরিপূরণ করেছেন বিধায় শ্রেষ্ঠজ্ঞ, ত্যাগাধিষ্ঠান পরিপূরণ করেছেন বিধায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক, সত্যাধিষ্ঠান পরিপূরণ করেছেন বিধায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম আহরণকারী, অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ মার্গসত্য আহরণ করেছেন। ঠিক তদ্রূপ, তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের দ্বারা শ্রেষ্ঠ, প্রজ্ঞাসঞ্চয়ের দ্বারা শ্রেষ্ঠজ্ঞ, বুদ্ধত্ব প্রত্যাশীদের সেই পথ বাতলে দেন বিধায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রদায়ক, পচ্চেক-বুদ্ধত্ব প্রত্যাশীদের সেই পথ আহরণ করে দেন বিধায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম আহরণকারী, সেই সেই বিষয়ে তাঁর মতো কেউই নেই বিধায় অনুত্তর, অথবা নিজে গুরুহীন হয়েও অন্যদের গুরু হন বিধায়, বুদ্ধের শিষ্যত্ব প্রত্যাশীদের কাছে সুব্যাখ্যাত ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন বিধায় **শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন**। বাকিগুলো পূর্ববৎ।

এভাবে ভগবান নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্মের দ্বারা নিজের গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই বুদ্ধের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রয়োগ করে বললেন, “**এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। কেবল যেই শ্রেষ্ঠ নব লোকোত্তর ধর্ম ইনি জেনেছেন, যা প্রদান করেছেন, যা আহরণ করেছেন, যা দেশনা করেছেন, এই বুদ্ধরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন, এভাবে যোগ করতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

## ‘যাঁদের পুরোনো কর্ম ক্ষীণ’ গাথাটির বর্ণনা

১৫. এভাবে ভগবান শিক্ষণীয় ধর্ম ও লোকোত্তর ধর্মের ওপর ভিত্তি করে দুটি গাথাযোগে বুদ্ধের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্য প্রকাশ করার পর, এখন যাঁরা সেই শিক্ষণীয় ধর্ম শ্রবণ করেছেন, সেই অনুযায়ী আচরণ করে নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্ম অধিগত করেছেন, তাঁদের পুঞ্জবিহীন নির্বাণপ্রাপ্তির গুণের ওপর ভিত্তি করে পুনরায় সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্যের কথা বলতে শুরু করেছেন এই বলে—“**যাঁদের পুরোনো কর্ম ক্ষীণ হয়েছে।**” এখানে **ক্ষীণ** মানে হচ্ছে সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। **পুরোনো** মানে হচ্ছে পুরাতন। **নতুন** মানে হচ্ছে সম্প্রতি, বর্তমান। **উৎপন্ন হওয়ার কারণ নেই** মানে হচ্ছে উৎপত্তির কারণ বিদ্যমান নেই। **পুনর্জন্মের প্রতি** মানে হচ্ছে অনাগত বা ভবিষ্যৎ জন্মের প্রতি। **সেই ধীর ব্যক্তিগণ** মানে হচ্ছে যাঁদের পুরোনো কর্ম ক্ষীণ হয়েছে আর নতুন কর্ম উৎপন্ন হওয়ার কারণ নেই, এবং যাঁরা ভবিষ্যৎ জন্মের প্রতি অনাসক্তচিত্ত, সেই ধৃতিমান ক্ষীণাসব ভিক্ষুরা। **ক্ষীণবীজ** মানে হচ্ছে ছিন্নবীজ, নষ্টবীজ। **আকাঙ্ক্ষাহীন** মানে হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত। **নির্বাপিত হন** মানে হচ্ছে নিভে যান। **প্রদীপের মতো** মানে হচ্ছে এই বাতির মতো।

এতে কী বলা হয়েছে? যেই পুরোনো অতীতের কর্ম সত্ত্বদের উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়েও তৃষ্ণাস্নেহ পরিত্যক্ত না হওয়ায় ও প্রতিসন্ধি আহরণে সক্ষম হওয়ায় অক্ষীণই হয়ে থাকে, সেই পুরোনো কর্ম যাঁদের অর্হত্ত্বমার্গের দ্বারা তৃষ্ণাস্নেহ শুকিয়ে যাওয়ায় অগ্নিদগ্ধ বীজের মতো ভবিষ্যতে ফলদানে অক্ষমতার কারণে ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাঁদের বুদ্ধপূজা ইত্যাদির ভিত্তিতে বর্তমানে ঘটমান কর্মকেই নতুন বলা হয়, তৃষ্ণাপরিত্যক্ত হওয়ার মাধ্যমে গোড়া-কাটা গাছের ফুলের ন্যায় ভবিষ্যতে ফলদানে অক্ষমতার কারণে যাঁদের তা উৎপত্তির সম্ভাবনা নেই এবং যাঁরা তৃষ্ণাপরিত্যক্ত হওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জন্মের প্রতি অনাসক্তচিত্ত, সেই ক্ষীণাসব ভিক্ষুরা “কর্ম, ক্ষেত্র, চিত্ত, বীজ” (অ.নি.৩.৭৭) এখানে বর্ণিত প্রতিসন্ধিচিত্তের কর্মক্ষয়ের দ্বারা ক্ষীণ হওয়ায় ক্ষীণবীজ। পূর্বে পুনর্জন্মের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটি উৎপত্তি-পরিত্যাগের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ায় আগের মতোই চ্যুতিকালে উৎপত্তির অযোগ্য হয়ে আকাঙ্ক্ষাহীন হন, ধৃতিসম্পন্ন হওয়ায় ধীর হন, বিচরণশীল চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রদীপের মতোই নির্বাপিত হন, পুনরায় “রূপী বা অরূপী” এভাবে ইত্যাদি ধারণাগুলোকে অতিক্রম করেন। সেই সময়ে নাকি নগরদেবতাদের পুজো করার জন্য প্রজ্বলিত প্রদীপগুলোর মধ্যে একটি প্রদীপ নিভে গিয়েছিল, সেটি দেখিয়ে দিতেই বললেন, “এই প্রদীপের মতো।”

এভাবে ভগবান যাঁরা আগের দুটো গাথায় বর্ণিত সেই শিক্ষণীয় ধর্ম শুনলেন, তদনুযায়ী আচরণ করে নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্ম অধিগত করলেন, তাঁদের পুঞ্জবিহীন নির্বাণপ্রাপ্তির গুণ প্রকাশ করার পর, এখন সেই গুণের ওপর ভিত্তি করেই সংঘের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকা সত্যবাক্য প্রয়োগ করে দেশনা শেষ করলেন এই বলে—“**এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।**” তার অর্থ পূর্ববর্তী গাথায় বর্ণিত নিয়মেই বুঝতে হবে। কেবল পূর্বোক্ত প্রকারের ক্ষীণাসব ভিক্ষুদের নির্বাণ নামক এই সংঘরত্নই শ্রেষ্ঠ, এভাবে যোগ করতে হবে। এই গাথার আদেশও লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের অমনুষ্যদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

দেশনা শেষে রাজপরিবারের মাঝে স্বস্তি দেখা দিলো, সব ধরনের উপদ্রব দূর হলো এবং চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হলো।

## ‘এখানে যে-সকল’ গাথাত্রয়ের বর্ণনা

১৬. তখন দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক “ভগবান ত্রিরত্নের গুণের ওপর ভিত্তি করে সত্যবাক্য প্রয়োগ করে নাগরিকদের মাঝে স্বস্তি এনে দিলেন, আমারও নাগরিকদের মাঝে স্বস্তি এনে দেওয়ার লক্ষ্যে ত্রিরত্নের গুণের ওপর ভিত্তি করে কিছু বলা উচিত” চিন্তা করে শেষোক্ত তিনটি গাথা বললেন, “**এখানে যে-সকল অমনুষ্য সমবেত হয়েছে।**” এখানে যেহেতু বুদ্ধ যেভাবে লোকহিতের জন্য উৎসাহিত ব্যক্তিদের আগমন করা উচিত সেভাবে আগত হয়েছেন বিধায়, এবং যেভাবে এদের সঙ্গে গমন করা ‍উচিত সেভাবে গত হয়েছেন বিধায়, অথবা যেভাবে এগুলোকে বোঝা উচিত সেভাবে বুঝেছেন বিধায়, এবং যেভাবে জানা উচিত সেভাবে জেনেছেন বিধায়, এবং যা সেভাবেই হয় ও তার কথা বলেন বিধায় তাঁকে “তথাগত” বলা হয়। যেহেতু তিনি ফুল-সুগন্ধি ইত্যাদি বাইরে জন্মানো উপকরণ দিয়ে এবং নিজের ভেতরে জন্মানো ধর্মানুযায়ী আচার-আচরণ দিয়ে দেবতা ও মনুষ্য কর্তৃক পূজিত হন, তাই দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক সমস্ত দেবপরিষদকে নিজের সঙ্গে একত্রিত করে বললেন, “**দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত তথাগত বুদ্ধকে আমরা নমস্কার করি। এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।**”

১৭. কিন্তু, যেহেতু ধর্মের মধ্যে মার্গধর্ম যেভাবে সমন্বিতভাবে শমথ-বিদর্শনবলের দ্বারা কলুষতাগুলোকে সমুচ্ছিন্ন করতে করতে গমন করা উচিত, সেভাবেই গমন করেছে, তাই ধর্মও ‘তথাগত’। নির্বাণধর্মও যেভাবে গমন করে প্রজ্ঞা দ্বারা ভেদ করে সর্বদুঃখকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়, বুদ্ধ ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সেভাবেই নির্বাণধর্মকে বুঝেছেন, তাই ধর্মকেও “তথাগত” বলা হয়। যেহেতু সংঘ যেভাবে আত্মহিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা সেই সেই মার্গ দিয়ে গমন করা উচিত সেভাবেই গমন করেছেন তাই সংঘকেও “তথাগত” বলা হয়। তাই বাকি দুটি গাথাতেও “**দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত তথাগত ধর্মকে আমরা নমস্কার করি। এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক। দেবতা ও মানুষদের দ্বারা পূজিত তথাগত সংঘকে আমরা নমস্কার করি। এর ফলে সকলের স্বস্তি হোক।**” বলা হয়েছে। বাকিগুলো পূর্ববৎ।

এভাবে দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক এই তিনটি গাথা ভাষণ করে, ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, দেবপরিষদকে সঙ্গে নিয়ে দেবপুরে চলে গেলেন। কিন্তু ভগবান সেই রত্ন সূত্রটি পরদিনও দেশনা করলেন, পুনরায় চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হলো। এভাবে ভগবান সাত দিন পর্যন্ত একই সূত্র দেশনা করলেন এবং প্রতিদিন একই সংখ্যক প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হলো। ভগবান মাত্র অর্ধমাস বৈশালীতে অবস্থান করে রাজাদের “আমি চলে যাব” বলে জানালেন। তখন রাজারা দ্বিগুণ সম্মানের সঙ্গে পুনরায় তিন দিনের মধ্যে ভগবানকে নদীতীরে নিয়ে গেল। নদীতে জন্ম নেওয়া নাগরাজারা চিন্তা করল, “মানুষেরা তথাগতকে সম্মান জানাচ্ছে, আমরা কেন সম্মান জানাব না?” তারপর তারা স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিময় নৌকা বানিয়ে, স্বর্ণ-রৌপ্য-মণিময় পালঙ্ক প্রস্তুত করিয়ে, জলের ওপর পাঁচ রঙা পদ্মফুল ছড়িয়ে দিয়ে “আমাদের অনুগ্রহ করুন” বলে ভগবানের কাছে উপস্থিত হলো। ভগবান তাদের নিমন্ত্রণে সম্মত হয়ে রত্ননৌকায় আরোহণ করলেন এবং পাঁচশো ভিক্ষুও নিজ নিজ নৌকায় আরোহণ করল। নাগরাজারা ভগবানকে ভিক্ষুসংঘ সহকারে নাগভবনে প্রবেশ করাল। সেখানে ভগবান সারা রাত ধরে নাগপরিষদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা করলেন। পরদিন তারা দিব্য খাদ্য-ভোজ্য সহকারে মহাদান দিলো। ভগবান তাদের দান অনুমোদন করে নাগভবন হতে বেরিয়ে পড়লেন।

ভূমিবাসী দেবতারা “মানুষেরা ও নাগেরা তথাগতকে সম্মান জানাচ্ছে, আমরা কেন সম্মান জানাব না?” চিন্তা করে বন-লতাগুল্ম-বৃক্ষ-পর্বত ইত্যাদিতে ছোট-বড়ো অনেক ছাতা মাথার ওপর তুলে ধরল। এইভাবে ভগবান ও ভিক্ষুসংঘকে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মভবন পর্যন্ত বিশাল ও বিশেষ সম্মান জানানো হলো। বিম্বিসার রাজাও লিচ্ছবীদের থেকে দ্বিগুণ বেশি সম্মান জানালেন এবং পূর্বের মতো করে পাঁচ দিনের মধ্যেই ভগবানকে রাজগৃহে নিয়ে আসলেন।

ভগবান রাজগৃহে পৌঁছালে বিকালবেলা সম্মেলন-ঘরে সমবেত হওয়া ভিক্ষুদের মধ্যে এই ধরনের কথা উঠল—“আহা, বুদ্ধ ভগবানের কী প্রভাব, যাঁর উদ্দেশ্যে নদীর দুই পাড়ে আট যোজন জায়গা জুড়ে উঁচু-নিচু স্থানগুলোকে সমান করে, তার ওপর বালি ছিটিয়ে দিয়ে, ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হলো, এক যোজন দীর্ঘ নদীর জলের ওপর নানা বর্ণের পদ্মফুল ছড়িয়ে দেওয়া হলো, একেবারে অকনিষ্ঠ ভবন পর্যন্ত ছোট-বড়ো অনেক ছাতা মাথার ওপর তুলে ধরা হলো!” ভগবান সেই কথা জেনে গন্ধকুটি হতে বের হয়ে, তৎক্ষণাৎ অলৌকিকভাবে সেখানে গিয়ে সম্মেলন-ঘরে সজ্জিত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধাসনে বসলেন। বসার পর ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি এসে পড়ায় তোমাদের কী কথায় বাধা পড়ল?” তারা ভগবানকে সব কথা জানাল। তখন ভগবান বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, এই বিশেষ পুজো আমার বুদ্ধপ্রভাবে উৎপন্ন হয়নি, কোনো নাগ-দেবতা-ব্রহ্মার প্রভাবেও উৎপন্ন হয়নি, অধিকন্তু এটি পূর্বজন্মে অল্পমাত্র দান করার ফলেই উৎপন্ন হয়েছে।” ভিক্ষুরা বলল, “ভন্তে, আমরা তো সেই অল্পমাত্র দানের কথা জানি না, খুবই ভালো হয় ভগবান যদি আমাদের সেই ঘটনাটি বলেন যাতে করে আমরা তা জানতে পারি।”

ভগবান বললেন, বহুকাল আগে, হে ভিক্ষুগণ, তক্ষশিলায় সঙ্খ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। যুবক সুমীম নামে তার এক পুত্র ছিল। তার বয়স ছিল ষোলো বছর। একদিন সে পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে, অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়াল। পিতা তাকে বলল, “বাবা সুসীম, কী হয়েছে? কিছু বলবে?” সে বলল, “বাবা, আমি বারাণসীতে গিয়ে শিল্প শিক্ষা করতে চাই।” “তা হলে, বাবা সুসীম, অমুক নামে ব্রাহ্মণ আমার বন্ধু, তার কাছে গিয়ে শিক্ষা করো” বলে তার হাতে এক হাজার টাকা দিল। সে তা নিয়ে মাতাপিতাকে অভিবাদন করে, ক্রমান্বয়ে বারাণসীতে গিয়ে ভদ্রতার সঙ্গে আচার্যের কাছে উপস্থিত হয়ে, অভিবাদন করে নিজের কথা নিবেদন করল। আচার্য “আমার বন্ধুর পুত্র” ভেবে যুবককে গ্রহণ করে খুব আদর-আপ্যায়ন করল। সে পথক্লান্তি দূর করার পর, সেই এক হাজার টাকা আচার্যের পাদমূলে রেখে শিল্প শিক্ষা করার অনুমতি চাইল। আচার্য তাকে অনুমতি দিল এবং শিক্ষা দিল।

সে হালকা ও গভীর যা কিছু শিক্ষা করতে লাগল সেসব স্বর্ণপাত্রে রাখা বিনষ্ট না হওয়া সিংহতেলের মতো ধারণ করতে করতে, যে শিল্পগুলো শিক্ষা করতে বারো বছর লেগে যায় সেগুলো মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শিখে নিল। সে অধ্যয়নের সময় অধীত শিল্পবিদ্যার শুরু ও মধ্যভাগই শুধু দেখতে পেল, কিন্তু শেষটা দেখতে পেল না। তারপর সে আচার্যের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, “আমি এই শিল্পবিদ্যার শুরু ও মধ্যভাগই শুধু দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই এর শেষ দেখতে পাচ্ছি না।” আচার্য তাকে বলল, “বৎস, আমার অবস্থাও তো একই।” “তা হলে, হে আচার্য, কে এই শিল্পবিদ্যার শেষটা জানেন?” “বৎস, ঋষিপতনে ঋষিরা থাকেন তাঁরাই শেষটা জেনে থাকবেন।” “আচার্য, আমি তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করব তা হলে।” “জিজ্ঞেস করো, বৎস, ইচ্ছেমতো জিজ্ঞেস করো।” সে ঋষিপতনে গিয়ে পচ্চেক-বুদ্ধদের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনারা কি এই শিল্পবিদ্যার শুরু, মধ্যভাগ ও শেষটা জানেন?” “হ্যাঁ বন্ধু, জানি।” “আমাকে তা শিখিয়ে দিন।” “তা হলে তো, বন্ধু, তোমাকে প্রব্রজ্যা নিতে হবে, প্রব্রজ্যা না নিলে তো শিখতে পারবে না।” “ঠিক আছে, ভন্তে, আপনারা আমায় প্রব্রজ্যা দিন, অথবা আপনাদের যা ইচ্ছা হয় তা-ই করে আমায় এর শেষটা জানান।” তাঁরা তাকে প্রব্রজ্যা দেওয়ার পর কর্মস্থান তথা ধ্যানে নিয়োজিত করাতে অসমর্থ হয়ে “তোমাকে এভাবে চীবর পরতে হবে, এভাবে চীবর রুম করতে হবে” ইত্যাদি প্রকারে ভালো আচরণগত শীল শিক্ষা দিলেন। সে যেহেতু অতীতের পুণ্যহেতুসম্পন্ন তাই সেগুলো শিক্ষা করতে করতে অচিরেই পচ্চেক-বোধি লাভ করল। তারপর সে সমগ্র বারাণসীতে “সুসীম পচ্চেক-বুদ্ধ” নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি পেল। সে প্রচুর লাভ-সৎকার পেল এবং তার অনুসারীর সংখ্যাও বেড়ে গেল। পূর্বজন্মে অল্পায়ুজনক কর্ম সম্পাদন করায় সে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিনির্বাপিত হলো। অন্যান্য পচ্চেক-বুদ্ধরা ও বিশাল জনতা তার দেহসৎকার করল এবং ধাতুগুলো নিয়ে নগরদ্বারে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করল।

তখন সঙ্খ ব্রাহ্মণ “আমার পুত্র বহুদিন হলো বারাণসী গেছে, তার কোনো খবর আমি জানি না” এই ভেবে পুত্রকে দেখার ইচ্ছায় তক্ষশিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। ক্রমান্বয়ে বারাণসীতে পৌঁছানোর পর বিশাল জনতার সমাবেশ দেখে “এদের কেউ না কেউ তো নিশ্চয় আমার পুত্রের খবর জেনে থাকবে” ভাবতে ভাবতে সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, “সুসীম নামে এক যুবক এখানে এসেছে, আপনারা কি তার কোনো খবরাখবর জানেন?” তারা বলল, “হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, জানি তো, এই নগরে এক ব্রাহ্মণের কাছে তিনটি বেদে পারদর্শী হয়ে, পচ্চেক-বুদ্ধগণের কাছে প্রব্রজ্যা নিয়ে পচ্চেক-বুদ্ধ হয়ে, পুঞ্জবিহীন নির্বাণধাতুতে পরিনির্বাপিত হয়েছেন, তাঁর উদ্দেশ্যেই এই স্তূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।” সে মাটি চাপড়ে কান্না করল ও বিলাপ করল। তারপর সেই চৈত্যের উঠোনে গিয়ে তৃণ পরিষ্কার করে সেখান থেকে উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে বালু নিয়ে এসে, পচ্চেক-বুদ্ধের চৈত্যের উঠোনে ছিটিয়ে দিয়ে, কমণ্ডলু হতে জল নিয়ে চারপাশের মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে, বন্য ফুল দিয়ে পুজো করে, নিজের উত্তরীয় বস্ত্রকে পাতাকারূপে টাঙিয়ে দিয়ে, নিজের ছাতাটিকে স্তূপের ওপর বেঁধে দিয়ে চলে গেল।

এভাবে অতীতের ঘটনাকে তুলে ধরার পর, বর্তমান জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ধর্মকথা বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের হয়তো মনে হতে পারে যে, সেই সময়ে সঙ্খ ব্রাহ্মণ অন্য কেউ ছিল।” বিষয়টিকে সেভাবে দেখা উচিত নয়, সেই সময় আমিই ছিলাম সঙ্খ ব্রাহ্মণ, আমিই সুমীম পচ্চেক-বুদ্ধের চৈত্যের উঠোনের তৃণগুলো পরিষ্কার করেছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এই জন্মে (দেবতা ও মানুষেরা আমার জন্য আট যোজন পথ গোঁজ ও কাঁটামুক্ত করে সমান ও শুদ্ধ করেছিল। আমি সেখানে বালু ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এই জন্মে (দেবতা ও মানুষেরা) আমার জন্য আট যোজন পথ জুড়ে বালু ছিটিয়ে দিয়েছিল। আমি সেখানে বন্য ফুল দিয়ে পুজো করেছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এই জন্মে (দেবতা ও মানুষেরা) আমার জন্য নয় যোজন পথের জলে ও স্থলে নানা ধরনের ফুল ছড়িয়ে দিয়ে ফুলের চাদর বানিয়েছিল। আমি সেখানে কমণ্ডলু হতে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ বৈশালীতে পদ্মবৃষ্টি হয়েছিল। আমি সেই চৈত্যে পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম এবং ছাতা বেঁধে দিয়েছিলাম। সেই কৃতকর্মের ফলস্বরূপ আমার উদ্দেশ্যে অকনিষ্ঠ ভবন পর্যন্ত পতাকা টাঙানো হয়েছিল এবং ছোট-বড়ো ছাতা উঁচিয়ে ধরা হয়েছিল। এভাবেই, হে ভিক্ষুগণ, আমার উদ্দেশ্যে কৃত এই বিশেষ পুজো বুদ্ধপ্রভাবে উৎপন্ন হয়নি, কোনো নাগ-দেবতা-ব্রহ্মার প্রভাবেও না, অতীত জন্মে অল্পমাত্র দানের প্রভাবেই এসব উৎপন্ন হয়েছিল।” ধর্মকথা শেষে এই গাথাটি বললেন:

“অল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ করলে যদি

বিপুল সুখ লাভের সম্ভাবনা দেখেন,

তা হলে ধীর ব্যক্তি বিপুল সুখ লাভের

সম্ভাবনা দেখে অল্পসুখ ত্যাগ করেন।” (ধ.প.২৯০)

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

রত্ন সূত্রের বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# ৭. তিরোকুট্ট সূত্রের বর্ণনা

## সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা

এখন “**প্রেতগণ প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে**” ইত্যাদি প্রকারে রত্ন সূত্রের পর উল্লেখিত তিরোকুট্ট সূত্রের অর্থবর্ণনার পালা এসেছে। এখানে আমি তার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা (*নিক্খেপপ্পযোজন*) বলার পরই অর্থবর্ণনা করব।

এখানে এই তিরোকুট্ট সূত্রটি এরই ধারাবাহিকতায় ভগবান কর্তৃক বলা না হলেও, এর আগে নানা প্রকারে যেই কুশলকর্ম সম্পাদনের কথা তুলে ধরা হয়েছে, তাতে প্রমাদগ্রস্ত হয়ে সত্ত্বগণ নিরয়, ইতর প্রাণীকুল হতে আলাদা স্থানে উৎপন্ন হওয়ার সময় যেহেতু এই ধরনের প্রেতদের মধ্যেও উৎপন্ন হয়, তাই এ কাজে প্রমাদগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় সেটি দেখিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে, অথবা যেসব সত্ত্বের দ্বারা উপদ্রুত বৈশালীর উপদ্রব দূরীকরণের জন্য রত্ন সূত্র বলা হয়েছে, সেই সত্ত্বদের মধ্যে কিছু কিছু এই ধরনের সত্ত্ব আছে সেটি দেখিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বলা হয়েছে।

এখানে এই হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা।

## অনুমোদনের কথা

কিন্তু যেহেতু এর অর্থবর্ণনা হচ্ছে:

“যার দ্বারা, যেখানে, যখন ও যেই কারণে

তিরোকুট্ট সূত্রটি প্রকাশিত হয়েছে,

সেসব যথাক্রমে প্রকাশ করলে তবেই সুকৃত হয়,

তাই আমি তা সেভাবেই প্রকাশ করব।”

এটি কার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে এবং কোথায়, কখন ও কী কারণে প্রকাশিত হয়েছে? উত্তরে বলা যায়, ভগবান কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, তাও আবার রাজগৃহে দ্বিতীয় দিনে মগধের রাজাকে আশীর্বাদস্বরূপ উপদেশ প্রদানের জন্য। এই বিষয়টিকে খোলাসা করতে হলে এখানে এর বিস্তারিত কাহিনিটি বলতে হবে:

এখন থেকে বিরানব্বই কল্প আগে কাশী নামে এক নগর ছিল। সেখানে জয়সেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল শ্রীমা। তাঁর গর্ভে ফুস্স নামে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে, ক্রমান্বয়ে সম্যক সম্বোধি লাভ করেছিলেন। জয়সেন রাজা “আমার পুত্র গৃহত্যাগ করে বুদ্ধ হয়েছেন, কাজেই বুদ্ধ তো আমারই, ধর্ম তো আমারই, সংঘও আমারই” এই ভেবে মমত্ববোধ উৎপন্ন করে সব সময় নিজেই তাঁদের সেবা করতেন, অন্য কাউকেই সুযোগ দিতেন না।

ভগবানের বৈমাত্রেয় ছোটভাই তিনজনই চিন্তা করল, “বুদ্ধগণ তো সকলের হিতের জন্যই উৎপন্ন হন, কারো একার কল্যাণের জন্য নয়, আমাদের পিতা তো অন্য কাউকেই কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না, এখন কীভাবে আমরা ভগবানকে সেবা করার সুযোগ পাবো?” তখন তারা মনে মনে ভাবল, “আমরা বরং কোনো একটি উপায় বের করি।” তারা প্রত্যন্ত প্রদেশে বিক্ষোভের মতো কিছু একটা সৃষ্টি করাল। তখন রাজা “প্রত্যন্ত প্রদেশে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে” শুনে তাঁর তিনজন পুত্রকে প্রত্যন্ত প্রদেশে সৃষ্ট বিক্ষোভকে শান্ত করার জন্য পাঠালেন। তারা বিক্ষোভকে শান্ত করে ফিরে আসল। রাজা অত্যন্ত খুশি হয়ে তাদের বর দিলেন এই বলে, “তোমরা যা চাও তা-ই গ্রহণ করো।” তারা “আমরা ভগবানকে সেবা করতে চাই” বলল। রাজা “এটি বাদে অন্য কিছু গ্রহণ করো” বললেন। তারা “আমাদের অন্য কিছুর দরকার নেই” বলল। তা হলে তোমরা সময়সীমা নির্ধারণ করে গ্রহণ করো। তারা সাত বছর চাইল। রাজা অনুমতি দিলেন না। এভাবে ছয় বছর, পাঁচ বছর, চার বছর, তিন বছর, দুই বছর, এক বছর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চার মাস চাইতে চাইতে যখন তারা তিন মাস সেবা করার অনুমতি চাইল, তখন রাজা তাদের অনুমতি দিলেন।

তারা বর পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে বন্দনা করে বলল, “ভন্তে, আমরা ভগবানকে তিন মাস সেবা করতে চাই, ভন্তে ভগবান, বর্ষার এই তিন মাসের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” ভগবান নিরবে সম্মতি জানালেন। তখন তারা নিজেদের জনপদে নিযুক্ত কর্মচারীকে চিঠি লিখে জানাল যে, “আমরা এই তিন মাস ভগবানকে সেবা করব, তোমরা বিহার হতে শুরু করে সমস্ত ধনসম্পত্তিই ভগবানের সেবার কাজে লাগাও।” সে তাদের কথামতো সবকিছু করে সে-কথা তাদের জানাল। তারা নিজেরা কাষায় বস্ত্র পরে, সেবাকাজের জন্য নিযুক্ত আড়াই হাজার লোককে দিয়ে ভগবানকে সুন্দরভাবে সেবা করাতে করাতে জনপদে নিয়ে গিয়ে, বিহার দান করে সেখানে ভগবানকে বাস করাল।

তাদের কোষাধ্যক্ষ ছিল এক গৃহপতিপুত্র। সে ও তার স্ত্রী দুজনেই ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন। সে বুদ্ধপ্রমুখ সংঘের উদ্দেশ্যে কীভাবে দান ইত্যাদি সম্পাদন করতে হবে সবকিছু খুব সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিল। জনপদে নিযুক্ত লোকটি সবকিছু বুঝে নিয়ে, এগারো হাজার লোককে সঙ্গে নিয়ে খুব সুন্দরভাবে দানকার্য সম্পাদন করল। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক মনে মনে বেশ রেগে গিয়েছিল। তারা কিছু কিছু দানীয় বস্তু দান না করে নিজেরাই খেয়েছিল এবং রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। নির্ধারিত সময় ধরে রাজপুত্ররা ভগবানের ব্যাপক সেবাপূজা করে, ভগবানকে পুরোভাগে রেখে পিতার কাছে গেল। সেখানে যাওয়ার পরেই ভগবান পরিনির্বাপিত হলেন। রাজা, রাজপুত্ররা, জনপদে নিযুক্ত কর্মচারী ও কোষাধ্যক্ষ সবাই ক্রমান্বয়ে মৃত্যুবরণ করে পরিষদসহ স্বর্গে উৎপন্ন হলেন, কিন্তু যারা মনে মনে রেগে গিয়েছিল তারা নিরয়ে জন্ম নিল। এভাবে সেই দুই দল ব্যক্তির মধ্যে একদল স্বর্গ হতে স্বর্গে, এবং আরেক দল নিরয় হতে নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে হয়ে বিরানব্বই কল্প অতিবাহিত করেছিল।

এরপর এই ভদ্রকল্পে কাশ্যপ বুদ্ধের সময় মনে মনে রেগে যাওয়া সেই লোকগুলো প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করল। তখন মানুষেরা নিজেদের জ্ঞাতিপ্রেতদের কল্যাণের জন্য দান দিয়ে উৎসর্গ করত এই বলে—“এটি আমাদের জ্ঞাতিদের হোক!” তারা সেই সম্পত্তি লাভ করত। তা দেখে এই প্রেতরাও কাশ্যপ ভগবানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “ভন্তে, আমরাও কি এই ধরনের সম্পত্তি পেতে পারি না?” ভগবান বললেন, “এখন পাবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন গৌতম নামে বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন তখন তাঁর সময় বিম্বিসার নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই তোমাদের আজ থেকে বিরানব্বই কল্প আগে জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি বুদ্ধকে দান করে তোমাদের উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করবেন, তখন তোমরা পাবে।” এভাবে বললে সেই কথাটি নাকি সেই প্রেতদের কাছে “তোমরা আগামীকাল লাভ করবে” বলার মতো মনে হয়েছিল।

এরপর এক বুদ্ধান্তরকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের ভগবান জগতে উৎপন্ন হলেন। সেই তিনজন রাজপুত্রও তাদের আড়াই হাজার লোকসহ দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে, মগধরাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, ক্রমান্বয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে গয়াশীর্ষে তিনজন জটাধারী সন্ন্যাসী হয়েছিল, জনপদে নিযুক্ত কর্মচারীটি হয়েছিল রাজা বিম্বিসার, কোষাধ্যক্ষটি হয়েছিল বিশাখ নামে এক মহাশ্রেষ্ঠী, আর তার স্ত্রী ধর্মদিন্না হয়েছিল শ্রেষ্ঠীকন্যা। এভাবে পরিষদের বাকি সবাই রাজার অনুচর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল।

আমাদের ভগবান জগতে উৎপন্ন হয়ে সাত সপ্তাহ অতিক্রম করার পর, ক্রমান্বয়ে বারাণসীতে এসে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে, পঞ্চবর্গীয়দের থেকে শুরু করে আড়াই হাজার শিষ্যবিশিষ্ট তিনজন জটাধারী সন্ন্যাসীকে দমন করে রাজগৃহে গেলেন। সেখানে যেদিন পৌঁছালেন সেদিনই রাজা বিম্বিসারকে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত করালেন একলক্ষ দশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি সহকারে। এরপর রাজা কর্তৃক আগামীকাল ভাত খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হলে ভগবান সম্মতি দিয়ে পরদিন যাওয়ার সময় দেবরাজ ইন্দ্র সক্ক ভগবানের আগে আগে যেতে যেতে—

“দমিত ব্যক্তি দমিত পুরোনো জটাধারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে,

বিমুক্ত ব্যক্তি বিমুক্ত পুরোনো জটাধারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে,

সোনারঙা ভগবান রাজগৃহে প্রবেশ করলেন।” (মহাৰ.৫৮)

এভাবে ইত্যাদি গাথার মাধ্যমে ভগবানকে প্রশংসা করতে লাগলেন। ভগবান রাজগৃহে প্রবেশ করে রাজার বাড়িতে মহাদান গ্রহণ করলেন। তখন সেই প্রেতরা “এখনই বোধহয় রাজা আমাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন, এখনই বোধহয় উৎসর্গ করবেন” ভেবে মনে অনেক আশা নিয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

রাজা দান দেওয়ার পর “ভগবান কোথায় বাস করবেন” এভাবে ভগবানের বাসস্থানের কথা চিন্তা করলেন, কিন্তু সেই দান কাউকেই উৎসর্গ করলেন না। প্রেতরা আশাহত হয়ে রাতে রাজার বাড়িতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সব শব্দ করল। রাজা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। রাতের শেষে সকাল হওয়ার পর তিনি ভগবানকে বিষয়টি জানালেন, “ভন্তে, আমি এই ধরনের শব্দ শুনতে পেয়েছি, এখন আমার কী হবে!” ভগবান বললেন, “মহারাজ, ভয় পাবেন না, এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না, মূলত আপনার পুরোনো জ্ঞাতিরা প্রেত হয়ে জন্ম নিয়েছিল, তারা এক বুদ্ধান্তরকাল ধরে মনে অনেক আশা নিয়ে বিচরণ করছিল যে, ‘বুদ্ধকে দান দিয়ে তা আমাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন’, কিন্তু আপনি গতকাল তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেননি, তারা আশাহত হয়েই সে-রকম বিকট শব্দ করেছিল।”

তিনি বললেন, “ভন্তে, এখন দান দিলে তারা পাবে কি?” “হ্যাঁ মহারাজ, পাবে।” “তা হলে, ভন্তে, আজ ভগবান আমার বাড়িতে দান গ্রহণ করুন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করব।” ভগবান তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাজা বাড়িতে গিয়ে মহাদানের আয়োজন করে ভগবানকে তা অবগত করালেন। ভগবান রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে সজ্জিত আসনে বসলেন ভিক্ষুসংঘ সহকারে। সেই প্রেতরাও “আজকে বোধহয় লাভ করব” ভেবে সেখানে গিয়ে প্রাচীরের ওপাশে ইত্যাদিতে দাঁড়িয়ে থাকল। ভগবানও এমনভাবে অধিষ্ঠান করলেন, যাতে তাদের সবাইকে রাজা স্পষ্ট দেখতে পান। রাজা জল ঢালতে ঢালতে “এটি আমাদের জ্ঞাতিদের হোক” বলে উৎসর্গ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই প্রেতদের সামনে পদ্মফুলে ছাওয়া অনেক পুষ্করিণী উৎপন্ন হলো। তারা সেখানে স্নান করে এবং সেখান থেকে জলপান করে ক্লান্তি দূর করল, পিপাসা নিবারণ করল। তখন তাদের গায়ের রং একদম খাঁটি সোনার মতো চিকচিক করছিল। রাজা জাউ ও নানা ধরনের খাদ্য-ভোজ্য দান দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাদের দিব্য জাউ, খাদ্য, ভোজ্য উৎপন্ন হলো। সেসব খেয়ে তাদের ইন্দ্রিয়গুলো একদম সতেজ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এরপর রাজা কাপড়চোপড় ও বিছানাপত্র দান দিয়ে উৎসর্গ করলেন। তৎক্ষণাৎ তাদের দিব্যবস্ত্র, দিব্যযান, দিব্যপ্রাসাদ, দিব্য বিছানার চাদর, দিব্য খাট ইত্যাদি নানা ধরনের অলংকার উৎপন্ন হলো। তাদের সেসব সম্পত্তি যাতে রাজা স্পষ্ট দেখতে পান ভগবান সেভাবেই অধিষ্ঠান করলেন। রাজা তা দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। এরপর ভগবান ভোজনপর্ব সেরে মগধের রাজাকে উপদেশ দিতে গিয়েই “**প্রেতগণ প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে**” এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত “**যার দ্বারা, যখন ও যেই কারণে তিরোকুট্ট সূত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, সেসব যথাক্রমে প্রকাশ করলে**” এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটিকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

## প্রথম গাথার বর্ণনা

১. এখন এই তিরোকুট্ট সূত্রের আনুক্রমিক অর্থবর্ণনা করব। যেমন: প্রথম গাথায় **প্রাচীরের ওপাশে** মানে পাঁচিলের ওপাশে বলা হয়। **দাঁড়িয়ে আছে** এটি বসা ইত্যাদিকে প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তিতে স্থান নির্ধারণের শব্দবন্ধ। এর দ্বারা লোকজন যেমন প্রাচীরের ওপাশে ও পর্বতের ওপাশে যাওয়ার সময় “প্রাচীরের ওপাশে, পর্বতের ওপাশে অবাধে গমন করে” বলে থাকে, তেমনি পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময় “তারা প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে” বললেন। **সন্ধিস্থলে ও মোড়ে** বলতে এখানে চারকোনা রাস্তাকেই **সন্ধিস্থল** বলা হয়, তা ছাড়া ঘরের সন্ধিস্থল, দেয়ালের সন্ধিস্থল, জানালার সন্ধিস্থলও বলা হয়। তিনকোনা রাস্তাকেই **মোড়** বলা হয়, সেটিকে একত্র করে আগেরটির সঙ্গে যুক্ত করে “সন্ধিস্থলে ও মোড়ে” বললেন। **দরজার খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে** মানে হচ্ছে নগরদ্বার ও ঘরের দরজার খুঁটিগুলোতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। **নিজ ঘরে এসে** বলতে এখানে নিজ ঘরে মানে হচ্ছে পূর্বেকার জ্ঞাতির ঘরে, অথবা নিজে মালিক হয়ে বসবাস করা পূর্বেকার ঘরে। এই উভয় প্রকার ঘরে যেহেতু তারা নিজ ঘর মনে করে আগমন করে, তাই “নিজ ঘরে এসে” বললেন।

## দ্বিতীয় গাথার বর্ণনা

২. এভাবে ভগবান পূর্বে বসবাস না করা সত্ত্বেও পূর্বেকার জ্ঞাতির ঘর বিম্বিসারের বাড়িকে নিজ ঘর মনে করে এসে বহু প্রেত প্রাচীরের ওপাশে, সন্ধিস্থলে ও মোড়ে, দরজার খুঁটিতে দাঁড়িয়ে থেকে ঈর্ষা ও কৃপণতার ফল ভোগ করছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লম্বা লম্বা চুল-দাড়িওয়ালা হয়ে বিকৃত বেশ ধারণ করে, মুখ গোমড়া করে, শিথিল দেহে, আলকাতরাতুল্য মিশমিশে কালো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে অগ্নিদগ্ধ বনে পোড়া তালগাছের মতো এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ তীব্র ক্ষুধা-পিপাসার জ্বালায় পেট থেকে উত্থিত হয়ে মুখ দিয়ে বেরোতে থাকা অগ্নিশিখার দ্বারা জ্বলন্ত শরীর নিয়ে ছটফট করছে, তাদের মধ্যে কারো কারো কণ্ঠনালি সুচের ছোট্ট ছিদ্রের মতো সরু, কিন্তু পেট একেবারে বিশাল পর্বতের মতো, তারা খাদ্য-পানীয় পেলেও প্রয়োজনমতো ভোজন করতে না পারার দরুন তীব্র ক্ষুধা-পিপাসার জ্বালায় অন্য কোনো রসও আস্বাদন করতে পারে না, কেউ কেউ পরস্পরের অথবা অন্য সত্ত্বদের ফোড়া ফেটে গিয়ে মুখ দিয়ে নির্গত হওয়া রক্তমাখা পুঁজ, গ্রন্থিতেল ইত্যাদি পেয়ে অমৃতের মতো খেয়ে আরো বেশি বিরূপ ও ভয়ানক শরীরধারী হয়েছে, এই ধরনের বহু প্রেতকে নির্দেশ করতেই রাজাকে—

“প্রেতগণ প্রাচীরের ওপাশে, সন্ধিস্থলে ও মোড়ে

দাঁড়িয়ে আছে, এবং নিজ ঘরে এসে

দরজার খুঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে।”—

প্রথম গাথাটি বলার পর, পুনরায় তাদের পূর্বকৃত কর্মের নিদারুণ অবস্থা নির্দেশ করতেই “**প্রচুর অন্ন-পানীয়**” দ্বিতীয় গাথাটি বললেন।

এখানে **প্রচুর** মানে হচ্ছে অল্প নয়, বহু, যা চায় তা। অন্ন ও পানীয় দুটো একসঙ্গে মিলে হচ্ছে **অন্ন-পানীয়**। খাদ্য ও ভোজ্য দুটো একসঙ্গে মিলে হচ্ছে **খাদ্য-ভোজ্য**, এর দ্বারা ভক্ষিত, পানকৃত, খাদিত ও ভোজিতের বশে এই চার প্রকার আহারকে নির্দেশ করা হয়েছে। **প্রস্তুত করা হলেও** মানে হচ্ছে সজ্জিত করা হলেও, তৈরি করা হলেও, সংগ্রহ করা হলেও। **কেউই তাদের স্মরণ করে না** মানে হচ্ছে প্রেতবিষয়ে (অর্থাৎ প্রেতকুলে) উৎপন্ন সেই সত্ত্বদের কোনো মাতা কিংবা পিতা, অথবা কোনো পুত্র, কেউই স্মরণ করে না। কী কারণে? **কর্মের কারণে**, অর্থাৎ দান না করা, দানে বাধা প্রদান করা ইত্যাদি নিজের করা কদর্য কর্মের কারণে। তাদের সেই কর্মই জ্ঞাতিদের স্মরণ করতে দেয় না।

## তৃতীয় গাথার বর্ণনা

৩. এভাবে ভগবান প্রচুর পরিমাণে অন্ন-পানীয় প্রস্তুত করা হলেও “তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু দেবেন নাকি” ভেবে জ্ঞাতিদের কাছ থেকে মনে মনে আশা করে বিচরণ করতে থাকা সেই প্রেতদের কথা তাদেরই করা তীব্র যন্ত্রণাময় ফলদায়ক কর্মের কারণে কোনো জ্ঞাতিই স্মরণ করে না সেটি নির্দেশ করতেই—

“প্রচুর অন্ন-পানীয় এবং খাদ্য-ভোজ্য

প্রস্তুত করা হলেও সত্ত্বগণের কৃতকর্মের কারণে

কেউই তাদের স্মরণ করে না।”—

দ্বিতীয় গাথাটি বলার পর, পুনরায় রাজার প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দানকে প্রশংসা করতেই “**যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা যথাসময়ে**” তৃতীয় গাথাটি বললেন।

এখানে **এভাবে** শব্দটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুটি ব্যাখ্যা: সেই সত্ত্বদের কর্মের কারণে স্মরণ না করেও ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে, যারা এভাবে অনুকম্পাপরায়ণ হয়, এবং হে মহারাজ, আপনি যেভাবে দান দিয়েছেন সেভাবেও যথাসময়ে শুচি, উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত পানীয় ও ভোজন জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে, যারা অনুকম্পাপরায়ণ হয়। **দান করে থাকে** মানে হচ্ছে দান দিয়ে থাকে, উৎসর্গ করে থাকে, সমর্পণ করে থাকে। **জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে** মানে হচ্ছে মাতৃকুল ও পিতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সত্ত্বদের উদ্দেশ্যে। **যারা** মানে হচ্ছে যারা সম্পর্কে পুত্র বা কন্যা অথবা ভাই হয়। **অনুকম্পাপরায়ণ** মানে হচ্ছে কল্যাণকামী, হিতাকাঙ্ক্ষী। **শুচি** মানে হচ্ছে বিমল, দর্শনীয়, মনোরম, নির্দোষ, ন্যায়সঙ্গতভাবে উপার্জিত। **উৎকৃষ্ট** মানে হচ্ছে উত্তম, শ্রেষ্ঠ। **যথাসময়ে** মানে হচ্ছে জ্ঞাতিপ্রেতরা যখন প্রাচীরের ওপাশে ইত্যাদি স্থানে এসে দাঁড়িয়ে থাকে তখন। **উপযুক্ত** মানে হচ্ছে যথাযোগ্য, উপযোগী, আর্যদের পরিভোগযোগ্য। **পানীয়-ভোজন** মানে হচ্ছে পানীয় ও ভোজন। এখানে পানীয় ও ভোজনকে মুখ্য করে সব ধরনের দানীয় সামগ্রীই অভিপ্রেত।

## চতুর্থ ও পূর্বের অর্ধেক গাথার বর্ণনা

৪. এভাবে ভগবান মগধের রাজা কর্তৃক প্রেত হিসেবে জন্ম নেওয়া জ্ঞাতিদের প্রতি অনুকম্পা করে প্রদত্ত পানীয়-ভোজনের প্রশংসা করতেই—

“যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা যথাসময়ে

শুচি, উৎকৃষ্ট, উপযুক্ত পানীয়-ভোজন

জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে দান করে থাকে এভাবে।”

বলার পর, পুনরায় যে প্রকারে দান দিলে সেগুলো তাদের হয় সেটি দেখিয়ে দিতেই “**এটি জ্ঞাতিদের হোক**” বলে চতুর্থ গাথার সঙ্গে পূর্বের অর্ধেক গাথাটিও বললেন। সেটিকে তৃতীয় গাথার অর্ধেক অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া উচিত এভাবে:

“যারা অনুকম্পাপরায়ণ তারা জ্ঞাতিদের

উদ্দেশ্যে দান করে থাকে এভাবে:

‘এটি জ্ঞাতিদের হোক! জ্ঞাতিরা সুখী হোক!’”

এর দ্বারা “এটি জ্ঞাতিদের হোক, এভাবে তারা দান দেয়, অন্যভাবে নয়” এখানে এই প্রকারে কীভাবে দান দেওয়া উচিত তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে **এটি** হচ্ছে দানীয় সামগ্রীরই নমুনা। **জ্ঞাতিদের হোক** মানে হচ্ছে প্রেতবিষয়ে (অর্থাৎ প্রেতকুলে) জন্ম নেওয়া জ্ঞাতিদের হোক। **জ্ঞাতিরা সুখী হোক** মানে হচ্ছে প্রেতবিষয়ে জন্ম নেওয়া সেই জ্ঞাতিরা এগুলো উপভোগ করতে করতে সুখী হোক।

## চতুর্থ ও পঞ্চম গাথার অর্ধাংশের বর্ণনা

৪-৫. এভাবে ভগবান প্রেতবিষয়ে জন্ম নেওয়া জ্ঞাতিদের যে প্রকারে দান দেওয়া উচিত সেটি দেখিয়ে দিতে “এটি জ্ঞাতিদের হোক, জ্ঞাতিরা সুখী হোক” বলার পর, পুনরায় যেহেতু “এটি জ্ঞাতিদের হোক” বললেও একজনের কৃতকর্ম অন্যকে ফল দেয় না, সেই উদ্দেশ্যে দান দেওয়ার সেই ঘটনাটি জ্ঞাতিদের কুশলকর্মের কারণ হয় মাত্র, তাই সেই ঘটনাটি ঘটার মুহূর্তে কীভাবে তাদের ফল-উৎপাদক কুশলকর্ম হয় সেটি দেখিয়ে দিতেই “**সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ সেখানে সমবেত হয়ে**” চতুর্থ গাথার শেষ অর্ধেক অংশ এবং “**প্রচুর অন্ন-পানীয়কে অনুমোদন করে**” পঞ্চম গাথার প্রথম অর্ধেক অংশ বললেন।

সেগুলোর অর্থ হচ্ছে এই: সেই জ্ঞাতিপ্রেতরা যেখানে সেই দান দেওয়া হচ্ছিল সেখানকার চারপাশে এসে জড়ো হয়ে, অথবা সবাই মিলে একত্র হয়ে বলা হয়েছে, অর্থাৎ “এই জ্ঞাতিরা আমাদের কল্যাণের জন্য দানোৎসর্গ করবেন” ভেবে সেই উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হয়ে বলা হয়েছে। **প্রচুর অন্ন-পানীয়কে** মানে হচ্ছে নিজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা সেই প্রচুর অন্ন-পানীয়কে। **শ্রদ্ধাভরে অনুমোদন করে** মানে হচ্ছে তারা কর্মফলকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধাভাবকে বজায় রেখে, অবিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে “এই দান আমাদের হিত-সুখের কারণ হোক” বলে আনন্দ প্রকাশ করে, সাদরে গ্রহণ করে, অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হয়।

## পঞ্চম ও ষষ্ঠ গাথার অর্ধাংশের বর্ণনা

৫-৬. এভাবে ভগবান সেই মুহূর্তে কীভাবে প্রেতবিষয়ে জন্ম নেওয়া সত্ত্বদের ফল-উৎপাদক কুশলকর্ম হয় সেটি দেখিয়ে দিতেই—

“সেই জ্ঞাতিপ্রেতগণ সেখানে সমবেত হয়ে

প্রচুর অন্ন-পানীয়কে শ্রদ্ধাভরে অনুমোদন করে।”—

বলার পর, পুনরায় জ্ঞাতিদের ভিত্তি করে উৎপন্ন কুশল-কর্মফল উপভোগ করতে করতে তারা তাদের জ্ঞাতিদের কীভাবে প্রশংসা করছে সেটি দেখিয়ে দিতেই “**আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ দীর্ঘজীবী হোক**” পঞ্চম গাথার শেষ অর্ধাংশ এবং “**এতে করে আমাদেরও পূজা করা হলো**” ষষ্ঠ গাথার প্রথম অর্ধেক অংশ বললেন।

সেগুলোর অর্থ হচ্ছে এই: **দীর্ঘজীবী হোক** মানে হচ্ছে চিরজীবী, দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হোক। **যাদের অনুগ্রহে** মানে হচ্ছে যাদের ভিত্তি করে, যাদের কারণে। তারা সেই মুহূর্তে নিজেদের লব্ধ সম্পত্তির কথা উল্লেখ করে বলছিল। প্রেতগণ নিজেরা অনুমোদনের দ্বারা, দাতারা দানোৎসর্গের দ্বারা ও দক্ষিণাযোগ্য সম্পত্তির দ্বারা, এই তিনটি অঙ্গের দ্বারা দক্ষিণা (অর্থাৎ দান) সফল হয়, তাৎক্ষণিকভাবে ফল-উৎপাদক হয়। সেখানে দাতারা হচ্ছে বিশেষ হেতু। তাই তো বলা হয়েছে, “যাদের অনুগ্রহে পুণ্যফল লাভ করেছি।” **আমাদেরও পূজা করা হলো** মানে হচ্ছে “এটি জ্ঞাতিদের হোক” এভাবে এই দান উৎসর্গ করার মাধ্যমে আমাদেরও পূজা করা হলো। **দাতারাও নিষ্ফল হয় না** মানে হচ্ছে যাঁদের মাঝে দানময় কর্ম সম্পাদন করা হলো, এ ক্ষেত্রে তার ফলদানের ভিত্তিতে দাতারাও নিষ্ফল হয় না।

এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, “কিন্তু শুধু কি প্রেতবিষয়ে জন্ম নেওয়া জ্ঞাতিরাই লাভ করে, নাকি অন্যরাও লাভ করে?” উত্তরে বলা যায়, “জাণুস্সোণি ব্রাহ্মণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবান নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমাদের আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে! সেখানে বলা হয়েছে:

“মাননীয় গৌতম, আমরা ব্রাহ্মণরা দান দিই, শ্রাদ্ধকর্ম করি এই ভেবে যে, ‘এই দান আমাদের রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেতদের কাছে পৌঁছুক, এই দান আমাদের রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেতরা পরিভোগ করুক।’ হে মাননীয় গৌতম, সেই দান কি আমাদের রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেতদের কাছে পৌঁছায়? সেই দান কি আমাদের রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেতরা পরিভোগ করতে পারে?” “হে ব্রাহ্মণ, স্থানে পৌঁছায়, অস্থানে নয়।”

“মাননীয় গৌতম, সেই স্থান কোনটি? আর অস্থান কোনটি?” “এখানে, হে ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ প্রাণিহত্যা করে... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যা নৈরয়িক সত্ত্বদের আহার তা দিয়েই সে সেখানে জীবনযাপন করে, তা দিয়েই সে সেখানে বেঁচে থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এটি হচ্ছে অস্থান, যেখানে স্থিত থাকা সত্ত্বের কাছে সেই দান পৌঁছায় না।”

“এখানে, হে ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ প্রাণিহত্যা করে... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর ইতর প্রাণীর যোনিতে উৎপন্ন হয়। যা ইতর প্রাণীর যোনিতে উৎপন্ন সত্ত্বদের আহার তা দিয়েই সে সেখানে জীবনযাপন করে, তা দিয়েই সে সেখানে বেঁচে থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এটি হচ্ছে অস্থান, যেখানে স্থিত থাকা সত্ত্বের কাছে সেই দান পৌঁছায় না।”

“এখানে, হে ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকে... সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর মানুষদের মাঝে উৎপন্ন হয়।... দেবতাদের মাঝে উৎপন্ন হয়। যা দেবতাদের আহার তা দিয়েই সে সেখানে জীবনযাপন করে, তা দিয়েই সে সেখানে বেঁচে থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এটি হচ্ছে অস্থান, যেখানে স্থিত থাকা সত্ত্বের কাছে সেই দান পৌঁছায় না।”

“এখানে, হে ব্রাহ্মণ, কেউ কেউ প্রাণিহত্যা করে... মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, সে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন হয়। যা প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন সত্ত্বদের আহার তা দিয়েই সে সেখানে জীবনযাপন করে, তা দিয়েই সে সেখানে বেঁচে থাকে। অথবা এখান থেকে তার বন্ধুবান্ধবরা বা রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিরা তার উদ্দেশ্যে যা দান দেয় তা দিয়েই সে সেখানে জীবনযাপন করে, তা দিয়েই সে সেখানে বেঁচে থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এটিই হচ্ছে স্থান, যেখানে স্থিত থাকা সত্ত্বের কাছে সেই দান পৌঁছায়।”

“কিন্তু, মাননীয় গৌতম, সেই রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেত যদি সেই স্থানে উৎপন্ন না হয়, তখন কে সেই দান পরিভোগ করে?” “হে ব্রাহ্মণ, তার রক্তসম্পর্কীয় অন্য জ্ঞাতিপ্রেতরা সেই স্থানে উৎপন্ন হয়, তারাই সেই দান পরিভোগ করে।”

“কিন্তু, মাননীয় গৌতম, সেই রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেত যদি সেই স্থানে উৎপন্ন না হয় এবং তার রক্তসম্পর্কীয় অন্য জ্ঞাতিপ্রেতরাও যদি সেই স্থানে উৎপন্ন না হয়, তখন কে সেই দান পরিভোগ করে?” “হে ব্রাহ্মণ, এটি কিছুতেই সম্ভব নয় এবং এমনটি হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, সেই স্থান দীর্ঘ সময় ধরে রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতিপ্রেতশূন্য অবস্থায় থাকবে। তা ছাড়া, হে ব্রাহ্মণ, এ ক্ষেত্রে দাতাও নিষ্ফল হয় না।” (অ.নি.১০.১৭৭)

## ষষ্ঠ গাথার অর্ধাংশ ও সপ্তম গাথার বর্ণনা

৬-৭. এভাবে ভগবান মগধের রাজার প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন পূর্বজ্ঞাতিরা যখন প্রাপ্ত সম্পত্তির বিষয়ে প্রশংসা করছিল তখন “হে মহারাজ, আপনার এই জ্ঞাতিরা এই দানসম্পত্তি পেয়ে খুশি হয়ে এভাবে প্রশংসা করছে” সেটি দেখিয়ে দিতেই—

“যাদের অনুগ্রহে পুণ্যফল লাভ করেছি

আমাদের সেই জ্ঞাতিগণ দীর্ঘজীবী হোক।

এতে করে আমাদেরও পূজা করা হলো,

এবং দাতারাও নিষ্ফল হয় না।”—

গাথাটি বলার পর, পুনরায় সেই প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন সত্ত্বদের যে কৃষিকাজ, গোপালন ইত্যাদি সম্পত্তি উপার্জনের অন্য কোনো উপায় নেই এবং এখান থেকে প্রদত্ত সম্পত্তি দিয়েই তারা সেখানে জীবনযাপন করে সেটি নির্দেশ করতেই “**সেখানে কৃষিকাজ নেই**” ষষ্ঠ গাথার শেষ অর্ধেক অংশ এবং “**সে-রকম কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই**” এই সপ্তম গাথাটি বললেন।

এখানে সেগুলোর অর্থবর্ণনা হচ্ছে এই: হে মহারাজ, সেখানে অর্থাৎ প্রেতবিষয়ে কোনো কৃষিকাজ নেই, যাকে ভিত্তি করে সেই প্রেতরা সম্পত্তি উপার্জন করবে। **গোপালন নেই** মানে হচ্ছে শুধু যে কৃষিকাজ নেই তা নয়, সেখানে অর্থাৎ প্রেতবিষয়ে গোপালনও নেই, যাকে ভিত্তি করে তারা সম্পত্তি উপার্জন করবে। **সে-রকম কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যও নেই** মানে হচ্ছে সেখানে এমন কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য নেই যা তাদের সম্পত্তি উপার্জনের হেতু হবে। **টাকাপয়সার বিনিময়ে বেচাকেনাও নেই** মানে হচ্ছে সেখানে টাকাপয়সার বিনিময়ে সে-রকম কোনো বেচাকেনাও নেই যা তাদের সম্পত্তি উপার্জনের হেতু হবে। **এখান থেকে যা দেওয়া হয় তা দিয়েই মৃত প্রেতরা সেখানে জীবনধারণ করে** মানে হচ্ছে এখান থেকে জ্ঞাতিরা অথবা বন্ধুবান্ধবরা যা দান দেয় তা দিয়েই তারা সেখানে জীবনযাপন করে, অস্তিত্ব রক্ষা করে। **প্রেতরা** মানে হচ্ছে প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন সত্ত্বগণ। **মৃত** মানে হচ্ছে নিজে মৃত্যুবরণ করেছে বা মারা গেছে এমন। **সেখানে** মানে হচ্ছে সেই প্রেতবিষয়ে।

## অষ্টম ও নবম গাথাদ্বয়ের বর্ণনা

৮-৯. এভাবে “এখান থেকে যা দেওয়া হয় তা দিয়েই মৃত প্রেতরা সেখানে জীবনধারণ করে” বলার পর, এখন উপমার মাধ্যমে সেই বিষয়টিকে প্রকাশ করতেই “**বৃষ্টির জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে**” এই গাথাদ্বয় বললেন।

তার অর্থ হচ্ছে এই: উঁচু জায়গায় মেঘ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির জল যেমন নিচু জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ যেই যেই স্থান একটু নিচু, সেই সেই স্থানে প্রবাহিত হয়, গমন করে ও পৌঁছায়, ঠিক তেমনি এখান থেকে প্রদত্ত দানও প্রেতদের কাছে পৌঁছায়, উৎপন্ন হয় ও প্রাদুর্ভূত হয়, এই হচ্ছে এর অর্থ। নিচু স্থান যেমন জল প্রবাহিত হওয়ার স্থান, তেমনি প্রেতলোকও হচ্ছে দান পৌঁছানোর স্থান। যেমন বলা হয়েছে, “হে ব্রাহ্মণ, এটিই হচ্ছে স্থান, যেখানে স্থিত থাকা সত্ত্বের কাছে সেই দান পৌঁছায়।” (অ.নি.১০.১৭৭) গিরিকন্দর, পর্বতের ফাটল, শাখা-প্রশাখা ও ছোট-বড়ো জলাধার হতে প্রবাহিত জলধারা যেমন মহানদীকে পূর্ণ করে সাগরকে পরিপূর্ণ করে তোলে, তেমনি এখান থেকে প্রদত্ত দানও পূর্বোক্ত নিয়মে প্রেতদের কাছে পৌঁছায়।

## দশম গাথার বর্ণনা

১০. এভাবে “এখান থেকে যা দেওয়া হয় তা দিয়েই মৃত প্রেতরা সেখানে জীবনধারণ করে” এই বিষয়টিকে উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করার পর, পুনরায় যেহেতু সেই প্রেতরা “এখান থেকে কিছু পাবো” এই আশায় বুক বেঁধে জ্ঞাতিদের ঘরে এসেও “এটি আমাদের দাও” বলে চেয়ে নিতে পারে না, তাই তাদের এই অনুস্মরণের বিষয়গুলো অনুস্মরণকারী কুলপুত্রের দ্বারাই দান দেওয়া উচিত, সেটি দেখিয়ে দিতেই “**তারা আমায় কত কিছু দিয়েছিল**” এই গাথাটি বললেন।

তার অর্থ হচ্ছে এই: “আমাকে সে এই ধন বা শস্য দিয়েছিল”, “আমার জন্য সে এই কাজটি নিজে উদ্যোগী হয়ে করে দিয়েছিল”, “অমুক ব্যক্তি আমার মাতৃ কিংবা পিতৃকুলের দিক থেকে সম্পর্কিত হওয়ায় জ্ঞাতি ছিল”, স্নেহের বশে রক্ষা করতে সমর্থ বিধায় “বন্ধু ছিল” এবং “অমুক ব্যক্তি আমার ছেলেবেলার খেলার সাথি ছিল” এভাবে তার সবকিছু অনুস্মরণ করে প্রেতদের দান দেওয়া উচিত, দান উৎসর্গ করা উচিত।

## একাদশ গাথার বর্ণনা

১১. এভাবে প্রেতদের উদ্দেশ্যে দান উৎসর্গ করার কারণভুক্ত অনুস্মরণের বিষয়গুলো দেখিয়ে দিতেই—

“সে আমায় কত কিছু দিয়েছিল,

সে আমার জন্য কত কিছু করেছিল,

সে আমার জ্ঞাতি, বন্ধু ও সঙ্গী ছিল,

এভাবে তার পূর্বকৃত কাজের কথা

স্মরণ করেই প্রেতদের দান দেওয়া উচিত।”

এই গাথাটি বলার পর, পুনরায় যারা জ্ঞাতির মৃত্যুতে কান্না, শোক ইত্যাদি করে থাকে, সেগুলো তাদের কোনো কাজেই আসে না, তাদের সেই কান্না, শোক ইত্যাদি কেবল নিজেদেরই কষ্ট দেয়, সেগুলো প্রেতদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে না, সেটি দেখিয়ে দিতেই “**কান্না, শোক**” এই গাথাটি বললেন।

এখানে **কান্না** মানে হচ্ছে রোদন, রোদনের অবস্থা, অশ্রু বিসর্জন, এর দ্বারা কায়িক পরিশ্রমকেই নির্দেশ করা হয়েছে। **শোক** মানে আক্ষেপ, আক্ষেপের অবস্থা, এর দ্বারা চিত্তের পরিশ্রমকেই নির্দেশ করা হয়েছে। **যা বাড়তি** মানে হচ্ছে যা কান্না, শোক হতে অন্য কিছু। **বিলাপ** মানে হচ্ছে জ্ঞাতির মৃত্যুতে মনঃকষ্টজাত অর্থহীন কাতরোক্তি, “আমার একমাত্র প্রিয় ও মনোজ্ঞ পুত্রটি কোথায়!” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে তার গুণ বর্ণনা করা, এর দ্বারা বাচনিক পরিশ্রমকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

## দ্বাদশ গাথার বর্ণনা

১২. এভাবে “কান্না, শোক এবং যা বাড়তি বিলাপ—সেসব প্রেতদের কোনো কাজে লাগে না, সেগুলো কেবল নিজেদেরই কষ্ট দেয়, এভাবেই জ্ঞাতিগণ সেখানে বেঁচে থাকে” এভাবে কান্না ইত্যাদির নিরর্থকতা তুলে ধরার পর, পুনরায় মগধের রাজা কর্তৃক যা দান দেওয়া হয়েছে তার সার্থকতাকে তুলে ধরতেই “**এই যে দান দেওয়া হয়েছে**” এই গাথাটি বললেন।

তার অর্থ হচ্ছে এই: হে মহারাজ, আজ আপনি নিজ জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে এই যে দান দিলেন, তা যেহেতু সংঘ হচ্ছে জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, তাই সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই দান প্রেতদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে হিত সাধন করবে, হিত বয়ে আনবে, সুফল দেবে বলা হয়েছে। **তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়** মানে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই বা অচিরেই তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। যেমন কোনো বিষয় তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট হলে তখন “এটি তথাগতের কাছে তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট হলো” বলা হয়, তেমনি এই দান তৎক্ষণাৎ পৌঁছায় বলেই “তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়” বলা হয়েছে। অথবা “হে ব্রাহ্মণ, এটিই হচ্ছে স্থান, যেখানে স্থিত থাকা সত্ত্বের কাছে সেই দান পৌঁছায়” (অ.নি.১০.১৭৭) বলে যা বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে ক্ষুৎপিপাসিক প্রেত, বমিখাদক প্রেত, পরদত্তোপজীবী প্রেত, জ্বালাময়ী তৃষ্ণিক প্রেত (*নিজ্ঝামতণ্হিক)* ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৌঁছায় বলা হয়েছে, অনেকটা টাকা দেওয়ার সময় যেমন জগতে “সে টাকা দেয়” বলা হয় সেভাবে। বিকল্প অর্থে **পৌঁছায়** মানে প্রাদুর্ভূত হয়, উৎপন্ন হয় বলা হয়েছে।

## ত্রয়োদশ গাথার বর্ণনা

১৩. এভাবে ভগবান রাজা কর্তৃক প্রদত্ত দানের সার্থকতা তুলে ধরতেই—

“এই যে দান দেওয়া হয়েছে তা সংঘে সুপ্রতিষ্ঠিত,

এটি তাদের দীর্ঘকাল হিতসুখের জন্য

তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়।”

এই গাথাটি বলার পর, পুনরায় যেহেতু এই দান দেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞাতিদের প্রতি জ্ঞাতিদের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের ভিত্তিতে জ্ঞাতিধর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো, বহুজনের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হলো, কাজেই একইভাবে তোমাদের দ্বারা জ্ঞাতিদের প্রতি জ্ঞাতিদের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের ভিত্তিতে জ্ঞাতিধর্ম পরিপূরণ করা উচিত, অর্থহীন কান্না ইত্যাদির দ্বারা নিজেদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, প্রেতরা দিব্যসম্পত্তি লাভ করার মধ্য দিয়ে প্রেতদেরও মহৎ পূজা করা হলো, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে অন্ন-পানীয় ইত্যাদি দান দিয়ে পরিতৃপ্ত করার মাধ্যমে ভিক্ষুদের বল বাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং অনুকম্পা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ত্যাগচেতনা উৎপন্ন করার মাধ্যমে বিপুল পুণ্য করা হলো, তাই ভগবান এই সমস্ত সত্যিকার গুণের দ্বারা রাজাকে প্রশংসা করার লক্ষ্যে—

“এতে সেই জ্ঞাতিধর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো,

প্রেতদের মহৎ পূজা করা হলো,

ভিক্ষুদের বল বাড়িয়ে দেওয়া হলো,

তোমাদের দ্বারাও বিপুল পুণ্য করা হলো।”

এই গাথাটি বলে দেশনা শেষ করলেন।

অথবা “**এতে সেই জ্ঞাতিধর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হলো**” এই গাথাপদের দ্বারা ভগবান রাজাকে ধর্মকথায় খুশি করলেন। জ্ঞাতিধর্মের দৃষ্টান্তই হচ্ছে এখানে উপদেশ। “**প্রেতদের মহৎ পূজা করা হলো**”এই কথা বলে ভগবান তাঁকে প্রণোদনা জোগালেন। **মহৎ** শব্দটি আসলে প্রশংসাই, এটিই হচ্ছে এখানে বারবার পূজা করার প্রণোদনা। “**ভিক্ষুদের বল বাড়িয়ে দেওয়া হলো**” এই কথা বলে ভগবান তাঁকে উৎসাহিত করলেন। বল বাড়িয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে এখানে দান, আর বল বাড়িয়ে দেওয়ার অবস্থাটা হচ্ছে তাঁর মনে উৎসাহ বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রণোদনা জোগানো। “**তোমাদের দ্বারাও বিপুল পুণ্য করা হলো**” এই কথা বলে ভগবান তাঁকে পুলকিত করলেন। পুণ্য করা হলো এই প্রশংসাটাই হচ্ছে এখানে সত্যিকার গুণ বর্ণনার দ্বারা তাঁর মনে পুলক জাগিয়ে দেওয়ার ভিত্তিতে পুলকিতকরণ হিসেবে বুঝতে হবে।

দেশনা শেষে প্রেতবিষয়ে উৎপন্ন হওয়ার বিপদের কথা তুলে ধরার ফলে মনে মনে সংবিগ্ন হওয়ায় এবং যথাযথ উপায়ে প্রচেষ্টা করায় চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। পরের দিনও ভগবান দেবতা ও মানুষদের উদ্দেশ্যে এই তিরোকুট্ট সূত্রটি দেশনা করলেন। এভাবে পরপর সাত দিন পর্যন্ত একই সংখ্যক প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

তিরোকুট্ট সূত্রের বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# ৮. নিধিকণ্ড সূত্রের বর্ণনা

## সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা

এখন তিরোকুট্ট সূত্রের পরপর “**গভীরে, জলের তলদেশে পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে**” ইত্যাদির দ্বারা যে নিধিকণ্ড সূত্রটি আলোচিত হয়েছে, সেই—

“নিধিকণ্ড সূত্রটির সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা ভাষণ করে,

এবং পটভূমি তুলে ধরে, আমরা এর অর্থবর্ণনা করব।”

এখানে সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথাটিকে বুঝতে হবে এভাবে: এই নিধিকণ্ড সূত্রটি ভগবান কর্তৃক এই ধারাবাহিকতায় বলা না হলেও, যেহেতু এটি উপদেশের বশে কথিত তিরোকুট্ট সূত্রের জুড়ির পর্যায়ভুক্ত, তাই এখানে আলোচিত হয়েছে। অথবা তিরোকুট্ট সূত্রের দ্বারা পুণ্যহীন ব্যক্তিদের দুর্দশা দেখিয়ে দেওয়ার পর, এর দ্বারা কৃতপুণ্য ব্যক্তিদের সমৃদ্ধি দেখিয়ে দিতেই এই সূত্রটি এখানে আলোচিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এখানে এই হচ্ছে এর সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা।

## সূত্রের পটভূমি

এর পটভূমি হচ্ছে এই: শ্রাবস্তীতে নাকি এক জমিদার ছিলেন। তিনি ছিলেন ধনী, মহাধনী ও মহাভোগসম্পত্তির মালিক। এবং তিনি নাকি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিলেন। তিনি মনের কৃপণতামল পরিত্যাগ করে গৃহে বসবাস করছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান দিচ্ছিলেন। সেই সময় রাজার প্রচুর ধনের প্রয়োজন দেখা দিল। তাই রাজা তাঁর কাছে লোক পাঠালেন এই বলে যে, “ওহে, যাও, অমুক জমিদারকে ডেকে নিয়ে এসো।” সে গিয়ে সেই জমিদারকে বলল, “হে গৃহপতি, রাজা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।” জমিদার তখন মনে মনে শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণ সমন্বিত হয়ে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করতে করতে বললেন, “ওহে পুরুষ, তুমি যাও, আমি পরে আসব, এখন আমি সম্পত্তি গচ্ছিত রাখার কাজে ব্যস্ত আছি।” এরপর ভগবান ভোজনপর্ব শেষ করে তাঁর সেই পুণ্যসম্পত্তিকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিধি বা সম্পত্তি হিসেবে তুলে ধরতে এবং সেই জমিদারকে উপদেশ দেওয়ার লক্ষ্যে “**গভীরে, জলের তলদেশে পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে**” এই গাথাগুলো ভাষণ করলেন। এই হচ্ছে সূত্রের পটভূমি।

এভাবে এই—

“নিধিকণ্ড সূত্রটির সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা ভাষণ করে,

এবং পটভূমি তুলে ধরে, আমরা এর অর্থবর্ণনা করব।”

## প্রথম গাথার বর্ণনা

১. এখানে **গভীরে, জলের তলদেশে পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে** মানে গচ্ছিত রাখা হয় বলে নিধি বা সম্পত্তি, অর্থাৎ জমা রাখা হয়, সংরক্ষণ করা হয়, যত্ন করে আগলে রাখা হয় অর্থে। সেই সম্পত্তি চার প্রকার; যথা: স্থাবর, জঙ্গম, অঙ্গসম ও অনুগামী। এখানে **স্থাবর** মানে হচ্ছে মাটিতে পুঁতে রাখা বা শূন্যে জমা রাখা হীরা, সোনা, ক্ষেত্র বা জায়গাজমি, অথবা অন্য যা কিছু এই জাতীয় নিশ্চল জড়বস্তু আছে, এগুলোই হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তি। **জঙ্গম** মানে হচ্ছে দাস-দাসী, হাতি, গরু, ঘোড়া, ঘোটকী, ছাগল, মোরগ, শুয়োর, অথবা অন্য যা কিছু এই জাতীয় সচল প্রাণী আছে, এগুলোই হচ্ছে জঙ্গম সম্পত্তি। **অঙ্গসম** মানে হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, শিল্প-কলকারখানা, বিদ্যাশিক্ষা, অথবা অন্য যা কিছু এই জাতীয় অর্জিত বিদ্যা, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, এগুলোই হচ্ছে অঙ্গসম সম্পত্তি। **অনুগামী** মানে হচ্ছে দানময় পুণ্য, শীলময় পুণ্য, ভাবনাময় পুণ্য, ধর্মশ্রবণজনিত পুণ্য, ধর্মদেশনাজনিত পুণ্য, অথবা অন্য যা কিছু এই জাতীয় পুণ্য আছে যা বিভিন্ন স্থানে অনুগমন করার মতো কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে নিয়ে আসে, এগুলোই হচ্ছে অনুগামী সম্পত্তি। এখানে কিন্তু স্থাবর সম্পত্তিই অভিপ্রেত।

**গচ্ছিত রাখে** মানে হচ্ছে জমা রাখে, গুছিয়ে রাখে, সংরক্ষণ করে রাখে। **পুরুষ** বলতে মানুষ বোঝায়। চাইলে একজন পুরুষ কিংবা নারী, এমনকি পণ্ডকও (অর্থাৎ নপুংসক বা হিজড়াও) সম্পত্তি গচ্ছিত রাখতে পারে, কিন্তু এখানে পুরুষকে মুখ্য করেই দেশনা করা হয়েছে, অর্থগতভাবে এখানে সেগুলোকে এক হিসেবেই দেখতে হবে। **গভীরে, জলের তলদেশে** মানে হচ্ছে ডুব দেওয়ার যোগ্য অর্থে গভীর, আর জলের একেবারে তলার দ্বারা জলের তলদেশ। গভীর কিন্তু জলের তলদেশ নয় এমন স্থান আছে যা জঙ্গলে বা মাটিতে শত হাত গভীর গর্তের মতো, জলের তলদেশ কিন্তু গভীর নয় এমন স্থান আছে যা নিচু জায়গায় বা ছোটখাটো জলাধারে এক বা দুই বিঘত গভীর গর্তের মতো, যুগপৎ গভীর ও জলের তলদেশ এমন স্থান আছে যা জঙ্গলে বা মাটিতে যতক্ষণ জল না বেরোয় ততক্ষণ খোঁড়া গর্তের মতো। এটিকে লক্ষ্য করেই “গভীরে, জলের তলদেশে” কথাটি বলা হয়েছে। **কল্যাণকর কৃত্য দেখা দিলে** মানে হচ্ছে কল্যাণ হতে বিচ্যুত হয় না বলে কল্যাণকর, মঙ্গলজনক ও হিতকর অর্থে বলা হয়েছে। করা উচিত বলে কৃত্য, যেকোনো ধরনের করণীয় কাজ অর্থে বলা হয়েছে। **দেখা দিলে** মানে কর্তব্য হিসেবে সামনে এসে উপস্থিত হলে বলা হয়েছে। সেই ধরনের কল্যাণকর কৃত্য দেখা দিলে। **আমার কাজে লাগবে ভেবে** এটি গচ্ছিত রাখার প্রয়োজনকেই তুলে ধরেছে। এই উদ্দেশ্যেই সে গচ্ছিত রাখে—“আমার যদি কল্যাণকর কোনো করণীয় কাজ দেখা দেয় তখন আমার কাজে লাগবে, এর দ্বারা আমার কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।” কৃত্য দেখা দিলে তা সম্পন্ন করার ভিত্তিতেই এটিকে বুঝতে হবে।

## দ্বিতীয় গাথার বর্ণনা

এভাবে গচ্ছিত রাখার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরার সময় কল্যাণ অর্জনের অভিপ্রায়কে তুলে ধরার পর, এখন অকল্যাণ দূর করার অভিপ্রায়কে তুলে ধরতেই বললেন:

২. “রাজার উৎপাতে, চোরের উৎপীড়নে অথবা ঋণমুক্তিতে,

দুর্ভিক্ষে অথবা বিপদে-আপদে (আমার কাজে লাগবে)।

এসব উদ্দেশ্যেই পুরুষ জগতে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে।”

তার অর্থ হচ্ছে: “আমার কাজে লাগবে” এবং “অথবা ঋণমুক্তিতে” এখানে বর্ণিত এই দুটো পদ বা শব্দবন্ধকে যথাস্থানে যুক্ত করেই বুঝতে হবে।

এখানে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই: কেবল “আমার কাজে লাগবে” ভেবেই একজন পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে না, অধিকন্তু “এই চোর” বা “ব্যভিচারী” অথবা “শুল্ক ফাঁকি দেওয়া ব্যক্তি” এভাবে ইত্যাদি নানা ধরনের বিরোধী শত্রুপক্ষ হতে, অথবা রাজার উৎপাত হতে মুক্ত হতে কাজে লাগবে, অথবা সিঁধ কাটা ইত্যাদির মাধ্যমে যারা ধনসম্পত্তি লুঠ করে তাদের হাত থেকে, অথবা “এই পরিমাণ সোনা-হীরা দাও” বলে যারা হত্যার হুমকি দেয় তাদের হাত থেকে, অথবা চোরদের দ্বারা উৎপীড়িত হলে তখন চোরের হাত থেকে মুক্ত হতে কাজে লাগবে। আমার অনেক ঋণদাতা আছে তারা যখন আমাকে “ঋণ পরিশোধ করো” বলে চাপ দেবে তখন তাদের ঋণ পরিশোধে আমার কাজে লাগবে। এমন এক সময় আসতে পারে যখন দুর্ভিক্ষ, শস্যের ঘাটতি ও খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে, তখন সামান্য ধনসম্পত্তি দিয়ে জীবনধারণ করা অনেক কষ্টসাধ্য, সেই ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তখন আমার অনেক কাজে লাগবে। অগ্নি, জল অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারী হতে যে-ধরনের বিপদ-আপদ এসে থাকে সে-ধরনের বিপদ-আপদ দেখা দিলে তখন আমার কাজে লাগবে ভেবে একজন পুরুষ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে।

এভাবে ‘কল্যাণ অর্জনের অভিপ্রায়’ এবং ‘অকল্যাণ দূর করার অভিপ্রায়’ দুটি গাথায় দুই প্রকার গচ্ছিত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরার পর, এখন সেই দুই প্রকার প্রয়োজনের উপসংহার টানতেই বললেন:

“এসব উদ্দেশ্যেই পুরুষ জগতে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে।”

তার অর্থ হচ্ছে: এই যে “আমার কাজে লাগবে” এবং “রাজার উৎপাতে” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণ তুলে ধরা হয়েছে। **এসব উদ্দেশ্যেই** মানে হচ্ছে এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেই এই আকাশের জগতে যা কিছু হীরা, সোনা ইত্যাদি ভেদে **সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে** অর্থাৎ জমা রাখে, সংরক্ষণ করে রাখে।

## তৃতীয় গাথার বর্ণনা

এখন যেহেতু এভাবে গচ্ছিত রাখলেও সেই সম্পত্তি একমাত্র পুণ্যবান ব্যক্তিরই অভীষ্ট কল্যাণ সাধিত করে, অন্যদের নয়, তাই সে-বিষয়টি তুলে ধরতেই বললেন:

৩. “গভীরে, জলের তলদেশে ঠিকমতো গচ্ছিত রাখলেও

সেগুলোর সবই সব সময় তার কাজে আসে না।”

তার অর্থ হচ্ছে: সেই সম্পত্তি **ঠিকমতো গচ্ছিত রাখলেও**, অর্থাৎ সুন্দরভাবে মাটি খনন করে তার ভেতরে সমানে জমিয়ে রাখলেও বলা হয়েছে। সুন্দরভাবে মানে কীভাবে? **গভীরে, জলের তলদেশে**, অর্থাৎ যেভাবে রাখলে যুগপৎ গভীরে ও জলের তলদেশে গচ্ছিত রাখা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, সেটিকেই সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। **সেগুলোর সবই সব সময় তার কাজে আসে না** মানে হচ্ছে যেই পুরুষের দ্বারা গচ্ছিত রাখা হয় সেসব সম্পত্তি যে তার সব সময় কাজে আসে, বা তার কল্যাণ সাধন করে, অথবা পূর্বোক্ত কৃত্যগুলো সম্পন্ন করে দিতে সমর্থ হয় তা কিন্তু নয় বলা হয়েছে। তথাপি কখনো কখনো তার কাজে আসে, আবার কখনো কখনো কাজে আসে না।

## চতুর্থ ও পঞ্চম গাথার বর্ণনা

এভাবে “সেগুলোর সবই সব সময় তার কাজে আসে না” বলার পর, এখন যেসব কারণে তার কাজে আসে না সেগুলো দেখিয়ে দিতেই বললেন:

৪. “কারণ সম্পত্তি স্থানচ্যুত হতে পারে,

অথবা চিহ্নিত স্থানটি ভুলে যেতে পারে,

অথবা নাগগণ সরিয়ে নিতে পারে,

অথবা যক্ষরাও হরণ করতে পারে।”

৫. “অথবা অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরাও

অজ্ঞাতে তুলে নিয়ে যেতে পারে।”

তার অর্থ হচ্ছে এই: যেই স্থানে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা হয় সেই **সম্পত্তি** সেই **স্থান** হতে চ্যুত হতে পারে, সরে যেতে পারে, দূরে চলে যেতে পারে, সেই সম্পত্তি অচেতন জড়বস্তু হলেও পুণ্যক্ষয়ের বশে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। **অথবা চিহ্নিত স্থানটি ভুলে যেতে পারে**, অর্থাৎ যেই স্থানে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেই স্থানটির কথা সে ভুলে যেতে পারে। তার পুণ্যক্ষয়জনিত কারণে **অথবা নাগগণ** সেই সম্পত্তি **সরিয়ে নিতে পারে** অর্থাৎ অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে। **অথবা যক্ষরাও হরণ করতে পারে** মানে হচ্ছে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারে। অথবা তার **অজ্ঞাতে অপ্রিয় উত্তরাধিকারীরাও** মাটি খুঁড়ে সেই সম্পত্তি **তুলে নিয়ে যেতে পারে**। এভাবে এই সমস্ত স্থান হতে চ্যুত হওয়া ইত্যাদি কারণে তার সেই সম্পত্তি তার কোনো কাজে আসে না।

এভাবে স্থানচ্যুত হওয়া ইত্যাদি লোকসমাজে প্রচলিত সম্পত্তি কাজে না আসার কারণগুলো বলার পর, এখন এই কারণগুলোর মূল হিসেবে একমাত্র কারণ—পুণ্যক্ষয় হওয়া, সেটি তুলে ধরতেই বললেন:

“আর যখন পুণ্যক্ষয় হয়

তখন তো সবই বিনষ্ট হয়ে যায়।”

তার অর্থ হচ্ছে এই: যেই সময়ে ভোগসম্পত্তি-প্রদায়ক পুণ্য ক্ষয় হয়, ভোগসম্পত্তির ধ্বংসকারক অপুণ্য সুযোগ পেয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন হীরা, সোনা ইত্যাদি যেই সমস্ত ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখা হয়েছে সবই বিনষ্ট হয়ে যায়।

## ষষ্ঠ গাথার বর্ণনা

এভাবে ভগবান বিভিন্ন উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নিয়ে গচ্ছিত রাখলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে কোনো কাজে আসে না এমন এবং নানা প্রকারে বিনাশশীল, লোকসমাজে প্রচলিত সম্পত্তির কথা বলার পর, এখন যেই পুণ্যসম্পদকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পত্তি বলা হয় তা তুলে ধরে সেই জমিদারকে উপদেশ দেওয়ার লক্ষ্যে এই নিধিকণ্ড সূত্রটি বলতে শুরু করেছেন, সেটি তুলে ধরতেই বললেন:

৬. “দানের দ্বারা, শীলের দ্বারা, সংযমের দ্বারা ও দমনের দ্বারা

যেই স্ত্রী বা পুরুষের সম্পত্তি সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়।”

এখানে **দান**-কে (মঙ্গল সূত্রের) “দান দেওয়া, ধর্মচর্চা করা”-এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে। **শীল** মানে হচ্ছে কায়িক ও বাচনিক অব্যতিক্রম (অর্থাৎ অলঙ্ঘন)। পঞ্চাঙ্গ শীল, দশাঙ্গ শীল, পাতিমোক্খ-সংবর শীল ইত্যাদি, অথবা সকল প্রকার শীলই এখানে শীল হিসেবে অভিপ্রেত। **সংযম** মানে হচ্ছে সংযতকরণ, সংযম, অর্থাৎ মনে মনে নানা আলম্বন বা বিষয়ে ঘুরে বেড়ানোকে দূরীকরণের কথাই বলা হয়েছে, এটি সমাধিরই নামান্তর। যেই সংযম সমন্বিত হলে একজন ব্যক্তি “হাতে সংযত, পায়ে সংযত, বাক্যে সংযত, উত্তম সংযত” হয়, এখানে উত্তম সংযত ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে। অন্যরা বলেন যে, “সংযতকরণ, সংযম, সংবরণের কথাই বলা হয়েছে, এটি ইন্দ্রিয়-সংযমেরই নামান্তর।” **দমন** মানে কলুষতাগুলোকে উপশান্তকরণ বলা হয়েছে, এটি প্রজ্ঞারই নামান্তর। কোথাও কোথাও প্রজ্ঞাকে সরাসরি প্রজ্ঞাই বলা হয়, যেমন: “যে ব্যক্তি মনোযোগ দিয়ে ধর্মকথা শ্রবণেচ্ছু, সে-ই প্রজ্ঞা লাভ করে” এভাবে ইত্যাদিতে (সং.নি.১.২৪৬; সু.নি.১৮৮)। কোথাও কোথাও আবার ধর্ম বলা হয়, যেমন: “সত্য, ধর্ম, দৃঢ়তা, ত্যাগ” এভাবে ইত্যাদিতে। কোথাও কোথাও আবার দমন বলা হয়, যেমন: “সত্য, দমন, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো গুণ জগতে বিদ্যমান আছে কি না” ইত্যাদিতে।

এভাবে দান ইত্যাদিকে জানার পর, এখন এভাবে এই গাথার সঙ্গে সংমিশ্রিত করে এর অর্থকে বুঝতে হবে: যেই স্ত্রী বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দমন, এই চারটি বিষয়ের দ্বারা, যেভাবে হীরা, সোনা, মণি, মুক্তা অথবা অন্যান্য ধনসম্পত্তিকে একত্র করে সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়, ঠিক সেভাবে পুণ্যময় সম্পত্তিও তাদের দান ইত্যাদির এক চিত্তপ্রবাহে বা চৈত্য ইত্যাদি বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে রাখলে তবেই সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়।

## সপ্তম গাথার বর্ণনা

এভাবে ভগবান “দানের দ্বারা, শীলের দ্বারা” এই গাথায় বর্ণিত পুণ্যসম্পদের দ্বারা পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পত্তির অবস্থা তুলে ধরার পর, এখন যেখানে গচ্ছিত রাখলে সেই সম্পত্তি সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়, সেই বিষয়টি তুলে ধরতেই বললেন:

৭. “চৈত্যে বা সংঘে, ব্যক্তির মাঝে বা অতিথিদের মাঝে,

মাতা ও পিতার মাঝে, কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মাঝে।”

এখানে চয়ন করা উচিত বলে **চৈত্য**, অর্থাৎ পূজা করা উচিত বলা হয়েছে, অথবা চয়ন করা হয়েছে বিধায় চৈত্য। সেই চৈত্য তিন প্রকার; যথা: পারিভোগিক চৈত্য, উদ্দেশিক চৈত্য ও ধাতুচৈত্য। এখানে বোধিবৃক্ষ হচ্ছে পারিভোগিক চৈত্য, বুদ্ধমূর্তিগুলো হচ্ছে উদ্দেশিক চৈত্য, আর মাঝখানে ধাতু স্থাপন করে তৈরি করা সধাতুক স্তূপগুলো হচ্ছে ধাতুচৈত্য। **সংঘ** মানে হচ্ছে বুদ্ধপ্রমুখ ইত্যাদি যেকোনো সংঘ। **ব্যক্তি** মানে হচ্ছে গৃহী-প্রব্রজিতদের মধ্যে যেকোনো ব্যক্তি। কোনো তিথি নেই, অথবা যেকোনো দিনেই আসতে পারে বলে **অতিথি**। এটি সেই মুহূর্তে আগত আপ্যায়নযোগ্য ব্যক্তিরই নামান্তর। বাকিগুলো পূর্ববৎ।

এভাবে চৈত্য ইত্যাদিকে জানার পর, এখন এভাবে এই গাথার সঙ্গে সংমিশ্রিত করে এর অর্থকে বুঝতে হবে: “সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়” বলে যে-সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে, সেই সম্পত্তি এই সমস্ত বিষয়গুলোতেই সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা হয়। কেন? দীর্ঘকাল ধরে কাঙ্ক্ষিত সুফল দিতে পারার সক্ষমতার কারণে। যারা চৈত্যে সামান্য কিছুও দান দেয় তারা দীর্ঘকাল ধরে সেটির কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করে থাকে। যেমন বলা হয়েছে:

“একটি মাত্র ফুল দান দিয়ে আমি আশি কোটি কল্প

দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিনি, ফুলদানের এমনই সুফল।”

“স্বল্পসুখ পরিত্যাগ করার ফলে যদি

বিপুল সুখ লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়।” (ধ.প.২৯০)

এভাবে দক্ষিণাবিশুদ্ধি সূত্র, বেলাম সূত্র ইত্যাদিতে বর্ণিত নিয়মে সংঘ ইত্যাদি বিষয় অনুসারেও দানফলের শ্রেণিবিভাগ বুঝতে হবে। চৈত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যে দান দেওয়া ও তার ফলবিভূতিকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক সেভাবে যথাযোগ্যভাবে সর্বত্র সেই সেই বিষয়কে উপলক্ষ করে চারিত্র ও বারিত্রবশে শীল পালন করা ও তার ফলবিভূতিকে, বুদ্ধানুস্মৃতির বশে সংযম আচরণ করা ও তার ফলবিভূতিকে, এবং তদ্বিষয়ক বিদর্শন, মনোযোগ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দমনের চর্চা ও তার ফলবিভূতিকে বুঝতে হবে।

## অষ্টম গাথার বর্ণনা

এভাবে ভগবান দান ইত্যাদি গচ্ছিত রাখা যায় এমন পুণ্যময় সম্পত্তির চৈত্য ইত্যাদি ভেদে বিষয়গুলো তুলে ধরার পর, এখন এই সমস্ত বিষয়গুলোতে সুন্দরভাবে গচ্ছিত রাখা সেই সম্পত্তি যে গভীরে, জলের তলদেশে গচ্ছিত রাখা সম্পত্তি হতে কতটা পৃথক সেটি দেখিয়ে দিতেই বললেন:

৮. “এই সম্পত্তি সুগচ্ছিত, অজেয় ও অনুগামী।

সব ছেড়ে গমনীয়গুলোর মধ্যে এটি নিয়েই গমন করে।”

এখানে প্রথম পদটির দ্বারা দান ইত্যাদি সুগচ্ছিত সম্পত্তিকেই নির্দেশ করা হয়েছে “**এই সম্পত্তি সুগচ্ছিত**” বলে। **অজেয়** মানে হচ্ছে যা অন্যদের দ্বারা জয় করে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, অর্চনীয় হচ্ছে এর ভিন্ন পাঠ, অর্থাৎ এটিকে অর্চনা করা উচিত, এটি অর্চনার যোগ্য, হিত-সুখার্থী ব্যক্তির দ্বারা এটি সঞ্চয় করা উচিত অর্থে। এই পাঠে “এই সম্পত্তিই অর্চনীয়” কথাটি জুড়ে দিয়ে, পুনরায় “কেন” বলে এর চর্চার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে “যেহেতু এই সম্পত্তি সুগচ্ছিত ও অনুগামী” এই কথাটি জুড়ে দেওয়া উচিত। অনুগমন বা অনুসরণ করে বলে **অনুগামী**, অর্থাৎ পরলোকে যাওয়ার সময় বিভিন্ন স্থানে ফল প্রদানের মাধ্যমে ছেড়ে চলে যায় না অর্থে।

**সব ছেড়ে গমনীয়গুলোর মধ্যে এটি নিয়েই গমন করে** মানে হচ্ছে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তখন সব ছেড়ে সব ধরনের গমনীয় ভোগসম্পত্তিগুলোর মধ্যে এই সম্পত্তি নিয়েই পরলোকে গমন করে, এটিই নাকি এর অর্থ। সেটি ঠিক নয়। কেন? কারণ ভোগসম্পত্তি তো আর পরলোকে গমন করে না। সব ধরনের ভোগসম্পত্তিই পরিত্যাজ্য, গমনযোগ্য নয়। গমনীয় হচ্ছে সেই সেই গতিবিশেষ। যদি তা-ই হতো তা হলে ভোগসম্পত্তি ত্যাগ করে গমনীয় গতিবিশেষগুলোর মধ্যে, এভাবে বলা হতো। তাই এখানে এর অর্থকে বুঝতে হবে এভাবে: “সম্পত্তি স্থানচ্যুত হতে পারে” এভাবে ইত্যাদি প্রকারে ত্যাগ করে মানুষ গমনশীল ভোগসম্পত্তিগুলোর মধ্যে এটিকে নিয়েই গমন করে। এই সম্পত্তি অনুগামী হওয়ায় কখনো তাকে ছেড়ে চলে যায় না।

এখানে “গমনীয়গুলোর মধ্যে” বলতে “গন্তব্যগুলোর মধ্যে” বোঝায়, গমনশীলগুলোর মধ্যে নয়। এটিকে নিশ্চিত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেমন, “আর্য, মুক্তির দিকে পরিচালনাকারী” (দী.নি.২.১৪১) এখানে নিয়ে যায় অর্থে, নিয়ে যাওয়া উচিত অর্থে নয়, তেমনি এখানেও “গমনশীলগুলোর মধ্যে” অর্থে বুঝতে হবে, “গন্তব্যগুলোর মধ্যে” নয়।

অথবা, যেহেতু এই ব্যক্তি মরণের সময় কাউকে দিতে ইচ্ছুক হয়ে ভোগসম্পত্তিকে ছুঁতেও পারে না, তাই তাকে সেই ভোগসম্পত্তিগুলো আগে দৈহিকভাবে পরিত্যাগ করতে হয়, পরে আশাহত মন নিয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ অতিক্রম করতে হয় বলা হয়েছে। তাই আগে কায়িকভাবে ত্যাগ করে, পরে মনে মনে ত্যাগ করে গমনীয় ভোগসম্পত্তিগুলোর মধ্যে, এখানে এর অর্থকে এভাবেই দেখা উচিত। প্রথম অর্থে এটি নির্ধারণে সম্বন্ধপদ, সব ছেড়ে গমনীয় ভোগসম্পত্তিগুলোর মধ্যে একমাত্র এই পুণ্যসম্পত্তি নামক বৈভবকে সেখান থেকে টেনে বের করে নিয়ে গমন করে। পরের অর্থে এটি ভাবের দ্বারা অভাব-লক্ষণ প্রকাশে সম্বন্ধপদ, অর্থাৎ ভোগসম্পত্তিগুলোর গমনীয় ভাবের দ্বারা এই সম্পত্তিকে নিয়ে গমনীয় ভাবের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

## নবম গাথার বর্ণনা

এভাবে ভগবান গভীরে, জলের তলদেশে গচ্ছিত রাখা সম্পত্তি হতে এই পুণ্যসম্পত্তির বিশেষত্ব তুলে ধরার পর, পুনরায় নিজের দ্রব্যসামগ্রীর গুণ বর্ণনার মাধ্যমে লোকজনের মনে উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়া বিশাল বড়ো ব্যবসায়ীর মতো নিজের দেশিত পুণ্যসম্পত্তির গুণ বর্ণনার মাধ্যমে সেই পুণ্যসম্পত্তিতে দেবতা ও মানুষদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বললেন:

৯. “এই সম্পত্তি অন্য সবকিছু হতে অসাধারণ,

এবং চোরেরা হরণ করতে পারে না।

ধীর ব্যক্তি পুণ্য করেন, যা অনুগামী সম্পত্তি।”

এখানে **অন্য সবকিছু হতে অসাধারণ** মানে হচ্ছে অন্য সবকিছু হতে অসামান্য। চোরেরা চুরি করতে পারে না বিধায় **চোরেরা হরণ করতে পারে না**, চোরদের দ্বারা চুরির যোগ্য নয় অর্থে। গচ্ছিত রাখা উচিত অর্থে **সম্পত্তি**। এভাবে দুটি শব্দের দ্বারা পুণ্যসম্পত্তির গুণ বর্ণনা করে, এরপর তাতে উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বললেন, “**ধীর ব্যক্তি পুণ্য করেন, যা অনুগামী সম্পত্তি।**” তার অর্থ হচ্ছে: যেহেতু পুণ্য হচ্ছে অন্য সবকিছু হতে অসাধারণ এবং চোরেরা হরণ করতে পারে না এমন সম্পত্তি। পুণ্য শুধু যে অসাধারণ ও চোরেরা হরণ করতে পারে না এমন সম্পত্তি তা নয়, অধিকন্তু যা অনুগামী সম্পত্তি সে-ব্যাপারে “এই সম্পত্তি সুগচ্ছিত, অজেয় ও অনুগামী” বলা হয়েছে। যেহেতু সেটিই হচ্ছে পুণ্য, তাই ধীর, বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি পুণ্য করেন।

## দশম গাথার বর্ণনা

এভাবে ভগবান গুণ বর্ণনার মাধ্যমে পুণ্যসম্পত্তির প্রতি দেবতা ও মানুষদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে দেওয়ার পর, এখন যাঁরা উৎসাহিত হয়ে কাজের মাধ্যমে পুণ্যসম্পত্তি সম্পাদন করেন, সেই পুণ্যসম্পত্তি তাঁদের যা সুফল প্রদান করে তা সংক্ষেপে তুলে ধরতেই বললেন:

১০. “এই সম্পত্তি দেবমনুষ্যদের সকল মনস্কাম পূরণ করে দেয়,

তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।”

এখন যেহেতু এই সম্পত্তি যে প্রার্থনা করে তার সকল মনস্কাম পূরণ করে দেয়, বিনা প্রার্থনায় নয়। যেমন বলা হয়েছে:

“হে গৃহপতিগণ, একজন ধর্মচারী ও সমচারী ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করেন যে, ‘অহো, আমি যদি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর মহাধনী ক্ষত্রিয়দের মতো হয়ে জন্মাতে পারতাম!’ তখন এটি একান্তই সম্ভব যে, তিনি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর মহাধনী ক্ষত্রিয়দের মতো হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। এর কারণ কী? কারণ তিনি ধর্মচারী ও সমচারী।” (ম.নি.১.৪৪২)

এভাবে “তখন এটি একান্তই সম্ভব যে, তিনি আসবগুলোর ক্ষয়ে অনাসব, চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিকে নিজ উচ্চতর জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ করে, লাভ করে বাস করতে পারবেন। এর কারণ কী? কারণ তিনি ধর্মচারী ও সমচারী।” (ম.নি.১.৪৪২)

একইভাবে আরো বলা হয়েছে:

“এখানে, হে ভিক্ষুগণ, একজন ভিক্ষু শ্রদ্ধা সমন্বিত হন, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। তিনি মনে মনে ভাবেন যে, ‘অহো, আমি যদি দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর পর মহাধনী ক্ষত্রিয়দের মতো হয়ে জন্মাতে পারতাম!’ তিনি তাতে চিত্তকে স্থাপন করেন, প্রতিষ্ঠিত করেন এবং গড়ে তোলেন। তাঁর সেই বিষয়গুলো ও অবস্থান এভাবে সুদৃঢ় হলে, বহুলভাবে চর্চিত হলে সেখানে জন্মগ্রহণের দিকে নিয়ে যায়।” (ম.নি.৩.১৬১) এভাবে ইত্যাদি।

তাই সেই ধরনের আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ের মধ্যে চিত্তকে স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, গড়ে তোলাসহ প্রার্থনাই যে তার সকল মনস্কাম পূরণের হেতু হয় সেটি দেখিয়ে দিতেই বললেন:

“তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।”

## একাদশ গাথার বর্ণনা

১১. এখন এর দ্বারা যেসব বিষয় লাভ হয় সেগুলোর সীমা নির্দেশ করতেই “**সুন্দর ত্বক, সুন্দর কণ্ঠস্বর**” এভাবে ইত্যাদি গাথাগুলো বললেন।

এখানে প্রথম গাথায় **সুন্দর ত্বক** মানে হচ্ছে ত্বকের সুন্দর রং, ত্বকের রং সোনার মতো হওয়া, তাও এই পুণ্যসম্পত্তির দ্বারা লাভ হয়। যেমন বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে... পূর্বে মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে সব সময় অক্রোধী ও শান্তচিত্ত ছিলেন, সমানে বহুকথা বলা হলেও তিনি তাতে জড়াতেন না, রেগে যেতেন না, ক্রুদ্ধ হতেন না, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হতেন না, তিনি কখনো ক্ষোভ, বিদ্বেষ কিংবা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না, তিনি সূক্ষ্ম, কোমল বিছানার চাদর, আলখাল্লা, সূক্ষ্ম রেশমি কাপড়, সুতি কাপড়,... সিল্কের কাপড়,... সূক্ষ্ম গালিচা দান করতেন। তিনি সেই কর্ম সম্পাদন করায়, সঞ্চয় করায়... এই জন্মে আগমন করে এই মহাপুরুষলক্ষণ লাভ করেন। তিনি সোনারঙা হন এবং তাঁর ত্বকের রং সোনার মতো হয়।” (দী.নি.৩.২১৮)

**সুন্দর কণ্ঠস্বর** মানে হচ্ছে ব্রহ্মস্বর, কোকিলকণ্ঠ, তাও এর দ্বারা লাভ হয়। যেমন বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে... কর্কশ বাক্য পরিহার করে কর্কশ বাক্য হতে বিরত ছিলেন, তিনি যেসব বাক্য নির্দোষ কর্ণসুখকর... সেই ধরনের বাক্য ভাষণ করতেন। তিনি সেই কর্ম সম্পাদন করায়, সঞ্চয় করায়... এই জন্মে আগমন করে এই দুটি মহাপুরুষলক্ষণ লাভ করেন। তিনি লম্ব-চওড়া জিহ্বার অধিকারী হন এবং ব্রহ্মস্বরবিশিষ্ট ও কোকিলকণ্ঠী হন।” (দী.নি.৩.২৩৬)

**সুন্দর দৈহিক গঠন** মানে হচ্ছে সুন্দর দৈহিক গড়ন, অর্থাৎ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেখানে যেটি সমান, মাংসল বা গোলাকার হওয়ার কথা সেটির গঠন তেমনটিই হয় বলা হয়েছে। তাও এর দ্বারা লাভ হয়। যেমন বলা হয়েছে:

“হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্বজন্মে... পূর্বে মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে সব সময় বহুজনের কল্যাণকামী, হিতকামী, সুখকামী ও যোগক্ষেমকামী ছিলেন। তিনি সব সময় ভাবতেন, ‘কীভাবে তারা শ্রদ্ধায় বর্ধিত হবে, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, ধন ও শস্য, ক্ষেত্র-জায়গাজমি, দ্বিপদী ও চতুষ্পদী জন্তু, স্ত্রীপুত্র, দাস-কর্মচারী, জ্ঞাতি, মিত্র, বন্ধুবান্ধবের দিক দিয়ে বর্ধিত হবে।’ তিনি সেই কর্ম... এই তিনটি মহাপুরুষলক্ষণ লাভ করেন। তিনি সিংহের মতো দেহের অধিকারী হন, উন্নত বক্ষের অধিকারী হন এবং গোলাকার কাঁধবিশিষ্ট হন।” (দী.নি.৩.২২৪) এভাবে ইত্যাদি।

এই প্রকারে এরপরের সুফলগুলোও যেই যেই পুণ্যসম্পত্তির দ্বারা লাভ হয় সূত্রের সেসব উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থান হতে তুলে এনে এখানে বলতে হবে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এখানে আমি সংক্ষেপে বললাম। এখন আমি বাকি শব্দগুলোর বর্ণনা করব।

**সুরূপতা** মানে এখানে গোটা শরীরকেই রূপ হিসেবে বুঝতে হবে “পরিবেষ্টিত আকাশ বা শূন্যতাই রূপ বা পদার্থ হিসেবে গণ্য হয়” ইত্যাদির মতো, অর্থাৎ সেই রূপ বা শরীর সুন্দর হওয়া, সুদর্শন হওয়া, অতি লম্বা না হওয়া, অতি খাটো না হওয়া, অতি শীর্ণ না হওয়া, অতি মোটা না হওয়া, অতি কালো না হওয়া ও অতি ফরসা না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। **আধিপত্য** মানে হচ্ছে অধিপতির ভাব, মহাধনী ক্ষত্রিয় ইত্যাদি অবস্থার দ্বারা কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব অর্থে। **পরিবার** মানে হচ্ছে গৃহীদের স্বজন-পরিজন-সম্পত্তি, আর গৃহত্যাগীদের পরিষদ-সম্পত্তি, আধিপত্য ও পরিবার দুটি মিলে **আধিপত্য ও পরিবার**। এখানে সুন্দর ত্বক ইত্যাদির দ্বারা শরীরসম্পত্তি, আধিপত্যের দ্বারা ভোগসম্পত্তি, আর পরিবারের দ্বারা স্বজন-পরিজন-সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। **সবই এর দ্বারা লাভ হয়** মানে এই যে “তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়” কথাটি বলা হয়েছে, এখানে এটিই হচ্ছে প্রথম সীমা, অর্থাৎ সুন্দর ত্বক ইত্যাদি সবই এর দ্বারা লাভ হয় বুঝতে হবে বলে তুলে ধরা হয়েছে।

## দ্বাদশ গাথার বর্ণনা

১২. এভাবে এই গাথায় পুণ্যপ্রভাবে লভ্য রাজসম্পত্তি হতে নিম্নস্তরের দেবমনুষ্যসম্পত্তি তুলে ধরার পর, এখন উভয় রাজত্ব-সম্পত্তির কথা তুলে ধরতেই “**প্রাদেশিক রাজত্ব**” এই গাথাটি বললেন।

এখানে **প্রাদেশিক রাজত্ব** মানে হচ্ছে একটি দ্বীপের পুরোটা না পেয়ে পৃথিবীর একেকটি প্রদেশের রাজত্ব। প্রভুর ভাব হচ্ছে **প্রভুত্ব**, এর দ্বারা দ্বীপচক্রবর্তীর রাজপদকে নির্দেশ করা হয়েছে। **প্রিয় চক্রবর্তীসুখ** মানে হচ্ছে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ চক্রবর্তীসুখ। এর দ্বারা সারা পৃথিবীর অধীশ্বর চক্রবর্তী রাজত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে রাজত্ব হচ্ছে **দেবরাজত্ব**, এর দ্বারা মান্ধাতা ইত্যাদি মানুষদের দেবরাজত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। **এমনকি দিব্য সত্ত্বদের** মানে এর দ্বারা যারা দিব্যভবের অন্তর্গত তাদের “দিব্য” বলা হয়, সেই দিব্যকায়ে উৎপন্ন সত্ত্বদের দেবরাজত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। **সবই এর দ্বারা লাভ হয়** মানে এই যে “তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়” কথাটি বলা হয়েছে, এখানে এটিই হচ্ছে দ্বিতীয় সীমা, অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজত্ব ইত্যাদি সবই এর দ্বারা লাভ হয় বুঝতে হবে বলে তুলে ধরা হয়েছে।

## ত্রয়োদশ গাথার বর্ণনা

১৩. এভাবে এই গাথায় পুণ্যপ্রভাবে লভ্য দেবমনুষ্যসম্পত্তি এবং উভয়ের রাজত্ব-সম্পত্তি তুলে ধরার পর, এখন দুটি গাথায় বর্ণিত সম্পত্তিকে একসঙ্গে করে, মুখ্যত নির্বাণসম্পত্তির কথা তুলে ধরতেই “**মনুষ্যসম্পত্তি**” এই গাথাটি বললেন।

এর শব্দগুলোর বর্ণনা হচ্ছে এই: মানুষদের সম্পত্তি অর্থে **মনুষ্যসম্পত্তি**। সমৃদ্ধি এনে দেয় বলে **সম্পত্তি**। দেবতাদের জগৎ অর্থে দেবলোক। সেই **দেবলোকে**। **যা** বলে মূলত সবকিছুকেই গ্রহণ করা হয়েছে, এটি ভেতরে উৎপন্ন হলে, অথবা বাইরের উপকরণভুক্ত হলে সত্ত্বগণ আনন্দিত হয় বলে **আনন্দ**,এটি সুখ ও সুখের বিষয়বস্তুরই নামান্তর। এখানে **যা** হচ্ছে অনির্দিষ্ট শব্দ। নির্বাণই হচ্ছে **নির্বাণসম্পত্তি**।

কিন্তু এর অর্থবর্ণনা হচ্ছে: এই যে “সুন্দর ত্বক” ইত্যাদি শব্দের দ্বারা মনুষ্যসম্পত্তি এবং দেবলোকে যা আনন্দ বলা হয়েছে, সেসব, এবং এই যে শ্রদ্ধানুসারী ভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য নির্বাণসম্পত্তি সেটি, এটিই হচ্ছে তৃতীয় সীমা, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

অথবা, সুন্দর ত্বক ইত্যাদির দ্বারা পূর্বে যা বলা হয়নি, “বীর, স্মৃতিমান ও এখানে ব্রহ্মচর্য পালন” এভাবে ইত্যাদি (অ.নি.৯.২১) প্রকারে উল্লেখিত প্রজ্ঞার দক্ষতা ইত্যাদি ভেদে মনুষ্যসম্পত্তি, যা দেবলোকে ধ্যান ইত্যাদির আনন্দ, এবং পূর্বোক্ত প্রকার নির্বাণসম্পত্তি, এটিই হচ্ছে তৃতীয় সীমা, সবই এর দ্বারা লাভ হয়। এভাবেই এখানে এর অর্থবর্ণনা বুঝতে হবে।

## চতুর্দশ গাথার বর্ণনা

১৪. এভাবে এই গাথায় পুণ্যপ্রভাবে লভ্য শ্রদ্ধানুসারী ভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য নির্বাণসম্পত্তিকে তুলে ধরার পর, এখন ত্রিবিদ্যা, উভয়ভাগ-বিমুক্ত অবস্থার ভিত্তিতে যা প্রাপ্তব্য তা এবং তার উপায়কে তুলে ধরতেই “**যে মিত্রসম্পদকে ভিত্তি করে**” এই গাথাটি বললেন।

এর **শব্দগুলোর বর্ণনা** হচ্ছে: এর দ্বারা গুণবিভূতি অর্জিত হয়, লাভ হয় বলে সম্পদ, মিত্রই হচ্ছে সম্পদ বিধায় মিত্রসম্পদ, সেই **মিত্রসম্পদকে**। **ভিত্তি করে** মানে হচ্ছে আশ্রয় করে। **সঠিকভাবে** মানে হচ্ছে যথার্থ উপায়ে। **আত্মনিয়োগ করে** মানে হচ্ছে যোগানুষ্ঠান করে। এর দ্বারা জানে, অবগত হয় বলে বিদ্যা, এর দ্বারা বিমুক্ত হয় বা স্বয়ং বিমুক্ত হয় অর্থে বিমুক্তি, বিদ্যা ও বিমুক্তি দুটি মিলে বিদ্যাবিমুক্তি, বিদ্যাবিমুক্তির বিষয়ে দক্ষতাই হচ্ছে **বিদ্যাবিমুক্তিতে দক্ষতা**।

কিন্তু এর **অর্থবর্ণনা** হচ্ছে: এই যে মিত্রসম্পদকে ভিত্তি করে, অর্থাৎ শাস্তা অথবা কোনো এক গুরুস্থানীয় সতীর্থ ব্রহ্মচারীকে ভিত্তি করে, তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও অনুশাসন গ্রহণ করে, তাঁর অনুশাসন অনুযায়ী চর্চার মাধ্যমে সঠিকভাবে আত্মনিয়োগ করলে পূর্বজন্ম স্মরণ ইত্যাদি তিন প্রকার বিদ্যার মধ্যে “এখানে বিমুক্তি কী রকম? চিত্তের অধিমুক্তি ও নির্বাণ” (ধ.স.১৩৮১) এভাবে উল্লেখিত অষ্ট সমাপত্তি ও নির্বাণ-ভেদে বিমুক্তিতে যথাবিধি অনায়াসলব্ধ দক্ষতা, এটিই হচ্ছে চতুর্থ সীমা, সবই এর দ্বারা লাভ হয়।

## পঞ্চদশ গাথার বর্ণনা

১৫. এভাবে এই গাথায় পূর্বোক্ত বিদ্যাবিমুক্তিতে দক্ষতাজনিত পুণ্যপ্রভাবে লভ্য এবং ত্রিবিদ্যা ও উভয়ভাগ-বিমুক্ত অবস্থার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য নির্বাণসম্পত্তিকে তুলে ধরার পর, এখন যেহেতু বিদ্যাবিমুক্তিতে দক্ষ ত্রিবিদ্যালাভী ও উভয়ভাগ-বিমুক্ত সবাই প্রতিসম্ভিদা ইত্যাদি গুণবিভূতি লাভ করে থাকেন, এই পুণ্যসম্পদ ও তার গুণবিভূতির কাছাকাছি কারণের ভিত্তিতে সেগুলোও লাভ হয়, তাই সেগুলোকে তুলে ধরতেই “**প্রতিসম্ভিদা, বিমোক্ষ**” এই গাথাটি বললেন।

“যখন সঠিকভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে যা ধর্ম-নিরুক্তি-প্রতিভান বিভিন্ন ধরনের প্রজ্ঞা তা-ই প্রতিসম্ভিদা” বলা হয়, এবং এই যে “রূপধারী রূপগুলোকে দেখে” ইত্যাদি (দী.নি.২.১২৯; ৩.৩৩৯) প্রকারে বর্ণিত অষ্ট বিমোক্ষ, যা ভগবানের শিষ্যদের দ্বারা প্রাপ্তব্য শ্রাবকসম্পত্তির সিদ্ধিদাত্রী শ্রাবকপারমী, যা স্বয়ম্ভূভাবের সিদ্ধিদাত্রী পচ্চেকবোধি এবং যা সর্বসত্ত্বদের উত্তমভাবের সিদ্ধিদাত্রী বুদ্ধভূমি, এটিই হচ্ছে পঞ্চম সীমা, সবই এর দ্বারা লাভ হয় বলে বুঝতে হবে।

## ষোড়শ গাথার বর্ণনা

১৬. এভাবে ভগবান “তারা যা-ই প্রার্থনা করে, সবই এর দ্বারা লাভ হয়” বলে যা বলা হয়েছে, সেটিকে এই পাঁচটি গাথার মাধ্যমে বিভিন্ন সীমায় ভাগ করে তুলে ধরার পর, এখন সকল মনস্কাম পূরণকারী সম্পত্তি নামক এই পুণ্যসম্পদকে প্রশংসা করতেই “**এই পুণ্যসম্পত্তি এমনই মহাকল্যাণপ্রদ**” এই গাথাটি বলে দেশনা শেষ করলেন।

এর **শব্দগুলোর বর্ণনা** হচ্ছে: **এমনই** শব্দটি হচ্ছে অতীতের অর্থগুলোর নিদর্শন। মহান কল্যাণ এনে দেয় অর্থে **মহাকল্যাণপ্রদ**, অর্থাৎ মহান কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় বলা হয়েছে, এটিকে অমিত শক্তিশালীও বলা হয়। **এই** হচ্ছে নির্দেশমূলক শব্দ, এর দ্বারা “দানের দ্বারা, শীলের দ্বারা” হতে শুরু করে একদম “ধীর ব্যক্তি পুণ্য করেন, যা অনুগামী সম্পত্তি” হিসেবে বর্ণিত পুণ্যসম্পদকে নির্দেশ করা হয়েছে। পুণ্যই হচ্ছে সম্পদ বিধায় **পুণ্যসম্পদ**। **তাই** হচ্ছে সাপেক্ষাত্মক শব্দ। **ধীর** মানে হচ্ছে ধৃতিমান বা ধৈর্যশীল। **প্রশংসা করেন** মানে হচ্ছে গুণকীর্তন করেন। **পণ্ডিতরা** মানে হচ্ছে প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিরা। **পুণ্যকর্ম করাকে** মানে হচ্ছে পুণ্যকর্ম করার অবস্থাকে।

কিন্তু এর **অর্থবর্ণনা** হচ্ছে: এভাবে ভগবান সুন্দর ত্বক ইত্যাদি হতে শুরু করে একদম শেষে বুদ্ধভূমি যা পুণ্যসম্পদের প্রভাবে অধিগম্য বিষয় বলে প্রশংসা করার পর, এখন সেসব বিষয়কে একসঙ্গে সংমিশ্রিত করে তুলে ধরতে এবং সেই অর্থে পূর্বোক্ত পুণ্যসম্পদের মহাকল্যাণপ্রদভাব ঘোষণা করতেই বললেন, এমন মহান কল্যাণ বয়ে আনে বলে এটি মহাকল্যাণপ্রদ, যেহেতু আমি সেটিকে “দানের দ্বারা, শীলের দ্বারা” ইত্যাদি প্রকারে পুণ্যসম্পদ হিসেবে দেশনা করেছি, তাই আমার মতো ধীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এখানে সত্ত্বদের হিতকর ও সুখাবহ ধর্মদেশনার দ্বারা, অকলুষতার দ্বারা ও যথার্থ গুণের দ্বারা “এই সম্পত্তি অন্য সবকিছু হতে অসাধারণ এবং চোরেরা হরণ করতে পারে না” ইত্যাদি কথা বলার মাধ্যমে, এবং “হে ভিক্ষুগণ, তোমরা পুণ্যকে ভয় পেয়ো না। হে ভিক্ষুগণ, এই পুণ্য হচ্ছে সুখেরই নামান্তর” ইত্যাদি (অ.নি.৭.৬২; ইতিৰু.২২; নেত্তি.১২১) অকথিত কথার মাধ্যমে অনেক প্রকারে পুণ্য করাকে প্রশংসা করেন, পক্ষপাতমূলক কথার মাধ্যমে নয়।

দেশনা শেষে সেই উপাসক বহুলোকের সঙ্গে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের কাছে গিয়ে এই বিষয়টি জানাল, রাজাও অত্যন্ত খুশি হয়ে “সাধু, হে গৃহপতি, সাধু, হে গৃহপতি, আপনি আমার মতো লোকের সঙ্গেও সম্পত্তি গচ্ছিত রাখুন যা কোনোভাবেই হরণযোগ্য নয়” বলে মহান পূজা করলেন।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

নিধিকণ্ড সূত্রের বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# ৯. মৈত্রী সূত্রের বর্ণনা

## সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা

এখন নিধিকণ্ড সূত্রের পরপর উল্লেখিত মৈত্রী সূত্রের বর্ণনার পালা উপস্থিত হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা বলে তারপর—

“যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে

বলা হয়েছে, এই হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

উৎপত্তি বর্ণনা করে, আমি এর অর্থবর্ণনা করব।”

এখানে যেহেতু নিধিকণ্ড সূত্রের দ্বারা দান, শীল ইত্যাদি পুণ্যসম্পদের কথা বলা হয়েছে, সত্ত্বদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে সম্পাদন করলে তা মহাসুফল প্রদান করে, একেবারে বুদ্ধভূমি লাভ করতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত, তাই সেই পুণ্যসম্পদের উপকার তুলে ধরার লক্ষ্যে, অথবা যেহেতু ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বারা শাসনে প্রবেশ করে যারা শিক্ষাপদগুলোর দ্বারা শীলে প্রতিষ্ঠিত হয় তারা দেহের বত্রিশটি অংশের ভাবনার দ্বারা লোভকে পরিত্যাগ করতে সমর্থ, কুমার-প্রশ্নের দ্বারা মোহ পরিত্যাগে সমর্থ এমন কর্মস্থান তুলে ধরে, মঙ্গল সূত্রের দ্বারা এর চর্চায় মঙ্গলভাব ও আত্মরক্ষা, রত্ন সূত্রের দ্বারা তদনুরূপ অন্যদের রক্ষা, তিরোকুট্ট সূত্রের দ্বারা রত্ন সূত্রে বর্ণিত একশ্রেণির সত্ত্বদের দর্শন এবং উক্ত প্রকার পুণ্যসম্পত্তির দ্বারা প্রমত্ত ব্যক্তিদের বিপত্তি, নিধিকণ্ড সূত্রের দ্বারা তিরোকুট্ট সূত্রে বর্ণিত বিপত্তির প্রতিপক্ষভুক্ত সম্পত্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু বিদ্বেষ পরিত্যাগে সমর্থ এমন কর্মস্থানের কথা একেবারেই তুলে ধরা হয়নি, তাই সেই বিদ্বেষ পরিত্যাগে সমর্থ এমন কর্মস্থানের কথা তুলে ধরতেই এই মৈত্রী সূত্রটি এখানে আলোচিত হয়েছে। এভাবেই *খুদ্দকপাঠ* গ্রন্থটি সুপরিপূর্ণ হয়। এখানে এই হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ-কথা।

## উৎপত্তি বর্ণনা

এখন—

“যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে

বলা হয়েছে, এই হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

উৎপত্তি বর্ণনা করে, আমি এর অর্থবর্ণনা করব।”

বলে যেই সংক্ষিপ্ত বিবরণী উল্লেখিত হয়েছে, এখানে এই মৈত্রী সূত্রটি ভগবানের দ্বারাই বলা হয়েছে, কোনো শিষ্য ইত্যাদির দ্বারা নয়। তাও আবার যখন হিমালয়ের পাশে দেবতাদের দ্বারা উপদ্রুত ভিক্ষুরা ভগবানের কাছে এসেছিল, তখন শ্রাবস্তীতে সেই ভিক্ষুদের পরিত্রাণের জন্য এবং কর্মস্থানের জন্য বলা হয়েছে। এভাবেই এইসব পদগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও উৎপত্তি বর্ণনাকে বুঝতে হবে।

কিন্তু এর বিস্তারিত বুঝতে হবে এভাবে: একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করছিলেন, বর্ষাবাস শুরু হওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে। সেই সময় বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থানকারী বহু ভিক্ষু ভগবানের কাছ থেকে কর্মস্থান গ্রহণ করে বিভিন্ন জায়গায় বর্ষাবাস কাটানোর ইচ্ছায় ভগবানের কাছে উপস্থিত হতো। তখন ভগবান লোভস্বভাবের ভিক্ষুদের সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণবশে মোট এগারো প্রকার অশুভ-কর্মস্থান, বিদ্বেষস্বভাবের ভিক্ষুদের মৈত্রী ইত্যাদি চার প্রকার কর্মস্থান, মোহস্বভাবের ভিক্ষুদের মরণস্মৃতি কর্মস্থান ইত্যাদি, বিতর্কস্বভাবের ভিক্ষুদের আনাপানস্মৃতি, পৃথিবী-কৃৎস্ন ইত্যাদি, শ্রদ্ধাস্বভাবের ভিক্ষুদের বুদ্ধানুস্মৃতি কর্মস্থান ইত্যাদি, বুদ্ধিস্বভাবের ভিক্ষুদের চার ধাতু বিশ্লেষণ ইত্যাদি, এই পদ্ধতিতে মোট চুরাশি হাজার প্রকার স্বভাবের উপযোগী কর্মস্থান শিক্ষা দিতেন।

তারপর পাঁচশো ভিক্ষু ভগবানের কাছে কর্মস্থান শিক্ষা করে, ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত বাসস্থান ও ভিক্ষান্নের উপযোগী গ্রাম খুঁজতে খুঁজতে বহু দূরদেশে হিমালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত নীলকান্ত মণিতুল্য পাথরের পৃষ্ঠবিশিষ্ট, সুশীতল ঘন ছায়াসম্পন্ন বনানীমণ্ডিত, মুক্তো ও রুপো ছড়ানো বিস্তৃত কাপড়ের মতো বালুকাকীর্ণ সমতল জায়গাবিশিষ্ট, পরিষ্কার, মধুর ও শীতল জলাশয় পরিবেষ্টিত এক পর্বত দেখতে পেল। তারপর সেই ভিক্ষুরা সেখানে এক রাত বাস করে, রাত পেরিয়ে সকাল হলে শরীর-পরিচর্যার কাজ (মুখ-হাত ধোয়া ইত্যাদি) সেরে, কাছের একটি গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করল। গ্রামটি ঘনবসতিপূর্ণ। হাজার পরিবার সেখানে বাস করে। সেখানকার মানুষেরা বেশ শ্রদ্ধাশীল ও প্রসন্নমনা। সেই প্রত্যন্ত এলাকায় প্রব্রজিতদের দেখা পাওয়া দুর্লভ হওয়ায় তারা ভিক্ষুদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হয়ে সেই ভিক্ষুদের ভোজন করিয়ে “ভন্তে, এখানেই আপনারা তিন মাস বসবাস করুন” বলে প্রার্থনা করে, পাঁচশো কুটির বানিয়ে দিয়ে, সেখানে খাট, চেয়ার, পানীয় ও ব্যবহার্য জলের ঘট ইত্যাদি সব ধরনের উপকরণ প্রস্তুত করে দিল।

ভিক্ষুরা পরদিন অন্য গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য প্রবেশ করল। সেখানকার মানুষেরাও ঠিক সেভাবে সেবা-শুশ্রূষা করে বর্ষাবাস কাটানোর জন্য প্রার্থনা করল। ভিক্ষুরা “কোনো অন্তরায় নেই” ভেবে তাদের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে সেই গহীন বনে প্রবেশ করে, রাত-দিন সব সময় আরব্ধবীর্য হয়ে, অত্যন্ত সংযত হয়ে, বেশি বেশি যথাযথভাবে মনোযোগ দিয়ে অবস্থান করতে করতে বৃক্ষমূলে গিয়ে বসে পড়ল। শীলবান ভিক্ষুদের তেজের প্রভাবে তেজহীন হয়ে পড়া বৃক্ষদেবতারা নিজ নিজ বিমান হতে নেমে এসে শিশুদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেমন, রাজা কিংবা রাজার মহামন্ত্রী কোনো গ্রামবাসীর ঘরে গেলে, তখন আগে থেকেই সেই ঘরে অবস্থান করা অন্য মানুষেরা ঘর হতে বের হয়ে অন্যত্র অবস্থানকালে “কখন তাঁরা চলে যাবেন” এই ভেবে দূর থেকে তাকিয়ে থাকে, ঠিক তদ্রূপ দেবতারা নিজ নিজ বিমানগুলো ছেড়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দূর থেকে তাকাতে লাগল এই ভেবে যে, “কখন ভদন্তরা চলে যাবেন।” তারপর তারা চিন্তা করতে লাগল, “ভিক্ষুরা প্রথম বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করেছেন, নিশ্চয় তারা এখানে তিন মাস অবস্থান করবেন। কিন্তু ততদিন আমরা শিশুদের নিয়ে বাইরে ঘুরে ঘুরে বাস করতে পারব না। চলো, আমরা বরং ভিক্ষুদের ভয়ানক দৃশ্য দেখাই।” তারা রাতে ভিক্ষুদের শ্রমণধর্ম পালনের সময় ভয়ংকর যক্ষের রূপ ধারণ করে তাদের আগে আগে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগল, নানান ভীতিকর শব্দ করতে লাগল। সেই ভয়ংকর রূপ দেখে ও ভীতিকর শব্দ শুনে ভিক্ষুদের হৃদয় কেঁপে উঠল, চেহারা মলিন ও ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফলে তারা তাদের চিত্তকে একাগ্র করতে পারছিল না। অস্থিরচিত্ত হওয়ায় এবং তীব্র ভয়ের চোটে বারবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ায় তারা কিছুতেই স্মৃতি ধরে রাখতে পারছিল না। তারপর তারা সেই স্মৃতিবিহ্বল ভিক্ষুদের সামনে অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। সেই অসহ্য দুর্গন্ধ গিয়ে তাদের মাথায় জোরে আঘাত করল, তাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা দেখা দিল, কিন্তু কেউই কাউকে সেই কথা বলল না।

তারপর একদিন সংঘস্থবিরকে সেবা করার জন্য সকলে সমবেত হলে সংঘস্থবির জিজ্ঞেস করল, “বন্ধুগণ, তোমরা যখন এই গহীন বনে প্রবেশ করেছিলে তখন কিছুদিন তোমাদের মুখের চেহারা বেশ ফর্সা ও উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এখন তোমাদের চেহারা কেমন যেন মলিন ও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, এখানে তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি?” তখন একজন ভিক্ষু বলল, “ভন্তে, আমি রাতে এই এই ধরনের ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাই এবং ভীতিকর শব্দ শুনতে পাই, নাকে এই ধরনের গন্ধ পাই, তাই আমার চিত্ত কিছুতেই সমাহিত হচ্ছে না।” একে একে সবাই সেই একই কথা জানাল। সংঘস্থবির বলল, “বন্ধুগণ, ভগবান দুই প্রকারে বর্ষাবাস অধিষ্ঠান করা যায় বলে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, আমাদের জন্য এই বাসস্থান বসবাসের উপযোগী নয়, বন্ধুগণ, চলো আমরা ভগবানের কাছে যাই, গিয়ে অন্য কোনো উপযোগী বাসস্থানের কথা জিজ্ঞেস করি।” “ঠিক আছে, ভন্তে” বলে সেই ভিক্ষুরা স্থবিরকে প্রত্যুত্তর জানিয়ে সবাই মিলে বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখে, পাত্র-চীবর গ্রহণ করে, জনসংসর্গে নির্লিপ্ত হওয়ায় কাউকে কিছু না জানিয়েই শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরল। ক্রমান্বয়ে শ্রাবস্তীতে পৌঁছে ভগবানের কাছে গেল।

ভগবান সেই ভিক্ষুদের দেখে বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি তো ইতিমধ্যেই শিক্ষাপদ বেঁধে দিয়েছি যে, বর্ষাবাসের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়, তোমরা কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ?” তারা ভগবানকে সবকিছু জানাল। ভগবান গভীরভাবে ভেবে দেখতে লাগলেন, কিন্তু সমগ্র জম্বুদ্বীপের মধ্যে ন্যূনতম চারপেয়ে চেয়ার রাখা যেতে পারে এমন ছোট্ট বাসস্থানও দেখতে পেলেন না, যা তাদের বসবাসের উপযোগী হতে পারে। তারপর সেই ভিক্ষুদের বললেন, “হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপযোগী বাসস্থান দেখতে পেলাম না, সেখানে বাস করেই তোমরা আসবক্ষয় করতে পারবে। কাজেই, যাও, হে ভিক্ষুগণ, সেই বাসস্থানকে আশ্রয় করেই বসবাস করো। তোমরা যদি দেবতাদের ভয় হতে রক্ষা পেতে চাও, তা হলে এই পরিত্রাণটি শিখে নাও, এটি তোমাদের জন্য একইসঙ্গে পরিত্রাণ ও কর্মস্থান হবে।” এই বলে ভগবান এই সূত্রটি ভাষণ করলেন।

তবে কারো কারো মতে, “যাও, হে ভিক্ষুগণ, সেই বাসস্থানকে আশ্রয় করেই বসবাস করো” এই কথা বলার পর ভগবান বললেন, “তা ছাড়া, অরণ্যে বাস করতে গেলে তার অবশ্যই নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় সে-ব্যাপারে জানা থাকা উচিত। যেমন—সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা করণীয় কাজ হিসেবে দুটি মৈত্রী সূত্র, দুটি পরিত্রাণ, দুটি অশুভ ধ্যান, দুটি মরণস্মৃতি এবং আটটি মহাসংবেগের বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। আটটি মহাসংবেগের বিষয় মানে হচ্ছে জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি, মরণ এবং চারটি অপায়দুঃখ। অথবা জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি ও মরণ এই চারটি, এবং অপায়দুঃখ পঞ্চম, অতীতের সংসারচক্র হতে উৎপন্ন হওয়া দুঃখ, ভবিষ্যতের সংসারচক্র হতে উৎপন্ন হওয়া দুঃখ ও বর্তমানে আহার অন্বেষণজনিত দুঃখ।” এভাবে ভগবান নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে বলার পর, সেই ভিক্ষুদের মৈত্রীর জন্য, পরিত্রাণের জন্য ও বিদর্শন উৎপাদক ধ্যানের জন্য এই সূত্র ভাষণ করলেন। এভাবে বিস্তারিতভাবেও “যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে বলা হয়েছে” এইসব পদগুলোর ব্যাখ্যা ও উৎপত্তি বর্ণনাকে বুঝতে হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত “**যার দ্বারা, যখন, যেখানে ও যেই কারণে বলা হয়েছে, এই হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। উৎপত্তি বর্ণনা করে**” বলে যেই সংক্ষিপ্ত বিবরণী উল্লেখিত হয়েছে, তা সর্বপ্রকারে বিস্তারিত করা হয়েছে।

## প্রথম গাথার বর্ণনা

১. এখন “**আমি এর অর্থবর্ণনা করব**” বলায় এভাবে উৎপত্তির বর্ণনা তুলে ধরার পর এই সূত্রের **অর্থবর্ণনা** শুরু হতে যাচ্ছে। এখানে **করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি** এই প্রথম গাথার পদবর্ণনা হচ্ছে: **করণীয়** মানে করা উচিত, করার যোগ্য, এই হচ্ছে এর অর্থ। **ভালো কাজ** মানে হচ্ছে পথ বা উপায়, অথবা যা কিছু নিজের জন্য হিত বা ভালো, সেসব সার্থকতায় উপনীত হয় বিধায় ‘ভালো কাজ’ বলা হয়েছে। ভালো কাজে **দক্ষ ব্যক্তি** মানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলা হয়েছে। **শান্তপদ নির্বাণ** হচ্ছে একটি সমন্বিত বাক্য। এখানে স্বভাবের ভিত্তিতে **শান্ত**, পৌঁছানোর ভিত্তিতে **পদ**, সব মিলিয়ে শান্তপদ নির্বাণ বলা হয়েছে। **অধিগত করে** মানে হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে। পারে এই অর্থে **সক্ষম**, অর্থাৎ সমর্থ, উপযুক্ত বলা হয়েছে। **সোজা** মানে হচ্ছে সিধে, ঋজু। ভালোমতো সোজা অর্থে **সরল**। সুখে কথা বলা যায় এই অর্থে **সুবাধ্য**। **মৃদুস্বভাব** মানে হচ্ছে খুবই নরম স্বভাবযুক্ত। অহংকার করে না এই অর্থে **নিরহংকারী**।

এখানে এর অর্থবর্ণনা হচ্ছে এই: **করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করে**। এখানে করণীয় আছে, অকরণীয় আছে। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে বললে শিক্ষাত্রয়ই হচ্ছে **করণীয়**, আর শীলবিপত্তি, দৃষ্টিবিপত্তি, আচারবিপত্তি, জীবিকাবিপত্তি ইত্যাদি হচ্ছে **অকরণীয়**। ঠিক তদ্রূপ ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি আছে, ভালো কাজে অদক্ষ ব্যক্তি আছে।

এখানে যে ব্যক্তি এই শাসনে প্রব্রজিত হয়ে নিজেকে সঠিক পথে নিয়োজিত করে না, শীলভঙ্গকারী হয়, একুশ প্রকার মিথ্যাজীবিকা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে; যেমন: বাঁশ দান করা, পাতা দান করা, ফুল দান করা, ফল দান করা, দন্তকাষ্ঠ দান করা, মুখ ধোয়ার জল দান করা, স্নানের জল দান করা, (স্নানের কাজে ব্যবহারে জন্য) চূর্ণ বা গুঁড়ো দান করা, মাটি দান করা, তোষামোদ করা, মুগের সূপের মতো আচরণ করা (অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করা), ভৃত্যের কাজ করা, হেঁটে হেঁটে বার্তাবাহকের কাজ করা, বৈদ্যকর্ম, বার্তাবাহকের কাজ করা, বার্তাবাহক হিসেবে কোথাও গমন করা, একে অপরকে পিণ্ডদান ও প্রতিপিণ্ডদান করা, বাস্তুবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা। ছয় প্রকার অবিচরণীয় জায়গায় বিচরণ করে; যেমন: বেশ্যাদের কাছে যাওয়া, বিধবাদের কাছে যাওয়া, মোটাসোটা কুমারী মেয়েদের কাছে যাওয়া, পণ্ডকদের কাছে যাওয়া, ভিক্ষুণীদের কাছে যাওয়া ও পানশালায় যাওয়া। রাজা, রাজার মহামন্ত্রী ও কর্মকর্তা, ভিন্নধর্মাবলম্বী ও ভিন্নধর্মাবলম্বীদের শিষ্যদের সঙ্গে অনুপযোগী গৃহীসংসর্গের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে বাস করা। অথবা যে-সকল পরিবার ভিক্ষুদের প্রতি... উপাসিকাদের প্রতি অশ্রদ্ধাবান, অপ্রসন্ন, অদাতা, আক্রোশকারী, নিন্দাকারী, অনর্থকামী, অহিতকামী, অসুখকামী, অযোগক্ষেমকামী, তাদৃশ পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের সেবা-পরিচর্যা করা, সংসর্গ করা। এই হচ্ছে **ভালো কাজে অদক্ষ ব্যক্তি**।

কিন্তু যে ব্যক্তি এই শাসনে প্রব্রজিত হয়ে নিজেকে সঠিক পথে নিয়োজিত করে, মিথ্যাজীবিকা পরিহার করে চারি পরিশুদ্ধি শীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইচ্ছায় শ্রদ্ধাকে মুখ্য করে পাতিমোক্খ-সংবরণ, স্মৃতিকে মুখ্য করে ইন্দ্রিয়-সংবরণ, উদ্যমকে মুখ্য করে জীবিকা-পরিশুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে মুখ্য করে ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিভোগ পূরণ করে। এই হচ্ছে **ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি**।

অথবা, যে ব্যক্তি সপ্ত আপত্তিরাশি শোধন করার ভিত্তিতে পাতিমোক্খ-সংবরণ, ছয় দ্বারে উপস্থিত হওয়া বিষয়গুলোর প্রতি লালসা ইত্যাদির অনুৎপত্তির ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়-সংবরণ, মিথ্যাজীবিকা পরিবর্জনের ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্রশংসিত, বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্যদের দ্বারা বর্ণিত ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী পরিভোগের ভিত্তিতে জীবিকা-পরিশুদ্ধি, পূর্বোক্ত ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীগুলোকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী পরিভোগ, চার দৈহিক ভঙ্গিমা পরিবর্তনে সার্থকতা ইত্যাদিকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সম্প্রজ্ঞানকে শোধন করে। এই হচ্ছে **ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি**।

অথবা, যেমন লবণাক্ত জল দিয়ে মলিন কাপড় পরিষ্কার করা হয়, ছাই দিয়ে আয়না পরিষ্কার করা হয় ও ধাতু-গলানোর পাত্রের মুখ দিয়ে সোনা পরিষ্কার করা হয়, ঠিক সেভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান দিয়েই শীল পরিশুদ্ধ হয় জেনে জ্ঞানের জলে ধুয়ে শীলকে শোধন করে। যেমন কিকী পাখি তার ডিমকে, চামরী গাইগরু তার একমাত্র লেজকে, একপুত্রের অধিকারী নারী তার একমাত্র পুত্রকে, একচোখওয়ালা ব্যক্তি তার সেই একমাত্র চোখকে রক্ষা করে, ঠিক সেভাবে যে ব্যক্তি অতীব অপ্রমত্ত হয়ে নিজের শীলরাশিকে রক্ষা করে, সকাল-সন্ধ্যা পর্যবেক্ষণের সময় ক্ষুদ্রতম দোষও দেখতে পায় না। এই হচ্ছে **ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি**।

অথবা, যে ব্যক্তি অননুতাপজনক শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কলুষতাগুলোকে দূর করে দেওয়ার পথে হাঁটার চেষ্টা করে, সেভাবে চেষ্টা করার পর কৃৎস্ন-ধ্যান চর্চা করে, কৃৎস্ন-ধ্যান চর্চা করে সমাপত্তি উৎপন্ন করে। এই হচ্ছে **ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি**। অথবা, যে ব্যক্তি সমাপত্তি হতে উঠে সৃষ্টিগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করে অর্হত্ত্ব লাভ করে, এই ব্যক্তিই ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তিদের মধ্যে সেরা।

এখানে যারা এই অননুতাপজনক শীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে, অথবা কলুষতাগুলোকে দূর করে দেওয়ার পথে হাঁটার চেষ্টা করার মাধ্যমে মার্গফলের দ্বারা বর্ণিত ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি, তারাই এই অর্থে **ভালো কাজে দক্ষ** হিসেবে অভিপ্রেত। সেই ভিক্ষুরা ছিল সেই ধরনের। তাই ভগবান সেই ভিক্ষুদের সম্পর্কে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত দেশনার দ্বারা “করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তি” বলেছেন।

তারপর “কী করণীয়?” তাদের মনে দেখা দেওয়া সন্দেহকে লক্ষ্য করে বললেন, “**শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করে।**” এখানে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই: বুদ্ধ ও অনুবুদ্ধগণের দ্বারা বর্ণিত সেই শান্তপদ নির্বাণকে অনুধাবনের ভিত্তিতে অধিগত করে অবস্থান করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির দ্বারা যা করণীয়।

অথবা, “**শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করে**” মানে হচ্ছে জনশ্রুতি ইত্যাদির ভিত্তিতে লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা ‘নির্বাণপদ শান্ত’ জেনে তা অধিগত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির দ্বারা যা কিছু করণীয়, এভাবে ইচ্ছার ভিত্তিতে অনুসরণ করা, অর্থাৎ সেই করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা, এখানে এটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। অথবা “করণীয় ভালো কাজে দক্ষ ব্যক্তির দ্বারা” বলা হলে তখন যারা “কী?” বলে চিন্তা করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “**শান্তপদ নির্বাণ অধিগত করে।**” তার উদ্দেশ্যকে এভাবেই বুঝতে হবে: লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা শান্তপদকে অধিগত করে যা করণীয়, তা। যা করা উচিত, তা করণীয়, তা করার যোগ্য বলা হয়েছে।

কিন্তু ‘তা’ মানে কী? তা অধিগত করার উপায় ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে কি? কারণ (পালন) করার যোগ্য শিক্ষাত্রয় তুলে ধরার মাধ্যমে একদম শুরুতেই এটির কথা বলা হয়েছে। তাই তো তার অর্থবর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, “করণীয় আছে, অকরণীয় আছে। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে বললে শিক্ষাত্রয়ই হচ্ছে করণীয়।” কিন্তু অতি সংক্ষেপে দেশনা করার কারণে সেই ভিক্ষুদের কেউ কেউ বিষয়টি বুঝতে পেরেছে, আর কেউ কেউ বুঝতে পারেনি। যারা বুঝতে পারেনি তারা যাতে বুঝতে পারে সেজন্যই বিশেষ করে একজন আরণ্যিক ভিক্ষুর দ্বারা যা করা উচিত সেটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেই “**সক্ষম, সোজা, সরল, সুবাধ্য, মৃদুস্বভাব ও নিরহংকারী হন**” এই অর্ধেক গাথাটি বললেন।

এতে কী বলা হয়েছে? শান্তপদকে অধিগত করে বাস করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি লৌকিক প্রজ্ঞার দ্বারা, অথবা সেটি বুঝে তাকে অধিগত করার কাজে লেগে পড়া আরণ্যিক ভিক্ষু দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রচেষ্টার অঙ্গ সমন্বিত হয়ে দেহ ও জীবনের প্রতি মায়া ত্যাগ করে, সত্যকে উপলব্ধি করার কাজে নিয়োজিত হতে সক্ষম হন, ঠিক সেভাবে কৃৎস্ন-ধ্যান, ব্রত-গ্রহণ ইত্যাদিতে এবং নিজের পাত্র-চীবর মেরামত করা ইত্যাদিতে, সতীর্থ ব্রহ্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের যা কিছু করণীয় কাজ আছে, এবং সে-ধরনের অন্য যেকোনো কাজে সক্ষম, দক্ষ, অনলস ও সমর্থ হন। সক্ষম হয়েও তৃতীয় প্রচেষ্টার অঙ্গ সমন্বিত হয়ে তিনি সোজা হন। সোজা হওয়ার সময়েও তিনি একবার মাত্র সোজা হয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে আজীবন এবং বারবার কোনো প্রকার শৈথিল্য না দেখিয়ে আরো ভালো করে সোজা হন। অথবা অশঠতার দ্বারা সোজা, অমায়াবী হওয়ার দ্বারা সরল হন। অথবা কায়িক ও বাচনিক বক্রতা পরিহারের দ্বারা সোজা হন, মানসিক বক্রতা পরিহারের দ্বারা সরল হন। অথবা অবিদ্যমান গুণকে প্রকাশ না করার দ্বারা সোজা হন, অবিদ্যমান গুণের দ্বারা উৎপন্ন লাভকে গ্রহণ না করার দ্বারা সরল হন। এভাবে বিষয়বস্তুর লক্ষণগুলোকে পর্যবেক্ষণের দ্বারা, পূর্বের দুটি ও তৃতীয় শিক্ষার দ্বারা এবং প্রয়োগের ইচ্ছাকে শুদ্ধিকরণের দ্বারা সোজা ও সরল হন।

তিনি কেবল সোজা ও সরল হন তা-ই নয়, অধিকন্তু তিনি **সুবাধ্য**ও হন। যে ব্যক্তি “এটি করা উচিত নয়” বলা হলে “তুমি কী দেখেছ, তুমি কী শুনেছ, কে তুমি আমার হয়ে কথা বলছ, তুমি কোন উপাধ্যায় বা আচার্যের কাছে থাকো বা মেলামেশা করো?” এভাবে কথা বলে, অথবা চুপ করে থেকে তাকে কষ্ট দেয়, অথবা তার কথা মেনে নিয়েও তা পালন করে না, সে বিশেষ অর্জন থেকে দূরেই অবস্থান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি উপদেশ দিলে “সাধু ভন্তে, আপনি খুবই ভালো কথা বলেছেন, নিজের দোষ দেখতে পাওয়া খুব কঠিন, পুনরায় এমন কাজ করতে দেখলে দয়া করে আমায় বলবেন, বহুদিন পর আমি আপনার কাছ থেকে উপদেশ পেলাম” এভাবে বলে, উপদেশ পালন করে, সে বিশেষ অর্জনের খুব কাছেই অবস্থান করে। তাই এভাবে অন্যের কথা গ্রহণ করে ও পালন করে তিনি সুবাধ্য হন।

তিনি যেমন সুবাধ্য হন তেমনি **মৃদুস্বভাব**ও হন। **মৃদুস্বভাব** মানে হচ্ছে গৃহীরা দূতের কাজ, সংবাদ বহন, সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি কাজ করতে বললে তাতে নরম মনোভাব না দেখিয়ে এবং দৃঢ় মনোভাব দেখিয়ে তিনি ব্রতাচরণ ও সকল ব্রহ্মচর্য আচরণে মৃদুস্বভাবের হন, অর্থাৎ সুনির্মিত সোনার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের যোগ্য হন। অথবা **মৃদুস্বভাব** মানে হচ্ছে তিনি অভ্রূকুটিকারী, সরলভাষী, সুখালাপী, সাদর অভ্যর্থনাকারী ও সুন্দর ঘাটের মতো সুখাবগাহী হন। তিনি কেবল মৃদুস্বভাব হন তা-ই নয়, অধিকন্তু তিনি **নিরহংকারী**ও হন, অর্থাৎ তিনি জাতি-গোত্র ইত্যাদি অহংমূলক বিষয়গুলোর দ্বারা অন্যদের অবজ্ঞা করেন না, সারিপুত্র স্থবিরের মতো চণ্ডাল-কুমারসম চিত্তে অবস্থান করেন।

## দ্বিতীয় গাথার বর্ণনা

২. এভাবে ভগবান শান্তপদকে জেনে অবস্থানেচ্ছু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, অথবা তা অধিগত করতে সেই পথে হাঁটা বিশেষ করে আরণ্যিক ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে আংশিক করণীয় বলে দেওয়ার পর, পুনরায় আরো কিছু বলার ইচ্ছায় “**তিনি সন্তুষ্ট, সুখে ভরণপোষণযোগ্য**” দ্বিতীয় গাথাটি বললেন।

এখানে “সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা” এই কথায় বর্ণিত নিয়মে যে ব্যক্তি বারো প্রকার সন্তোষের দ্বারা সন্তুষ্ট হয় সে-ই **সন্তুষ্ট**। অথবা তুষ্ট হয় এই অর্থে তুষ্ট, নিজের ভেবে তুষ্ট, আছে ভেবে তুষ্ট, শান্তভাবের দ্বারা তুষ্ট এই অর্থে **সন্তুষ্ট**। এখানে **নিজের** মানে হচ্ছে “ভিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত ভোজনের ওপরই নির্ভরশীল” (মহাৰ.৭৩) এভাবে উপসম্পদার ব্যাপারে আলোচনায় বর্ণিত নিজের গৃহীত চার প্রকার ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী। সেগুলো সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক, সম্মানের সঙ্গে দেওয়া হোক বা অসম্মানের সঙ্গে দেওয়া হোক, গ্রহণের সময় এবং পরিভোগের সময় বিরূপ মনোভাব উৎপন্ন না করে জীবনযাপন করলে “নিজের ভেবে তুষ্ট” বলা হয়। **আছে** মানে হচ্ছে যা পাওয়া যায় তা নিজের কাছে বিদ্যমান আছে, সেই নিজের কাছে বিদ্যমান থাকা জিনিসপত্রে তুষ্ট থেকে, তার অধিক পাওয়ার আশা না করে, সে-ধরনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিহার করে জীবনযাপন করলে “আছে ভেবে তুষ্ট” বলা হয়। আর **শান্তভাব** মানে হচ্ছে কাম্য-অকাম্য বিষয়গুলোর প্রতি খুশি ও বিদ্বেষ মনোভাব পরিত্যাগ করা। সেই ধরনের শান্তভাবের দ্বারা সব বিষয়ে তুষ্ট থাকতে পারলে “শান্তভাবের দ্বারা তুষ্ট” বলা হয়।

সুখে ভরণপোষণ করা যায় এই অর্থে **সুখে ভরণপোষণযোগ্য**, অর্থাৎ সুখপোষ্য বলা হয়েছে। যে ভিক্ষু পাত্রভর্তি শালিভাত, মাংস ইত্যাদি দিলেও বেজার হয় ও অখুশি হয়, অথবা তাদের সামনেই সেই খাদ্যগুলোকে “এ তোমরা কী দিয়েছ?” বলে প্রত্যাখ্যান করে শ্রামণ, গৃহী ইত্যাদি ব্যক্তিদের দিয়ে দেয়, এই ভিক্ষু হচ্ছে দুষ্পোষ্য। এই ধরনের ভিক্ষুকে দেখে মানুষেরা “এই ভিক্ষু দুষ্পোষ্য, একে ভরণপোষণ করা সম্ভব নয়” বলে দূর থেকেই এড়িয়ে চলে। কিন্তু যে ভিক্ষু ভালো হোক আর মন্দ হোক, অল্প হোক আর বেশি হোক, যা পায় তাতেই খুশি হয়ে, প্রসন্নমুখে জীবনযাপন করে, ইনিই সুখপোষ্য। এই ধরনের ভিক্ষুকে দেখে মানুষেরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়, “আমাদের ভদন্ত সুখপোষ্য, অল্পেতেই তুষ্ট হয়, আমরা তাঁকেই ভরণপোষণ করব” ভেবে তাঁর সম্মতি আদায় করে ভরণপোষণ করে। এখানে এই ধরনের সুখপোষ্য বা সুখে ভরণপোষণযোগ্যই অভিপ্রেত।

তার কাজ খুবই অল্প এই অর্থে **অল্পকৃত্য**, অর্থাৎ যে বেশি বেশি কাজ করতে সুখ পায়, অনবরত বকবক করতে সুখ পায়, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে সুখ পায় ইত্যাদি অনেক কাজে জড়িত নয়। অথবা সকল বিহারে আবাস মেরামতের কাজ, সংঘসম্পত্তি, শ্রামণ ও সেবকদের দেখাশোনা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থেকে, যে শুধু নিজের চুল কামানো, নখ কাটা, পাত্র-চীবর যত্ন করা ইত্যাদি কাজ করে, শুধু শ্রমণধর্ম পালনের কাজই করে বলা হয়েছে।

তার চাহিদা সহজেই মিটে যায় এই অর্থে **লঘু জীবন-যাপনকারী**। যেমন কোনো কোনো দ্রব্যবহুল ভিক্ষু কোথাও চলে যাওয়ার সময় বহু পাত্র-চীবর-বিছানার চাদর-তেল-গুড় ইত্যাদি জিনিসগুলো বহু লোকের মাথায়-ঘাড়ে তুলে দিয়ে চলে যায়, এমনটি না হয়ে যার জিনিসপত্র খুবই কম, যে পাত্র-চীবর ইত্যাদি অষ্টপরিষ্কার নিয়েই জীবনযাপন করে, সে কোথাও চলে যাওয়ার সময় পাখির মতো ডানাগুলো নিয়েই চলে যায়, এখানে এই ধরনের লঘু জীবন-যাপনকারীই অভিপ্রেত। তার ইন্দ্রিয়গুলো অত্যন্ত শান্ত এই অর্থে **শান্ত-ইন্দ্রিয়**, অর্থাৎ কাম্য বিষয় ইত্যাদির প্রতি লোভ ইত্যাদির ভিত্তিতে অচঞ্চল-ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। **বিচক্ষণ** মানে হচ্ছে বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান, এবং শীলরক্ষামূলক প্রজ্ঞা-সমন্বিত, চীবর ইত্যাদি পর্যবেক্ষণমূলক প্রজ্ঞা-সমন্বিত ও আবাস ইত্যাদি সাতটি উপযোগী জিনিসকে পরিপূর্ণরূপে জানার প্রজ্ঞা-সমন্বিত, এই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

প্রগল্ভ নয় এই অর্থে **অপ্রগল্ভ**, অর্থাৎ আটটি বিষয়ে কায়িক প্রগল্ভতা, চারটি বিষয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা ও অনেক বিষয়ে মানসিক প্রগল্ভতা হতে বিরত থাকা ব্যক্তি, এই হচ্ছে এর অর্থ।

**আটটি বিষয়ে কায়িক প্রগল্ভতা** (মহানি.৮৭) মানে হচ্ছে সংঘ, গণ, ব্যক্তি, ভোজনশালা, অগ্নিশালা, স্নানের ঘাট, ভিক্ষান্ন সংগ্রহের রাস্তা, ঘরের ভেতরে প্রবেশের ভিত্তিতে কায়িকভাবে অনুচিত আচরণ করা। যেমন: এখানে কোনো কোনো ভিক্ষু সংঘমধ্যে উবু হয়ে বসে, অথবা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে, ঠিক সেভাবে গণমধ্যে অর্থাৎ চারি পরিষদ সমবেত হলে সেখানে এবং নিজের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মাঝেও বসে। কিন্তু কেউ কেউ ভোজনশালায় বয়োজ্যেষ্ঠদের বসার আসন দেয় না, নবীনদের বসার আসনে বসতে বাধা সৃষ্টি করে, অগ্নিশালায়ও ঠিক সে-রকম। এখানে কেউ কেউ বয়োজ্যেষ্ঠদের জিজ্ঞেস না করেই আগুন জ্বালানো ইত্যাদি কাজ করে। কেউ কেউ স্নানের ঘাটে, যেমন “এখানে নবীন-প্রবীণ ভেদাভেদ না করে যে আগে আসবে সে-ই আগে স্নানের সুযোগ পাবে” বলা হয়েছে, সেই বিধি অগ্রাহ্য করে পরে এসে সোজা জলে নেমে বয়োজ্যেষ্ঠ ও নবীনদের স্নানে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু কেউ কেউ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের সময় ভালো ভালো আসন, জল ও পিণ্ড লাভের জন্য এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের আগে আগে গমন করে, ঘরের ভেতরে প্রবেশের সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের আগে প্রবেশ করে, নবীনদের সঙ্গে মজা করার ছলে ধাক্কাধাক্কি করে, এভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

**চারটি বিষয়ে বাচনিক প্রগল্ভতা** মানে হচ্ছে সংঘ, গণ, ব্যক্তি ও ঘরের ভেতরে অনুচিত কথাবার্তা বলা। যেমন: এখানে কেউ কেউ সংঘমধ্যে কাউকে জিজ্ঞেস না করেই ধর্মকথা বলে, পূর্বোক্ত প্রকারে গণের মধ্যে ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যেও ঠিক সে-রকম। এখানে কেউ কেউ মানুষেরা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস না করেই উত্তর দেয়। কিন্তু কেউ কেউ ঘরের মধ্যে “অমুক জায়গায় কী আছে, সেখানে কি জাউ কিংবা কোনো খাদ্য-ভোজ্য আছে, আমাকে কী দেবে, আজ আমি কি খাবো, কী ভোজন করব, কী পান করব?” এভাবে ইত্যাদি কথা বলে।

**অনেক বিষয়ে মানসিক প্রগল্ভতা** মানে হচ্ছে সেই সেই বিষয়গুলোতে কায়িক ও বাচনিকভাবে ছোটখাটো অপরাধ না করলেও মনে মনে কামচিন্তা ইত্যাদি নানা রকম অনুচিত চিন্তা করা।

**গৃহকুলে অনাসক্ত হন** মানে হচ্ছে তিনি যেসব পরিবারে উপস্থিত হন সেখানে ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি লোভের বশে অথবা অনুপযুক্ত গৃহীসংসর্গের বশে লোলুপতাহীন হন, শোকাহত হন না, আনন্দিত হন না, সুখী ব্যক্তিদের মধ্যে সুখী হন না, দুঃখী ব্যক্তিদের মধ্যে দুঃখী হন না, হঠাৎ দেখা দেওয়া নানান কাজকর্মে নিজেকে জড়ান না বলা হয়েছে।

## তৃতীয় গাথার বর্ণনা

৩. এভাবে ভগবান শান্তপদকে জেনে অবস্থানেচ্ছু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, অথবা তা অধিগত করতে সেই পথে হাঁটতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে আরণ্যিক ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে আরো অধিক করণীয়গুলো বলার পর, এখন অকরণীয়গুলো বলার ইচ্ছায় “**তিনি এমন কোনো ক্ষুদ্র অসদাচরণ করেন না, যাতে অন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দা করতে পারেন**” এই অর্ধেক গাথাটি বললেন। তার অর্থ হচ্ছে এই: এভাবে এই সমস্ত করণীয়গুলো সম্পাদন করার সময় যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায়িক-বাচনিক-মানসিক অসদাচরণের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিনি করেন না। অসদাচরণ না করার সময় তিনি শুধু বড়ো বড়োগুলো করেন না তা নয়, মূলত কোনো অসদাচরণই করেন না, অর্থাৎ এমনকি অল্পমাত্র, ক্ষুদ্রতম অসদাচরণও করেন না বলা হয়েছে।

তারপর তার অসদাচরণের প্রত্যক্ষ বিপদকে দেখিয়ে দিলেন এই বলে—“**যাতে অন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দা করতে পারেন।**” এখানে অজ্ঞ ব্যক্তিদের আদর্শ হিসেবে ধরা যায় না। কারণ তারা নিজেরাও সদোষ কিংবা নির্দোষ কাজ, অল্পপাপ কিংবা মহাপাপ কাজ সম্পাদন করে। শুধু বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এখানে আদর্শ হিসেবে গণ্য হন। কারণ তাঁরা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করে, গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিন্দনীয় ব্যক্তিকে নিন্দা করেন, প্রশংসনীয় ব্যক্তিকে প্রশংসা করেন, তাই “অন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা” বলা হয়েছে।

এভাবে ভগবান এই আড়াইটি গাথাযোগে শান্তপদকে জেনে অবস্থানেচ্ছু ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, অথবা তা অধিগত করতে সেই পথে হাঁটতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে আরণ্যিক ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে আরণ্যিক জীবনকে মুখ্য করে এবং কর্মস্থান গ্রহণ করে অবস্থান করতে ইচ্ছুক সবার করণীয়-অকরণীয়-ভেদে কর্মস্থান সম্পর্কীত নানা কথা বলার পর, এখন সেই ভিক্ষুদের দেবতাভয় দূর করে দিয়ে তাদের পরিত্রাণের জন্য বিদর্শন-উৎপাদক ধ্যানের ভিত্তিতে কর্মস্থানের কথা এবং “**সকল সত্ত্ব সুখী ও উপদ্রবহীন হোক!**” ইত্যাদি প্রকারে মৈত্রীকথা বলতে আরম্ভ করলেন।

এখানে **সুখী** মানে হচ্ছে সুখসমন্বিত, সুখযুক্ত। **উপদ্রবহীন** মানে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, ভয়হীন ও উপদ্রবমুক্ত বলা হয়েছে। **সকল** মানে হচ্ছে নির্বিশেষে, সবাই। **সত্ত্ব** মানে হচ্ছে প্রাণী। **সুখীচিত্তের অধিকারী** মানে হচ্ছে সুখীচিত্তসম্পন্ন। এখানে কায়িক সুখে সুখী, মানসিক সুখে সুখী, অথবা উভয় প্রকারে সমস্ত ভয়-উপদ্রব দূর হয়ে সম্পূর্ণ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ও উপদ্রবমুক্ত বুঝতে হবে। কিন্তু কেন এমনটি বলা হয়েছে? মৈত্রীভাবনার আকার-আকৃতি তুলে ধরার জন্য। এভাবেই মৈত্রী গড়ে তোলা উচিত—“সকল সত্ত্ব সুখী হোক”, অথবা “উপদ্রবহীন হোক”, অথবা “সুখীচিত্তের অধিকারী হোক”।

## চতুর্থ গাথার বর্ণনা

৪. এভাবে উপচার ধ্যানস্তর থেকে অর্পণা ধ্যানস্তর পর্যন্ত সংক্ষেপে মৈত্রীভাবনা তুলে ধরার পর, এখন সেটির বিস্তারিত তুলে ধরতেই “**অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে**” দুটি গাথা বলেছেন। অথবা যেহেতু বিভিন্ন আলম্বন বা বিষয়বস্তুতে অভ্যস্ত চিত্ত শুরুতেই একটিমাত্র আলম্বন বা বিষয়বস্তুতে স্থির হয়ে থাকে না, বিভিন্ন আলম্বনকে অনুসরণ করে ক্রমে একটিমাত্র আলম্বনে স্থির হয়ে থাকে, তাই সেই সেই অস্থির-অবিচল ইত্যাদি দ্বিক ও ত্রিক আলম্বনকে অনুসরণ করে করেও একটিমাত্র আলম্বনে স্থির করে রাখার জন্যই “অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে” দুটি গাথা বলেছেন। অথবা যেহেতু যার কাছে যেই আলম্বনটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়, তার তাতে চিত্তকে স্থির করে রাখার ইচ্ছায় অস্থির-অবিচল ইত্যাদি দ্বিক ও ত্রিক আলম্বনগুলোকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে “অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে” দুটি গাথা বলেছেন।

এখানে অস্থির-অবিচল দ্বিক, দৃষ্ট-অদৃষ্ট দ্বিক, দূরে কিংবা কাছে দ্বিক, জন্মেছে ও জন্মাতে চলেছে দ্বিক, মোট চারটি দ্বিক এবং লম্বা ইত্যাদি ছয়টি শব্দ হতে তিনটি গুচ্ছের মধ্যেই মাঝারি শব্দটি, দ্বিক ও ত্রিকগুলোতে অতিক্ষুদ্র শব্দটি, অর্থপূর্ণ করার ভিত্তিতে লম্বা-খাটো-মাঝারি ত্রিক, বড়ো-অতিক্ষুদ্র-মাঝারি ত্রিক, মোটাসোটা-অতিক্ষুদ্র-মাঝারি ত্রিক, মোট তিনটি ত্রিককে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে **যে-সকল** শব্দবন্ধটি একটি নির্বিশেষ বা অবিশেষ বাক্য। প্রাণীরাই হচ্ছে জীবগণ এই অর্থে প্রাণী ও জীবগণ। অথবা যাদের প্রাণ আছে তারাই প্রাণী। এর দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল পাঁচটি পুঞ্জবিশিষ্ট সত্ত্বগণকেই বুঝানো হয়েছে। যারা জীবন ধারণ করে তারাই জীব। এর দ্বারা একটি পুঞ্জবিশিষ্ট ও চারটি পুঞ্জবিশিষ্ট সত্ত্বগণকেই বুঝানো হয়েছে। **আছে** মানে হচ্ছে বিদ্যমান আছে।

এভাবে “**যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে**” এই বাক্যের দ্বারা দ্বিক ও ত্রিকের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন সকল সত্ত্বগণকে একসঙ্গে তুলে ধরার পর, এখন তাদের সকলকে **অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে** এই দ্বিকের অন্তর্ভুক্ত করে তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে যারা ভয়ে কম্পিত হয় তারাই **অস্থির**, এটি তৃষ্ণাযুক্ত ও ভয়যুক্ত প্রাণীদেরই অন্য নাম। যারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারাই **অবিচল**, এটি তৃষ্ণা ও ভয়মুক্ত অর্হতেরই অন্য নাম। তাদের মধ্যে কেউই অবশিষ্ট নেই বিধায় **নির্বিশেষে**, অর্থাৎ সবাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় গাথার শেষে যা বলা হয়েছে তা সবকটি দ্বিক ও ত্রিকেই যোগ করে দিতে হবে, যেমন: অস্থির-অবিচল-নির্বিশেষে যে-সকল প্রাণী ও জীবগণ আছে, এই সত্ত্বগণ সবাই সুখীচিত্তের অধিকারী হোক। এভাবে যারা ইতিমধ্যে জন্মেছে এবং যারা আগামীতে জন্মাতে চলেছে পর্যন্ত এই সত্ত্বগণ সবাই সুখীচিত্তের অধিকারী হোক।

এখন লম্বা, খাটো, মাঝারি ইত্যাদি তিনটি ত্রিক তুলে ধরা কথাগুলোতে **লম্বা** ইত্যাদি ছয়টি শব্দের মধ্যে **লম্বা** মানে হচ্ছে যাদের শরীর লম্বাকৃতির, অর্থাৎ সাপ, মাছ, গুইসাপ ইত্যাদি। মহাসমুদ্রের মধ্যে বাস করা সাপগুলোর শরীর বহুশত ব্যাম পরিমাণ লম্বাও (ব্যাম মানে হচ্ছে চার হাত পরিমাণ লম্বা) হয়ে থাকে, এবং মাছ-গুইসাপ ইত্যাদির শরীর বহু যোজন পরিমাণ লম্বাও হয়ে থাকে। **বড়ো** মানে হচ্ছে জলে বাস করা বিশালাকৃতির মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি, স্থলে বাস করা হাতি ইত্যাদি, আর অমনুষ্যদের মধ্যে দানব ইত্যাদি। যেমন বলা হয়েছে, “দেহধারীদের মধ্যে রাহুই সবচেয়ে বড়ো।” (অ.নি.৪.১৫) তার দেহের সাইজটা হচ্ছে উচ্চতায় চার হাজার আটশো যোজন, তার বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য বারো শ যোজন, চোখের দুই ভ্রূর দূরত্বটা হচ্ছে পঞ্চাশ যোজন, আঙুলগুলোও পঞ্চাশ যোজন লম্বা এবং দুই হাতের পাতাগুলো একশো যোজন চওড়া। **মাঝারি** মানে হচ্ছে ঘোড়া, গরু, মোষ, শুয়োর ইত্যাদির শরীর। **খাটো** মানে হচ্ছে সেই সেই জাতিগুলোতে বামন ইত্যাদি লম্বা ও মাঝারি উচ্চতার চাইতে কম উচ্চতাবিশিষ্ট সত্ত্বগণ। **অতিক্ষুদ্র** মানে হচ্ছে মাংসচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না এমন অতিক্ষুদ্র, দিব্যচোখ দিয়েই শুধু দেখা যায় এমন জল ইত্যাদিতে উৎপন্ন হওয়া সূক্ষ্ম দেহধারী সত্ত্বগণ, অথবা উকুন ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব সত্ত্ব সেই সেই জাতিগুলোতে বড়ো ও মাঝারি এবং মোটাসোটা ও মাঝারি সাইজের চেয়ে ছোটো, তাদেরকেই অতিক্ষুদ্র বলা হয়। **মোটাসোটা** মানে হচ্ছে গোলগাল দেহধারী মাছ, কচ্ছপ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি সত্ত্বগণ।

## পঞ্চম গাথার বর্ণনা

৫. এভাবে তিনটি ত্রিক দিয়ে একদম সাধারণভাবে সত্ত্বগণকে তুলে ধরার পর, এখন “**দৃষ্ট-অদৃষ্ট**” ইত্যাদি তিনটি দ্বিকের মাধ্যমে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে তুলে ধরলেন।

এখানে **দৃষ্ট** মানে হচ্ছে যারা নিজের চোখের দৃষ্টিপথে আসার ভিত্তিতে আগেই দেখা হয়েছে। **অদৃষ্ট** মানে হচ্ছে যারা অন্য সমুদ্রে, পাথরের দেয়ালের ওপাশে (*পরসেল*), অন্য মহাবিশ্বে ইত্যাদিতে দাঁড়িয়ে আছে। “**যারা দূরে কিংবা কাছে বাস করে**” এই দ্বিকের দ্বারা নিজের থেকে দূরে কিংবা কাছে বাস করে এমন সত্ত্বদেরই তুলে ধরা হয়েছে। তারা কোনো কিছু থেকে উদ্ভূত হয় হিসেবে বুঝতে হবে। যেসব সত্ত্ব নিজের দেহের মধ্যে বাস করে তারা ‘কাছে’ বাস করে, আর যারা নিজের দেহের বাইরে বাস করে তারা ‘দূরে’ বাস করে। ঠিক সেভাবে যারা আশপাশের এলাকার মধ্যেই বাস করে তারা ‘কাছে’ বাস করে, আর যারা আশপাশের এলাকার বাইরে বাস করে তারা ‘দূরে’ বাস করে। নিজের বিহারে, গ্রামে, জনপদে, দ্বীপে কিংবা মহাবিশ্বে বাস করে তারা ‘কাছে’ বাস করে, আর যারা অন্য মহাবিশ্বে বাস করে তারা ‘দূরে’ বাস করে বলা হয়েছে।

**জন্ম নিয়েছে** মানে হচ্ছে জাত হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে। যারা জন্ম নিয়েছে তারা ভবিষ্যতে আর পুনরায় উৎপন্ন হবে না হিসেবে গণ্য হয়, ‘ক্ষীণাসব’ হচ্ছে তাদের অন্য নাম। যারা জন্মকে অন্বেষণ করে, খুঁজে বেড়ায় তারাই **জন্মান্বেষী**। অথবা চারি যোনির মধ্যে অণ্ডজ ও জরায়ুজ সত্ত্বগণ যতক্ষণ ডিমের খোসা ও অণ্ডকোষ ভেদ করে না ততক্ষণ তাদের নাম ‘জন্মান্বেষী’ (*সম্ভৰেসী*)। ডিমের খোসা ও অণ্ডকোষ ভেদ করে বাইরে বের হলেই তাদের নাম ‘জন্ম নিয়েছে’ (*ভূতা*)। স্বেদজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাত সত্ত্বগণের প্রথম চিত্তক্ষণে তাদের নাম ‘জন্মান্বেষী’। আর দ্বিতীয় চিত্তক্ষণের পর থেকে তাদের নাম ‘জন্ম নিয়েছে’। অথবা তারা যেই দৈহিক ভঙ্গিমা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে, যতক্ষণ না অন্য দৈহিক ভঙ্গিমায় পৌঁছায় ততক্ষণ তাদের নাম ‘জন্মান্বেষী’। তারপর থেকে তাদের নাম ‘জন্ম নিয়েছে’।

## ষষ্ঠ গাথার বর্ণনা

৬. এভাবে ভগবান “সুখীচিত্তের অধিকারী হোক” ইত্যাদি আড়াইটি গাথাযোগে নানা প্রকারে সেই ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে হিতসুখ লাভের প্রার্থনার ভিত্তিতে সত্ত্বগণের প্রতি মৈত্রীভাবনা তুলে ধরার পর, এখন অহিত-দুঃখ লাভ না করার প্রার্থনার ভিত্তিতে সেটিকে তুলে ধরতেই বললেন, “**তারা একে অপরকে বঞ্চনা না করুক।**”

এখানে **বঞ্চনা না করুক** মানে হচ্ছে প্রতারিত না করুক। **অবজ্ঞা না করুক** মানে হচ্ছে হেয় না করুক। **কোথাও** মানে হচ্ছে কোনো স্থানে, অর্থাৎ কোনো গ্রামে, গঞ্জে, জমিতে, জ্ঞাতিদের মধ্যে, অথবা বিশাল জনতার মধ্যে, ইত্যাদিতে। **কাউকে** মানে হচ্ছে কোনো ক্ষত্রিয়কে, ব্রাহ্মণকে, গৃহীকে, প্রব্রজিতকে, সুখীকে, অথবা দুঃখীকে, ইত্যাদিকে। **হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে** মানে হচ্ছে কায়িক ও বাচনিক বিকারের দ্বারা হিংসার বশবর্তী হয়ে এবং মানসিক বিকারের দ্বারা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে। **পরস্পরের দুঃখ কামনা না করুক** মানে হচ্ছে একে অপরের দুঃখ কামনা না করুক। এতে কী বলা হয়েছে? শুধু “সুখী হোক, উপদ্রবহীন হোক” ইত্যাদিতে মনোযোগ দেওয়ার ভিত্তিতে মৈত্রী গড়ে তুললেই হবে না। “আহা, যেসব অন্য ব্যক্তি আছে তারা যাতে অন্য ব্যক্তিদের বঞ্চনা ইত্যাদি প্রতারণার দ্বারা বঞ্চনা না করুক, জাতি ইত্যাদি নয় প্রকার মানের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে কোথাও, কোনো জায়গায় যেকোনো অন্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা না করুক, হেয় না করুক এবং হিংসা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের দুঃখ কামনা না করুক” এভাবেও মনোযোগ দিতে হবে।

## সপ্তম গাথার বর্ণনা

৭. এভাবে অহিত-দুঃখ লাভ না করার প্রার্থনার ভিত্তিতে অর্থগতভাবে মৈত্রীভাবনা তুলে ধরার পর, এখন তার উপমা তুলে ধরতেই বললেন, “**মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে।**”

তার অর্থ হচ্ছে এই: **মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে** মানে নিজের গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে **প্রাণ দিয়ে হলেও রক্ষা করে**, অর্থাৎ সে যাতে দুঃখ না পায় তার জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করে হলেও তাকে রক্ষা করে, **তেমনি তিনিও সকল সত্ত্বগণের প্রতি** এই **অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন**, অর্থাৎ বারবার উৎপন্ন করেন, বাড়িয়ে তোলেন, তাও আবার অসংখ্য সত্ত্বালম্বনের ভিত্তিতে একজন সত্ত্বের প্রতি, অথবা সকল সত্ত্বের প্রতি মৈত্রী ছড়িয়ে দেওয়ার ভিত্তিতে অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন।

## অষ্টম গাথার বর্ণনা

৮. এভাবে সর্ব প্রকারে মৈত্রীভাবনাকে তুলে ধরার পর, এখন সেটিকে আরো বাড়িয়ে তুলে ধরার জন্যই বললেন, “**তিনি ওপরে, নিচে ও মধ্যবর্তী দিকে, সমস্ত জগতের প্রতি।**”

এখানে তার সঙ্গে মিত্রতা করে বিধায় মিত্র বা বন্ধু, অর্থাৎ হিত কামনা করে স্নেহসিক্ত করে, ক্ষতির মুখে পড়া থেকে তাকে রক্ষা করে, এই হচ্ছে এর অর্থ। মিত্রভাব বা বন্ধুভাব হচ্ছে **মৈত্রী**। **সমস্ত** মানে হচ্ছে অনবশেষ। **জগতের প্রতি** মানে হচ্ছে সত্ত্বদের জগতের প্রতি। **ওপরে** মানে হচ্ছে ঊর্ধ্বে। এর দ্বারা নিরাকার জগৎ গৃহীত হয়েছে। **নিচে** মানে হচ্ছে নিম্নে। এর দ্বারা কামজগৎ গৃহীত হয়েছে। **মধ্যবর্তী দিকে** মানে হচ্ছে মাঝামাঝি দিকে। এর দ্বারা সূক্ষ্ম পদার্থের জগৎ গৃহীত হয়েছে। **অবাধ** মানে হচ্ছে বাধাহীন, অর্থাৎ সীমাকে ভেঙে ফেলার কথাই বলা হয়েছে। সীমা মানে হচ্ছে শত্রু, প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ তার প্রতিও মৈত্রীকে প্রবর্তিত করা হয়েছে, এই হচ্ছে এর অর্থ। **শত্রুহীন** মানে হচ্ছে শত্রুমুক্ত, অর্থাৎ মাঝে মাঝেও বৈরীচেতনা উৎপন্ন না হওয়া বলা হয়েছে। **প্রতিপক্ষহীন** মানে হচ্ছে প্রতিপক্ষমুক্ত। মৈত্রীবিহারী ব্যক্তি মানুষদের কাছে প্রিয় হয়, অমানুষদের কাছেও প্রিয় হয়, কেউই তাকে প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষ ভাবে না, তাই তার মন প্রতিপক্ষমুক্ত হয় বিধায় “প্রতিপক্ষহীন” বলা হয়েছে। এই হচ্ছে বিভিন্ন পদের ধারাবাহিক অর্থবর্ণনা।

কিন্তু এখানে এই হচ্ছে এর অভিপ্রেত অর্থবর্ণনা: এখানে “তেমনি তিনিও সকল সত্ত্বগণের প্রতি অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন” বলে যা বলা হয়েছে, সেই অপরিসীম মৈত্রীচিত্ত তিনি সমস্ত জগতের প্রতি গড়ে তোলেন, বাড়ান, বৃদ্ধি করেন, উৎপন্ন করেন, বিপুল করে তোলেন। কীভাবে? **ওপরে, নিচে ও মধ্যবর্তী দিকে** অর্থাৎ ওপরে ভবাগ্র পর্যন্ত, নিচে অবীচি পর্যন্ত, আর মধ্যবর্তী দিকে বাদবাকি সবদিক পর্যন্ত। অথবা ‘ওপরে’ হচ্ছে নিরাকার জগতে, ‘নিচে’ হচ্ছে কামধাতুতে, আর ‘মধ্যবর্তী দিকে’ হচ্ছে বাদবাকি রূপধাতুতে ছড়িয়ে দিয়ে। ঠিক এভাবেই ভাবনা করার সময় তিনি যেভাবে অবাধ, শত্রুহীন ও প্রতিপক্ষহীন হন সেভাবেই বাধা, শত্রু ও প্রতিপক্ষহীন করে গড়ে তোলেন। অথবা তিনি যেই ভাবনাসম্পদ লাভ করেছেন তা সর্বত্রই স্থান করে নেয় এর ভিত্তিতে অবাধ। অন্যদের প্রতি নিজের ক্রোধকে দমন করার মাধ্যমে তিনি শত্রুহীন হন এবং নিজের প্রতি অন্যদের ক্রোধকে দমন করার মাধ্যমে তিনি প্রতিপক্ষহীন হন, সেই অবাধ, শত্রুহীন, প্রতিপক্ষহীন ও অপরিসীম মৈত্রীচিত্তকে তিনি ওপরে, নিচে ও মধ্যবর্তী দিকে, এই তিনটি দিক উল্লেখ করে সমস্ত জগতের প্রতি গড়ে তোলেন, বাড়ান।

## নবম গাথার বর্ণনা

৯. এভাবে মৈত্রীভাবনা গড়ে তোলাটাকে তুলে ধরার পর, এখন সেই মৈত্রীভাবনায় নিয়োজিত হয়ে বাস করার দৈহিক ভঙ্গিমার অবস্থাগুলোকে তুলে ধরতেই বললেন, “**দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া।**”

তার অর্থ হচ্ছে এই: ঠিক এভাবে মৈত্রীচিত্তকে গড়ে তোলার সময় তিনি “পদ্মাসনে বসেন, শরীরকে একদম সোজা রেখে” ইত্যাদিতে (দী.নি.২.৩৭৪; ম.নি.১.১০৭; ৰিভ.৫০৮) বর্ণিত নিয়মে সুনির্দিষ্ট দৈহিক ভঙ্গিমা অনুসরণ না করে, যেকোনো দৈহিক ভঙ্গিমার বাধা দূর করে, আপন সুবিধা অনুযায়ী দাঁড়িয়ে থাকেন, হেঁটে বেড়ান, বসে থাকেন অথবা শুয়ে থাকেন যতক্ষণ না তার মধ্যে তন্দ্রাভাব দেখা দেয়, ততক্ষণ তিনি এই মৈত্রীধ্যানের স্মৃতি অধিষ্ঠান করেন।

অথবা, এভাবে মৈত্রীভাবনা গড়ে তোলাটাকে তুলে ধরার পর, এখন দক্ষতাকে তুলে ধরতেই বললেন, “**দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া।**” মৈত্রীধ্যানে দক্ষ ব্যক্তি দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া—সমস্ত দৈহিক ভঙ্গিমাগুলোতেই এই মৈত্রীধ্যানের স্মৃতি অধিষ্ঠান করতে ইচ্ছুক হন। অথবা দাঁড়ানো কিংবা হাঁটার সময় স্থান ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তার কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না, অন্যদিকে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত এই মৈত্রীধ্যানের স্মৃতি অধিষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেন ততক্ষণ তন্দ্রাহীন হয়েই অধিষ্ঠান করতে পারেন, এতে তার খুব একটা বেশি সময় লাগে না। তাই বলা হয়েছে, “**দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া—প্রতিটি ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তন্দ্রাভাব তাকে পেয়ে বসে, ততক্ষণ তিনি এই মৈত্রীস্মৃতি অধিষ্ঠান করেন।**”

তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই: এখানে “সমস্ত জগতের প্রতি মৈত্রীচিত্ত গড়ে তোলেন” বলে যা বলা হয়েছে, সেটিকে সেভাবেই গড়ে তোলেন, অর্থাৎ তিনি যেভাবে স্থান ইত্যাদিতে যতক্ষণ ধরে যেকোনো দৈহিক ভঙ্গিমায়, অথবা স্থান ইত্যাদিকে গ্রাহ্য না করে যতক্ষণ ধরে এই মৈত্রীধ্যানের স্মৃতি অধিষ্ঠান করতে ইচ্ছুক হন, ততক্ষণ তন্দ্রাহীন হয়ে এই মৈত্রীস্মৃতি অধিষ্ঠান করেন।

এভাবে মৈত্রীভাবনার দক্ষতাকে তুলে ধরতেই “এই মৈত্রীস্মৃতিকে অধিষ্ঠান করেন”, অর্থাৎ সেই মৈত্রীবিহারে নিয়োজিত হয়ে এখন সেই অবস্থানকে প্রশংসা করতেই বললেন, “**এখানে একেই ‘ব্রহ্মবিহার’ বলা হয়।**”

তার অর্থ হচ্ছে এই: এখানে “সুখী হোক, উপদ্রবহীন হোক” ইত্যাদি থেকে শুরু করে “এই মৈত্রীস্মৃতি অধিষ্ঠান করেন” পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হয়েছে সেটিই হচ্ছে মৈত্রীবিহার বা মৈত্রীর সঙ্গে বাস, **একেই** চারি দিব্য-ব্রহ্মা-আর্য-দৈহিক ভঙ্গিমায় বাস করায় কোনো দোষ নেই বিধায়, এবং এতে নিজের ও অন্যদেরও কল্যাণ সাধিত হয় বিধায় **এখানে** অর্থাৎ আর্যদের ধর্মবিনয়ে **‘ব্রহ্মবিহার’ বলা হয়**, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিহার বা শ্রেষ্ঠ বাস বলা হয়। যখনই তিনি সতত, একনাগাড়ে ও অবিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা অথবা শোয়া অবস্থায় থাকেন, অথবা যতক্ষণ তার মধ্যে তন্দ্রাভাব না আসে, ততক্ষণ তিনি এই মৈত্রীস্মৃতি অধিষ্ঠান করেন।

## দশম গাথার বর্ণনা

১০. এভাবে ভগবান সেই ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে নানা প্রকারে মৈত্রীভাবনা তুলে ধরার পর, এখন যেহেতু তাদের মৈত্রীটা সত্ত্বদের আলম্বন হিসেবে গ্রহণ করার কারণে আত্মদৃষ্টির খুব কাছাকাছি থাকে, তাই সেই মিথ্যাদৃষ্টিকে যাতে তারা আঁকড়ে না ধরে সেই লক্ষ্যে সেই ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে মৈত্রীধ্যানকে ভিত্তি করে আর্যভূমিতে উৎপত্তির উপায় তুলে ধরতেই বললেন, “**তিনি মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করে।**” এই গাথার মাধ্যমে তিনি তাঁর দেশনা শেষ করলেন।

তার অর্থ হচ্ছে: এই যে “এখানে একেই ‘ব্রহ্মবিহার’ বলা হয়” বলে মৈত্রীধ্যানের সঙ্গে বিহার বা বাস বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে উঠে এসে সেখানে যেসব বিতর্ক-বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলো থাকে, সেগুলোকে এবং সেগুলোর বাস্তু ইত্যাদি অনুসারে পদার্থগুলোকে গ্রহণ করে এই মন ও পদার্থগুলোকে বিশ্লেষণের দ্বারা “এটি হচ্ছে বিশুদ্ধ সৃষ্টিপুঞ্জ, এখানে কোনো সত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না” (সং.নি.১.১৭১) এভাবে **তিনি মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করে**, ক্রমান্বয়ে লোকোত্তর-শীলের দ্বারা **শীলবান** হয়ে, লোকোত্তর-শীলসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে স্রোতাপত্তিমার্গের সম্যক দৃষ্টি নামক **সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হন**। তারপর তিনি বস্তুগত কাম্য বিষয়গুলোতে এই যে লোভ নামক কলুষতা-কাম (*কিলেসকামো*) অপরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে সেটিকে সকৃদাগামী ও অনাগামীমার্গের দ্বারা ক্ষীণ করার মাধ্যমে এবং নিঃশেষে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে **কাম্য বিষয়ে লোভকে দমন করে**, অর্থাৎ উপশান্ত করে **পুনরায় গর্ভাশয়ে জন্মাতে আসেন না**, মানে আংশিকভাবে পুনরায় গর্ভাশয়ে আসেন না, অর্থাৎ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই অর্হত্ত্ব লাভ করে পরিনির্বাপিত হন।

এভাবে ভগবান দেশনা শেষ করে সেই ভিক্ষুদের বললেন, “যাও, হে ভিক্ষুগণ, সেই গহীন বনেই বাস করো। এই সূত্রটি মাসের মধ্যে আট দিন অর্থাৎ ধর্মশ্রবণের দিনে ঘণ্টা বাজিয়ে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করো, ধর্মকথা বলো, ধর্মালোচনা করো, ধর্মকথা অনুমোদন করো, এই কর্মস্থান চর্চা করো, গড়ে তোলো, ব্যাপকভাবে অভ্যাস করো। এতে করে সেই অমনুষ্যরা তোমাদের আর সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো দেখাবে না, উল্টো তারা তোমাদের কল্যাণকামী, হিতকামী হবে।” তারা “ঠিক আছে” বলে ভগবানকে প্রত্যুত্তর জানিয়ে, আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন জানিয়ে, প্রদক্ষিণ করে, সেখানে গিয়ে তাই করল। দেবতারা “ভদন্তগণ আমাদের কল্যাণকামী, হিতকামী” এই ভেবে অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হয়ে নিজেরাই বাসস্থান ঝাঁট দিতে লাগল, জল গরম করে দিতে লাগল, পিঠ ও পা ডলে দিতে লাগল, সুরক্ষা দিতে লাগল। সেই ভিক্ষুরা ঠিক সেভাবেই মৈত্রী গড়ে তুলে, তার ওপর ভিত্তি করে বিদর্শন ধ্যান শুরু করে, সবাই তিন মাসের মধ্যেই অগ্রফল অর্হত্ত্ব লাভ করে মহাপ্রবারণার দিনে বিশুদ্ধি-প্রবারণার দ্বারা প্রবারণা করেছিল।

এভাবেই ভালো কাজে দক্ষ, তথাগত,

ধর্মেশ্বর কর্তৃক কথিত করণীয় ভালো কাজ করে,

হৃদয়ের পরম শান্তি অনুভব করে,

পরিপূর্ণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শান্তপদকে উপলব্ধি করেন।

তাই সেই অমৃত, অদ্ভুত, আর্যদের প্রিয়

শান্তপদকে উপলব্ধি করে বাস করতে ইচ্ছুক

বিজ্ঞ ব্যক্তি বিমল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা

সতত করণীয় ভালো কাজকে ভেদ করেন।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

মৈত্রী সূত্রের বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# শেষ কথা

এই পর্যন্ত যা বলা হলো—

“আমি বন্দনার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে

উত্তম ত্রিরত্নকে বন্দনা নিবেদন করে,

ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর অর্থবর্ণনা করব।”

এখানে ত্রিশরণ, শিক্ষাপদ, দেহের বত্রিশটি অংশ, কুমার-প্রশ্ন, মঙ্গল সূত্র, রত্ন সূত্র, তিরোকুট্ট সূত্র, নিধিকণ্ড সূত্র ও মৈত্রী সূত্রের ভিত্তিতে নয় প্রকার **খুদ্দকপাঠের** অর্থবর্ণনা সম্পন্ন হয়েছে। তাই বলা হয়েছে:

“সদ্ধর্মের স্থিতিকামী হয়ে খুদ্দকপাঠের

এই অর্থবর্ণনা করার মাধ্যমে

আমি যা কুশল (পুণ্য) লাভ করেছি,

তার প্রভাবে শিগগিরই এই লোকজন

আর্যপ্রচারিত ধর্মে উন্নতি করুক,

শ্রীবৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করুক।”

পরম বিশুদ্ধ, শ্রদ্ধা-বুদ্ধি-উদ্যম-মণ্ডিত, শীলাচার-ঋজুতা-কোমলতা ইত্যাদি গুণ-সমন্বিত, ত্রিপিটক-পরিয়ত্তি-ভেদে অর্থকথাসহ শাস্তাশাসনে অপ্রতিহত জ্ঞানের প্রভাব, মহান ব্যাখ্যা ও করণসম্পত্তিজনিত সুখনির্গত মধুর উচ্চতর ষড়ভিজ্ঞা-প্রতিসম্ভিদা ইত্যাদি গুণবিমণ্ডিত সাধারণ মানুষের অতীত উচ্চতর ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত-বোধিপ্রাপ্ত স্থবিরবংশের প্রদীপ মহাবিহারবাসী স্থবিরদের বংশের অলংকারভুক্ত বিপুল বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান, গুরুপ্রদত্ত “**বুদ্ধঘোষ**” নামধারী স্থবিরের দ্বারা বিরচিত “**পরমার্থজ্যোতিকা**” নামক এই খুদ্দকপাঠ অর্থকথা বইটি—

জগতে ততদিন পর্যন্ত টিকে থাকুক—

জগৎ থেকে মুক্তি-অন্বেষী কুলপুত্রদের সামনে

শীল ইত্যাদি বিশুদ্ধির উপায় তুলে ধরতে ধরতে;

যতদিন তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত, জগতে লোকশ্রেষ্ঠ,

মহর্ষির ‘বুদ্ধ’ নামটি বিরাজমান থাকবে।

‘পরমার্থজ্যোতিকা’ নামক খুদ্দকপাঠ অর্থকথায়

খুদ্দকপাঠের বর্ণনা সমাপ্ত।

\* \* \*

# পাল়ি গ্রন্থগুলোর শব্দসংক্ষেপ

(বার্মায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সঙ্গায়নের পাল়ি ত্রিপিটক অনুসারে)

পারা. = পারাজিকা (যেমন, পারা.১৫৭ মানে হচ্ছে পারাজিকা গ্রন্থের ১৫৭ নং অনুচ্ছেদ)

‍পাচি. = পাচিত্তিয (যেমন, পাচি.২৫ মানে হচ্ছে পাচিত্তিয গ্রন্থের ২৫ নং অনুচ্ছেদ)

মহাৰ. = মহাৰগ্গ (যেমন, মহাৰ.১০২ মানে হচ্ছে মহাৰগ্গ গ্রন্থের ১০২ নং অনুচ্ছেদ)

চূল়ৰ. = চূল়ৰগ্গ (যেমন, চূল়ৰ.১১০ মানে হচ্ছে চূল়ৰগ্গ গ্রন্থের ১১০ নং অনুচ্ছেদ)

দী.নি. = দীঘনিকায (যেমন, দী.নি.২.৩২ মানে হচ্ছে তিন খণ্ডবিশিষ্ট দীঘনিকায গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩২ নং অনুচ্ছেদ)

ম.নি. = মজ্ঝিমনিকায (যেমন, ম.নি.১.৫১ মানে হচ্ছে তিন খণ্ডবিশিষ্ট মজ্ঝিমনিকায গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫১ নং অনুচ্ছেদ)

সং.নি. = সংযুত্তনিকায (যেমন, সং.নি.৪.৬৭ মানে হচ্ছে পাঁচ খণ্ডবিশিষ্ট সংযুত্তনিকায গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ৬৭ অনুচ্ছেদ)

অ.নি. = অঙ্গুত্তরনিকায (যেমন, অ.নি.১০.১২৫ মানে হচ্ছে এগারোটি নিপাতবিশিষ্ট অঙ্গুত্তরনিকায গ্রন্থের দশক নিপাতের ১২৫ অনুচ্ছেদ)

ধ.প. = ধম্মপদ (যেমন, ধ.প.১৫৩ মানে হচ্ছে ধম্মপদ গ্রন্থের ১৫৩ নং গাথা)

উদা. = উদান (যেমন, উদা.৪৭ মানে হচ্ছে উদান গ্রন্থের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ)

মহানি. = মহানিদ্দেস (যেমন, মহানি.১৯২ মানে হচ্ছে মহানিদ্দেস গ্রন্থের ১৯২ নং অনুচ্ছেদ)

চূল়নি. = চূল়নিদ্দেস (যেমন, চূল়নি.৯৭ মানে হচ্ছে চূল়নিদ্দেস গ্রন্থের ৯৭ নং অনুচ্ছেদ)

পটি.ম. = পটিসম্ভিদামগ্গ (যেমন, পটি.ম.১.১৬১ মানে হচ্ছে তিনটি বর্গবিশিষ্ট পটিসম্ভিদামগ্গ গ্রন্থের প্রথম বর্গের ১৬১ নং অনুচ্ছেদ)

ইতিৰু. = ইতিৰুত্তক (যেমন, ইতিৰু.৯০ মানে হচ্ছে ইতিৰুত্তক গ্রন্থের ৯০ নং অনুচ্ছেদ)

সু.নি. = সুত্তনিপাত (যেমন, সু.নি.৩৭৯ মানে হচ্ছে সুত্তনিপাত গ্রন্থের ৩৭৯ নং অনুচ্ছেদ)

জা. = জাতক (যেমন, জা.১.১৩.৯০ মানে হচ্ছে বাইশটি নিপাতবিশিষ্ট দুই খণ্ড জাতক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৩ নং নিপাতের ৯০ নং গাথা)

নেত্তি. = নেত্তিপ্পকরণ (যেমন, নেত্তি.১২১ মানে হচ্ছে নেত্তিপ্পকরণ গ্রন্থের ১২১ নং অনুচ্ছেদ)

ৰিভ. = ৰিভঙ্গ (যেমন, ৰিভ.৮০৯ মানে হচ্ছে ৰিভঙ্গ গ্রন্থের ৮০৯ নং অনুচ্ছেদ)

ৰিসুদ্ধি. = ৰিসুদ্ধিমগ্গ (যেমন, ৰিসুদ্ধি.১.৫২ মানে হচ্ছে দুই খণ্ডবিশিষ্ট ৰিসুদ্ধিমগ্গ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫২ নং অনুচ্ছেদ)

অট্ঠ. = অট্ঠকথা

টী. = টীকা

\* \* \*

1. **পদ্মবৃষ্টি** মানে হচ্ছে পদ্মপাতা রঙের বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে যারা ভিজতে চায় না তারা পদ্মপাতার মতোই শুকনো থাকে, বিন্দুমাত্র ভেজে না, তাই এই নামকরণ। [↑](#footnote-ref-0)